১২শ সংখ্যা॥ নভেম্বর ২০২৩ - ফেব্রুয়ারি ২০২৪

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ০৫-৩৩

'পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করা মাত্র আর্মির বিশেষ শাসন দেখতে পাই' ● ডা: গজেন্দ্র নাথ মাহাতো ০৬

'পার্বত্য চুক্তি নিয়ে সরকারের মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার আমরা মেনে নিতে পারি না' ● নিপন ত্রিপুরা ০৬

'রাজধানীতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলুন, আমরা থাকবো' ● জাকির হোসেন ০৮

'যখন মানবাধিকার নিয়ে কথা বলবেন, তখন আদিবাসীদের পক্ষে লড়াই করতে হবে' ● ড. স্নিগ্ধা রিজওয়ানা ০৯

'পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছেন' ● মোস্তফা আলমগীর রতন ১০

'আদিবাসীদের সমস্যা জাতীয় সমস্যা' ● অ্যাডভোকেট এস এম এ সবুর ১১

'পার্বত্য চট্টগ্রামে আধা-সামরিক শাসন চলছে, এর অবসান ঘটাতে হবে' ● সোহরাব হোসেন ১৪

'পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পুরো বাংলাদেশে আদিবাসীরা অস্তিত্বের সংকটে রয়ে গেছে' ● অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস ১৪

'আদিবাসীদের জীবন এখন অত্যন্ত দুর্বিষহ' ● রবীন্দ্রনাথ সরেন ১৭

'সেনা শাসনের অবসান ঘটাতে হবে, পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচালিত হতে হবে' ● শামসুল হুদা ১৮

'আদিবাসীরা প্রতিমুহূর্তেই আতঙ্কের মধ্যে আছে কী পাহাড়ে কী সমতলে' ● রাজেকুজ্জামান রতন ২০

'সবাই মিলে রাজনৈতিক শক্তির সমাবেশ ছাড়া বিকল্প নাই' ● রুহিন হোসেন প্রিন্স ২৩

'আমরা আরেকবার বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধাবস্থার মধ্যে দেখতে চাই না' ● ড. মেসবাহ কামাল ২৫

'সারাক্ষণই তারা বলছে চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে, এটা এককথায় মিথ্যাচার' ● অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ২৯

'পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আবারও নতুন কিছু ভাবনার উদয় হচ্ছে' ● জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ৩২

প্রবন্ধ ৩৪-৩৯

একালের সাঁওতাল যোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ সরেন ● পাভেল পার্থ ৩৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতারণা ● দীপায়ন খীসা ৩৭

বিশেষ প্রতিবেদন ৪০-৫৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জনসংহতি সমিতির ক্রোড়পত্র ৪০

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন ৪৬

কেএনএফ ও সেনাবাহিনীর চাপে ও নিপীড়নে চরম বিপদগ্রস্ত সাধারণ বম জনগণ ৪৮

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৫ জুম্মকে মারধরের পর চিকিৎসা নিতে বাধা এবং নানা ষড়যন্ত্র ফাঁস ৫১

পার্বত্য চট্টগ্রামে একতরফা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ব্যাপক অনিয়ম ৫৪

সংবাদ প্রবাহ ৫৭-১১৬

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ৫৭

সেনামদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা ৬৯

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল ৭৯

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৮১

সংগঠন সংবাদ ৮২

আন্তর্জাতিক সংবাদ ১১৩

১২শ সংখ্যা ॥ নভেম্বর ২০২৩ - ফেব্রুয়ারি ২০২৪

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

প্রকাশকাল:
মার্চ ২০২৪

প্রচ্ছদ ডিজাইন
শ্রী প্রমাণ

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

সম্পাদকীয়

দেশের শাসকগোষ্ঠী এখন উন্নয়ন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন সুফলা সুজলা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে পার্বত্যাঞ্চলকে বিরান ভূমিতে পরিণত করছে, অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে ব্যাপক সামরিকায়ণ করে পূর্ব স্বৈরচারী শাসকদের মতো ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমাধানের পথ বেছে নিয়েছে। তারই লক্ষ্যে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে দেশে-বিদেশে গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রচার করছে যে, পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের এই মিথ্যাচারের পেছনে মূল উদ্দেশ্যই হলো দেশে-বিদেশে আপামর জনমন থেকে পার্বত্য চুক্তিকে একেবারে মুছে ফেলা বা ভুলিয়ে দেয়া। জনমন থেকে পার্বত্য চুক্তিকে মুছে দিয়ে নির্বিঘ্নে ও অবাধে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূল করা এবং অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা।

এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বস্তুত পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, মাধ্যমিক শিক্ষা, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ন্যস্তকরণ এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক পার্বত্য পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা; ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন পূর্বক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি ফেরত প্রদান করা এবং অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিল করা; অপারেশন উত্তরণ নামক সেনাশাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা; স্ব স্ব ভূমি প্রত্যর্পণ পূর্বক আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা; পার্বত্য চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধি সংশোধন করা; বসতিকারী সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে।

এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দমন-পীড়ন, ধর-পাকড়, জেল-জুলুম, হত্যা, গুম, মিথ্যা মামলায় জড়িতকরণ, ভূমি বেদখল, স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ, সরকারি মদদে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, অনুপ্রবেশ, জুম্মদের সংখ্যালঘুকরণ, সাম্প্রদায়িক হামলা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, নারীর উপর সহিংসতা ইত্যাদি মানবতাবিরোধী ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে নিজেদের ব্যর্থতা ধামাচাপা দিতে নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সকল স্তরের নেতাকর্মীসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জুম্ম জনগণকে 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত', 'চাঁদাবাজ' ইত্যাদি তকমা দিয়ে অপরাধীকরণ করছে। ফলে ২০২৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যুদের দ্বারা ২৪০টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে এবং এসব ঘটনায় ১,৯৩৩ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়, ৬৪টি গ্রাম এক বা একাধিক বার সেনাবাহিনীর অভিযানের শিকার হয় এবং ৮৪টি বাড়ি ও পরিবারের সদস্যরা সেনা তল্লাশির মুখে পড়েছে।

২০২৩ সালে গত ৯ মার্চ কুয়াকাটায় এবং ২০ আগস্ট জাতীয় সংসদ ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির যথাক্রমে ৭ম ও ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হলেও এই দু'টি সভাসহ পূর্ববর্তী সভাগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের কোনো অগ্রগতি নেই। ফলে সরকারের অসহযোগিতা ও গড়িমসির কারণে বর্তমানে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিও অকার্যকর সংস্থায় পরিণত হতে বসেছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই এবং এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় জনবল ও তহবিল বরাদ্দপূর্বক কমিটিকে কার্যকর সংস্থায় রূপান্তরকরণ অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩, শনিবার, সকাল ১০:১৫ ঘটিকায় ঢাকার আগারগাঁও-এ শের-ই-বাংলা নগরের মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবানের দাবিতে জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের অর্থ সম্পাদক মেইনথিন প্রমীলা।

এতে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের কো-চেয়ারপার্সন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সমন্বয়কারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল, কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সহ-সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নির্বাহী সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, ঐক্যন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট এস এম এ সবুর, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ সভাপতি ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য মোস্তফা আলমগীর রতন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. স্নিগ্ধা রিজওয়ানা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন প্রমূখ। আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ সাধারণ সম্পাদক ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো এবং ছাত্র ও যুব প্রতিনিধির বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি নিপন ত্রিপুরা।

আলোচনা সভায় উপস্থিত আলোচকদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

‘পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করা মাত্র আর্মির বিশেষ শাসন দেখতে পাই’

ডা: গজেন্দ্র নাথ মাহাতো
সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত আছেন তৎকালীন জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সেই অবিসংবাদিত নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) স্যার, যিনি এই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সুদীর্ঘ একটি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, যে চুক্তিটি পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হয়েছিল, আজকে তিনি সভাপতিত্ব করছেন। উপস্থিত আছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং ইলেকট্রনিক্স-প্রিন্ট মিডিয়ার সকল সাংবাদিকবৃন্দ এবং আদিবাসীদের এক অংশ, সবাইকে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রিয় সমাবেশ, চুক্তির ২৬ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে যে সময়টি আজকে হওয়ার কথা ছিল ২৬ বছরের আনন্দ উদযাপনের কথা। যেখানে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি একাকার হয়ে তথা সারা বাংলাদেশে আদিবাসীরা আনন্দ উৎসব করার কথা, কিন্তু সেরকম আনন্দ-উৎসবের কোনো কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বিশেষ করে সারা বাংলাদেশের আদিবাসীদের যে বাস্তবতা তার চেয়ে পাহাড়ের বাস্তবতা অনেক জটিল পরিলক্ষিত হয়।

চুক্তির ২৬ বছর পরেও সরকার যদিও দাবি করছে যে, চুক্তির মূল বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশের সমতলের যেকোনো অঞ্চল থেকে আমরা যখন পাহাড়ে যাই তখন দেখি শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করা মাত্র বিভিন্ন জায়গায় আর্মির বিশেষ যে শাসন রয়েছে সেটি আমরা দেখতে পাই। চুক্তির ২৬ বছর পরে অবশ্যই প্রত্যাশা ছিল চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশের ৬১টি জেলার মত তিন পার্বত্য জেলাতেও একই রকম গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বহাল হবে, কিন্তু তা আমরা বাস্তবে দেখতে পাই না।

মূল বিষয়গুলোর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে যে ভোটার তালিকা করার কথা সেটি কিন্তু এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। তারপরে যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল সেটিও কিন্তু হয়নি। ফলে আঞ্চলিক পরিষদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ছিল তা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে আনা ৫ লক্ষ সেটেলার বাঙালিকে অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সমতলে পুনর্বাসন করার প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাই না। শুধু তাই নয়, সারা বাংলাদেশের আদিবাসীদের বাস্তবতা- তারা প্রতিদিন ভূমি হারাচ্ছে, তারা তাদের মা-বোনের সম্ভ্রম হারাচ্ছে, এই বিষয়গুলোতেও সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেখতে পাই না।

আজকে ২৬ বছর পূর্তিতে আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাতে চাই, অবিলম্বে চুক্তির যে ধারাগুলো অবাস্তবায়িত রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হোক। পাশাপাশি সমতলে বসবাসরত আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবিসহ আদিবাসীদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে সকল নেতৃবৃন্দকে স্বাগতম জানিয়ে আজকের এই ২৬ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সার্থক হোক, সফল হোক-এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

‘পার্বত্য চুক্তি নিয়ে সরকারের মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার আমরা মেনে নিতে পারি না’

নিপন ত্রিপুরা
সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ২৬টি বৈঠকের মধ্য দিয়ে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের

একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায় সম্মানিত সভাপতি, সংগ্রামী সভাপতি, নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আজীবন সংগ্রামী এবং ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরে জুম্ম জনগণের তথা স্থায়ী অধিবাসীদের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিত্ব শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। উপস্থিত আজকের আলোচনা সভার প্রধান অতিথি এবং নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সংগ্রামরত প্রগতিশীল ব্যক্তি, সংগঠন, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, মঞ্চের সামনে উপস্থিত আদিবাসী শিক্ষার্থীবৃন্দ, মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী বন্ধুগণ, আপনাদের সবাইকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানাই এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের আদিবাসী ছাত্র যুবকদের পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানাই এবং আমরা একই সঙ্গে দাবি জানাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমরা দেখেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালের ১০ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, অতীতের সরকারগুলো কখনো অর্থনৈতিকভাবে কখনো বল প্রয়োগের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছে। এই সরকার, আমরা একমাত্র রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপনীত হয়েছি এবং চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আজ থেকে ২৫ বছর আগে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন ২৫ বছর পরে এসেও সেই বক্তব্যের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাই না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বিশেষ শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হলো আঞ্চলিক পরিষদ। আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান এখানে উপস্থিত আছেন। আজকে এই আঞ্চলিক পরিষদের যে আইন তার গেজেট ১৯৯৮ সালে প্রকাশ করেছে, কিন্তু এই আইন বাস্তবায়নের জন্য একইভাবে সকল বিভাগ, মন্ত্রণালয়, জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর দায়িত্ব থাকলেও সরকার সেটা করছে না। এই সরকার আঞ্চলিক পরিষদকে অথর্ব একটা প্রতিষ্ঠান করে রেখেছে। তাহলে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো এই সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করবে।

১৯৯৬ সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ডায়লগ শুরু হয়েছিল নভেম্বর মাসে। ডায়লগ শুরু হওয়ার পর চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় ১৯৯৭ সালে মাত্র এক বছরের একটু বেশি সময়ে। তখন আমরা দেখেছিলাম সরকারের সদিচ্ছা বা আন্তরিকতা। কিন্তু আজকে সরকারের সেই আন্তরিকতা কোথায় গেলো। ২৬ বছর হয়ে গেল এখনো সরকারের সেই সদিচ্ছা বা আন্তরিকতা আমরা দেখতে পাই না। আমরা দেখছি চুক্তিকে নিয়ে মিথ্যাচার। চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয় নিয়ে পার্টির তরফ থেকে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ক্রোড়পত্র এখানে আছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ২০২৩ এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। সেখানে স্পষ্ট করে পার্টির পক্ষ থেকে বক্তব্য দেয়া হয়েছে।

আজকের এই আলোচনা সভায় সরকারকে যেটা বলতে চাই, তা হলো সরকার কী করতে চায়? সরকার কি চায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে পাহাড়ে আরো নতুন করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হোক? যদি না চান তাহলে এই চুক্তি যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরের পূর্বে এখানে একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছে, অনেকজনে এখানে প্রাণ হারিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে যারা সেখানে আন্দোলন দমন করতে গেছে তাদেরও সেখানে অনেকের জীবন দিতে হয়েছে, প্রাণহানি ঘটেছে। পাহাড়িদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে যারা আন্দোলন সংগ্রামে ছিল তাদেরও সেখানে জীবনহানি হয়েছে।

তাহলে আজকে সেই জীবনহানির মধ্য দিয়ে যে চুক্তি সেটাতো আমরা এমনি এমনি করে বৃথা যেতে দিতে পারি না। তাহলে আমি সরকারকে প্রশ্ন রাখতে চাই, সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করবে, নাকি পাহাড়ে আরেকটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠবে? চুক্তি বাস্তবায়ন করুন, নতুবা এই ছাত্র-যুব সমাজ তাদের সর্বোচ্চ নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের আগেও যে সংগ্রাম হয়েছে, সেই সংগ্রাম তারা যেকোনো আঙ্গিকে যেকোনো মাত্রায় যেকোনো বাস্তবতায় পরিচালনা করতে বদ্ধ পরিকর।

আমরা মনেকরি, এই চুক্তির মধ্যে আমাদের সকল ধরনের অধিকার নিহিত আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মূল সমাধানও এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। আদিবাসী ছাত্র যুব সমাজ এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে নিয়ে যে সরকারের মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরাও সর্বোচ্চ সবটুকু দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাব। সেই সংগ্রামে ছাত্র ও যুব সমাজকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এবং আরো একবার এই চুক্তি বাস্তবায়নের যে বৃহত্তর আন্দোলন, সেই বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমার সংহতি বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

‘রাজধানীতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলুন, আমরা থাকবো’

জাকির হোসেন
যুগ্ম সমন্বয়কারী, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন

সম্মানিত সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস এবং অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, গত বছরও আমরা এখানে এসেছি। এই চুক্তি সম্পর্কে সচেতনাও তেমন নেই। এই প্রেক্ষিতেই আমরা চিন্তা করেছিলাম, তাহলে আমাদের কী দায়িত্ব আছে যারা আমরা আদিবাসী নই। এই দায়িত্ববোধ থেকেই একটা কথা আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, যেকোনো সমাবেশ আমরা আয়োজন করবো এবং একটি সংহতি সমাবেশ গড়ে তুলব সারা দেশব্যাপী এবং সেটার একটা নাম নির্ধারণ করেছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন। এই আন্দোলনের সঙ্গে এখানে উপস্থিত আছেন সম্মানিত জাতীয় নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স, রাজেকুজ্জামান রতন, ঐক্য ন্যাপের নেতৃবৃন্দ আছেন, তারা সকলেই বলেছিলেন, আমরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে আছি। কাজেই এই আন্দোলন আমরা সকলে মিলেই গড়ে তুলোছি। গত এক বছরে এই যে কথা দিয়েছিলাম, আমরা সারা দেশে একটা সংহতি আন্দোলন গড়ে তুলব, সেটা আমরা কী করেছি সেটার একটা লিফলেট এই সুযোগে আপনাদের কাছে বিলি করলাম। এবং এও আপনারা জানবেন, অ্যাডভোকেট সুলতানা আপা, তিনি সংহতি জানিয়েছেন, তিনি সিলেটে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, তিনিও এই আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়েছেন এবং মেসবাহ ভাইতো আমাদের সঙ্গে প্রথম থেকেই আছেন। কাজেই আমরা যে আমাদের দায়িত্ব পালন কিছুটা হলেও চেষ্টা করেছি, আপনারা বিবেচনায় দেখবেন লিফলেটটা পড়ে।

আরো একটু দায়িত্ব পালন, ব্যক্তিগতভাবে আমি চেষ্টা করি, যেটা সুলতানা আপা জানেন, সেটা হচ্ছে যে, সুলতানা আপা যুক্ত আছেন ২০০৯ সাল থেকে, আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকারের যে অঙ্গীকার বাংলাদেশ করেছে, বিভিন্ন সময় করে আসছে, যেমন ২০০৯, ২০১৩, ২০১৮ এবং এই যে, গত নভেম্বর মাসের ১৩ তারিখে জাতিসংঘে প্রতি সাড়ে চার বছরে সরকার একটা মানবাধিকারের রিপোর্ট প্রদান করে এবং তার প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের এবং বিদেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলি, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে। আমার সুযোগ হয়েছিল গত ৩০ অগাস্ট ২০২৩ কথা বলার, জেনেভাতে। আমি আপনাদের পক্ষ থেকেও এনডোর্সমেন্ট করিয়ে নিয়েছিলাম, একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম, ওটা ছিল প্রি-সেশন। গত ১৩ নভেম্বর তারিখেও আমি উপস্থিত ছিলাম, সেখানে কয়েকটা দেশ বলেছে যে, চুক্তি বাস্তবায়ন টাইম-বাউন্ড হতে হবে এবং এটা যখন একটা দেশ বললো, আমি খুব খুশি হলাম। কেননা আমরা যে দাবিনামা নিয়ে এই আন্দোলন শুরু করেছি তার প্রথম দাবিটাই হচ্ছে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সময়সূচিভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে’ এবং যথাযথভাবে সেই কথাই বলেছে।

যাক, এটা নিয়ে আশান্বিত হওয়ার তো তেমন কিছু নাই। এই যে চারটি পর্যায়ে মানবাধিকার রিভিউ হয়েছে তার অনেকটাই সরকার বাস্তবায়ন করেনি। তবে এটা আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আমি খুব লম্বা কথা বলবো না, আমি শুধু একটি কথা বলবো। আমি জানি না, আমার কথাটা সম্মানিত সভাপতি মহোদয় কিভাবে নেবেন। আমাদের তরুণ ছাত্র যেটা বললেন যে, আন্দোলনের ডাক দিলে আন্দোলন কোথায় যাবে সেই ব্যাপারেও বললেন। কিন্তু আমি নিজে যেটা লক্ষ্য করি, জনসংহতি সমিতি তো এখন সশস্ত্র আন্দোলনে নাই, তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আছে। তাই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সেটাতো জোরদার না, এটা আমার একটা কমপ্লেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনটা কেন জোরদার হচ্ছে না? আপনারা কেন ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ মানুষকে ঢাকা শহরে জমায়েত করছেন না।

গত ১ বছরে আমরা যেটা বলছি, আপনারা শুধু দিবস পালনের মধ্যে অনেকটা আটকে আছেন। আজকে এই অনুষ্ঠানটা গত কয়েক বছর ধরে একই মঞ্চে হয়, জাতীয় নেতৃবৃন্দ আসেন। কিন্তু আপনাদের মধ্য থেকে রাজধানীতে বড় ধরনের বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা গড়ে তুলুন, আমরা থাকবো আপনাদের সঙ্গে। আমরা আশা রাখি, আগামী বছর আসার আগেই বৃহত্তর আন্দোলন করবেন ঢাকা শহরে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন সব বাধা উপেক্ষা করে সব মানুষকে জমায়েত করুন।

‘যখন মানবাধিকার নিয়ে কথা বলবেন, তখন আদিবাসীদের পক্ষে লড়াই করতে হবে’

ড. স্নিগ্ধা রিজওয়ানা
শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থিত সুধী এবং মঞ্চে উপস্থিত আমার বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক এবং নেতা যারা আছেন সকলকে অনেক শুভেচ্ছা।

আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিছু কথা বলার আগে বলে রাখি, যেটা আমি আগেরবারও বলেছি, বারংবার বলেছি, যখন যে মুহূর্তে আদিবাসীদের নিয়ে আদিবাসীদের লড়াই নিয়ে আমি কথা বলি বা আমাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় ততবার আমি লজ্জিত বোধ করি। এই লজ্জা একজন বাঙালি হিসেবে, আদিবাসীদের প্রতি অত্যধিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই এবং দীর্ঘদিন দিনের পর দিন যাদের ভূমি, যাদের পাহাড়, সকল কিছুকে দখলদারিত্বের সংস্কৃতি, যেখানে আমার মত বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর লোকেরাই দখল করে। আজকে এই অনুষ্ঠানটিতে আমি আসার আগে অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রটি কোনো একজন শিক্ষক দেখছেন। তিনি বলছেন, আপনিতো অনেক বড় বড় মানুষদের মাঝে। আমি বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু এই মানুষগুলো এজন্যই বড় তারা ছোটকে ছোট করে দেখেন না। ছোটকে ছোট করে দেখার এই প্রবণতা এত বেশি আজকাল, সে সংখ্যাই ছোট হোক কিংবা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ছোট হোক। ছোট শব্দটার মধ্যে ভীষণ রাজনীতি যুক্ত।

আজকে যে চুক্তি সেটাকে যখন শান্তিচুক্তি বলা হয় তার মধ্যেও রাজনীতি জড়িত। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই চুক্তি হয়েছিল সেটা শান্তিচুক্তি ছিল না। কিন্তু আমরা সেই চুক্তিকে রাজনৈতিকভাবে শান্তিচুক্তি বলি। গতকালকে চুক্তির ২৬ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে দেশের একটি অন্যতম গণমাধ্যম বলেছে যে, এই চুক্তির ৯৬ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়ে গেছে, আর ৪ শতাংশ বাকি আছে। একটি নিউজ মিডিয়া বলছে, ৯৬ শতাংশ মূলধারা বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। তাহলে প্রশ্ন এই যে, গণতন্ত্রের যে চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম সেই গণমাধ্যম আজকে রাষ্ট্রের কোন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সে তার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কথা বলতে ভয় পায় অথবা বলতে চায় না? হয় আমাকে বুঝতে হবে ভয় পায়, না হলে বলতে চায় না।

আদিবাসীদের আন্দোলন আদিবাসীদের আন্দোলন কেন হবে? উন্নয়নের সাগরে যখন দেশ ভেসে যায় তখন আদিবাসীদের আন্দোলন নাগরিক আন্দোলন কেন হবে না। বিশ্বের যে কোনো দেশ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দেয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, কেন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আছে পার্বত্য জেলায়। সেই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনে ১৬ হাজার আবেদন জমা ছিল ২০২১ সালের পরবর্তীতে। এখন কোনো আবেদনও সেখানে জমা নেওয়া হয় না।

আবারও বলতে হয়, ওখানকার যে সেটেলার বাঙালি তারা ওখানে পাহাড় কিনছে, রিসোর্ট করছে, ইকো পার্ক করছে। তাহলে এই যে ইকো পার্ক, ট্যুরিজম করার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীদের শুধুমাত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক না, কখনো কি আমরা ভেবে দেখেছি পরিবেশের ভারসাম্য কতটা নষ্ট হয়? সাজেকে যে পরিমাণ প্লাস্টিক পাওয়া যায়, সাজেক আজকে যে অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে, আমাদের পরিবেশবাদীদের আন্দোলন যারা করে তাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা কেন ট্যুরিজমের সঙ্গে এই আন্দোলনকে যুক্ত করে না।

আদিবাসী আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন আন্দোলন না- যেটি আমার মূল প্রসঙ্গ ছিল। আদিবাসী, পার্বত্য চুক্তির আন্দোলনকে শুধুমাত্র আদিবাসীদের বা পার্বত্য চুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখাটা ভীষণ রকমের বোকামি। আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসীদের পরিবেশ, ভূমি, পাহাড়, আপনি যখন নিশ্চিত করতে যাবেন সেটি যারা পরিবেশ আন্দোলন করেন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা নৃ-বিজ্ঞান নিয়ে আছি, মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলি, আপনি যখন মানবাধিকার নিয়ে কথা বলবেন, তখন আপনাকে আদিবাসীদের পক্ষে লড়াই করতে হবে।

কাজেই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন আমরা যদি সংগঠিত করতে চাই, বাস্তবায়ন করতে চাই, আমার বিনীত নিবেদন থাকবে আরো যে অন্য কমিউনিটিগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে একমত হয়ে যুগপৎ লড়াই যাতে করতে পারি। এই লড়াই হচ্ছে মানুষের অধিকারের লড়াই। এই লড়াই

কোনো পার্টিকুলার কমিউনিটির লড়াই না। এই লড়াই সন্তু লারমার অধিকার না। এই লড়াই হচ্ছে বাংলাদেশে যারা বিশ্বাস করে সমঅধিকারে, বাংলাদেশের মানুষ যারা বিশ্বাস করে ডাইভারসিটি, এখানে মানুষের বৈচিত্র্য, অধিকার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, এই লড়াই তার।

যখন ফার্মগেটে মনিসা মান্দা খেলেন তখন তিনি বাংলাদেশের জন্য কাপটা নিয়ে আসেন। তিনি কিন্তু তার কমিউনিটির জন্য কাপটা আনেন না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মনিসা মান্দা, মারিয়া মান্দারা কখনো সাকিব আল হাসানের মত হতে পারেন না। কেন পারেন না, প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জাতীয় দলে আজ পর্যন্ত কয়জন আদিবাসী খেলার সুযোগ পেয়েছে? কারণ কি তারা খেলতে জানে না?

ফুটবল খেলা যখন আসে তখন আপনার মনে হবে আদিবাসী মেয়েদেরকে দিয়ে ফুটবল খেলা খেলায়। সাফ যখন হবে, বিশ্বকাপ যখন হবে, তখন আপনার মনে হবে সংস্কৃতি দেখানোর জন্য আদিবাসী মনিপুরি নৃত্য দেখায়। কর্ণফুলী টানেল উদ্বোধন করবেন, তখন আদিবাসীদের নাচ দেখিয়ে ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রতি অনেক বেশি শ্রদ্ধাশীল হবেন, আর আপনি ভুলতেই পারবেন না এত সুন্দর বৈচিত্র্য। আর যখন সেখান থেকে একটা মানুষ গুম হয়ে যায় তার কোনো হদিস আমরা পাই না। আমরা আজও জানি না কল্পনা চাকমা কোথায়?

কল্পনা চাকমা কোথায় আছে আমরা আজও জানি না। আমরা জানিই না কল্পনা চাকমা কে? নতুন জেনারেশন জানে নাকি কল্পনা চাকমা কে? পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন হয়েছে তারা জানে নাকি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কে? জানে না, তার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র জানাতে বা জানতে দেয় না। রাষ্ট্র খুবই সচেতনভাবে এই সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনীতিতে কখনো এই সংখ্যালঘু কমিউনিটিকে সামনে আসতে দেয় না। রাষ্ট্রের চরিত্র যদি আমরা বদলাতে না পারি তাহলে কখনোই রাষ্ট্র পরিবর্তন হবে না।

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের সংবিধান রচনা করেছেন আম্বেদকর। তিনি একজন দলিত সমাজের লোক ছিলেন। কিন্তু উনাকে এই সুযোগটা দেয়া হয়েছিল, আমার রাষ্ট্র সেই সুযোগটা দেয় না কেন প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে। পার্বত্য চুক্তি নিয়ে যখন আপনি কথা বলছেন, সেই চুক্তির বিষয়বস্তু আপনার বিষয়বস্তু কেন হলো। সেই চুক্তি শুধুমাত্র বিসিএসের ঐচ্ছিক পেপারের মধ্যে কেন সীমাবদ্ধ থাকলো? সেই চুক্তি সম্পর্কে আমাদের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক অথবা স্নাতক পর্যায়ে কোথাও পড়ানো হয়নি।

আপনাদের চুক্তি তো বিশাল বড় একটা চুক্তি। আপনি তো কামনা করেছেন যে সকলে আপনাকে সহযোগিতা করবে। আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, ভূমি অধিকার ফেরত দিবেন। তাহলে ২৬ বছরে কেন আপনি ভূমি অধিকার ফেরত দিচ্ছেন না। এই ভূমি অধিকার ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যারা এই আমলাতন্ত্রের মধ্যে আছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা জরুরি আসলে এই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের অথবা আদিবাসীদের ভূমি অধিকার, বনের অধিকার, এই অধিকার তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত, এই সম্পর্কে তারা সচেতন কিনা। মানবিক মূল্যবোধ তাদের কাছে আছে কিনা। সেই আলাপটা আমাদের জানতে হবে।

আমি আজকে এতটুকুই বলবো, এই চুক্তিকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের যে বিভিন্ন প্লাটফর্ম আছে সেগুলোকে একসঙ্গে করা খুব জরুরি। রাষ্ট্রের যে ভিন্ন দ্বিচারিতার রূপ আছে সেই রূপকে সামনে নিয়ে আসা জরুরি। তরুণ সমাজকে বলবো, আপনারাই হচ্ছেন ভবিষ্যৎ, কারণ আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছে পুরো আগামীর বাংলাদেশ, কারণ আপনারা কোনো বিচ্ছিন্ন গ্রুপ না, আপনারাই শক্তি। চিরকাল ধরে আদিবাসীদের যত আন্দোলন আছে সেই আন্দোলনে কিন্তু আপনাদের ভূমিকা রয়েছে। আপনাদের সাহসের কাছে সকলেই পরাজিত হয়। আপনাদের সাহসকে জিইয়ে রাখবেন। সকলকে ধন্যবাদ।

‘পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছেন’

মোস্তফা আলমগীর রতন
কেন্দ্রীয় সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সেই স্বাধীনতার পরই কিন্তু আমাদের যে সংবিধান, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য যে সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত যে সংবিধান, সেই সংবিধান প্রণীত হওয়ার সময় আসলেই এক দশমাংশ অঞ্চলের মানুষকে ভিন্নভাবে উত্থাপিত করা হয়েছে। যার সংকট আমরা দেখেছি দীর্ঘ দুই যুগ সশস্ত্র

সংগ্রাম এবং সেই সশস্ত্র সংগ্রাম অবসানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমাধান এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিচুক্তি হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর।

সেই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা মনে করেছিলাম সেখানকার এই এক দশমাংশ অঞ্চলের মানুষের, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের আর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে না। আমি তখন ছাত্র রাজনীতির কর্মী। আমি দেখেছিলাম, ওখানকার রাঙ্গামাটির দেয়ালে দেখেছিলাম, 'যে জীবন শৃঙ্খলিত, বুটের তলায় নিষ্পেষিত, সে জীবন আমরা না', আমি সবসময় তা মনে করি। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজবার যে চেষ্টা করা হয়েছিল, আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরের পরই এই বিষয়গুলি নিয়ে আর কথা বলতে হবে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ২৬ বছর পরেও একই কথা বলতে হচ্ছে।

আমরা দেখেছি, জাতিসংঘের অধিবেশনে সরকার যে ঘোষণা দিয়েছে, সেটা আমি পেপারে পড়ছিলাম, সেখানে দেখছিলাম, যে ৭২ টি ধারা আছে, তার মধ্যে সরকার বলছে ইতিমধ্যেই ৬৫টি ধারা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। প্রকৃত পক্ষে তা অসত্য। আমরা ধন্যবাদ জানাই যে, আজকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন নামে একটি প্লাটফর্ম গড়ে উঠেছে। লড়াই এবং সংগ্রাম ছাড়া যেমন মুক্তিযুদ্ধ হয় নাই, সশস্ত্র সংগ্রাম লেগেছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য, তেমনিভাবে আমি দেখলাম যে আমাদের এই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির ভাই যে কথা বলেছে, আমিও তাই মনে করি।

নিশ্চয়ই আমরা দৃঢ় কণ্ঠে বলতে চাই যে, ওয়ার্কার্স পার্টি সবসময় আপনাদের সঙ্গে ছিল, আগামীতেও থাকবে এবং এই লড়াই-সংগ্রামকে যদি যৌক্তিক রূপ দিতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনাদের নিজেদের শক্তিকে প্রদর্শন করা দরকার। সেই শক্তি রাজনৈতিক শক্তি। আমি সেই কারণেই বলবো, এই চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যে প্লাটফর্ম গড়ে উঠেছে সেই প্লাটফর্মে কিন্তু আমরা ওয়ার্কার্স পার্টি সেখানে ভূমিকা রাখছি। আমরা দুই যুগ্ম সমন্বয়কারীকে বলবো, আপনারা আরো ভূমিকা নিন এবং একই সঙ্গে জনসংহতি সমিতি ও আদিবাসী ফোরামসহ সমতলের সকল মানুষকে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি কয়েকটি বিভাগে এই কর্মসূচি পালন করতে। যে বিভাগগুলোতে হয়নাই সেই বিভাগগুলোতেও করা দরকার।

সরকারের কাছে আমি দাবি করতে চাই, অবিলম্বে ভূমি কমিশন যেটাকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে, সেটাকে কার্যকর করা হোক, আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতা দেয়া হোক। পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিকীকরণ করা হয়নি, আপনারা দেখেছেন যে, কথায় কথায় শাসন এবং শোষণ চলছে।

জনমিতি বদলে গেছে। আমরা দেখি, পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা, উপজেলা, পৌরসভাগুলোতে সেখানে যারা স্থায়ী অধিবাসী আদিবাসীরা ৫০ শতাংশের নিচে নেমে সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছেন। এরমধ্যে একটা গভীর রাজনীতি রয়েছে। আপনাদের লড়াই-সংগ্রাম অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।

'আদিবাসীদের সমস্যা জাতীয় সমস্যা'

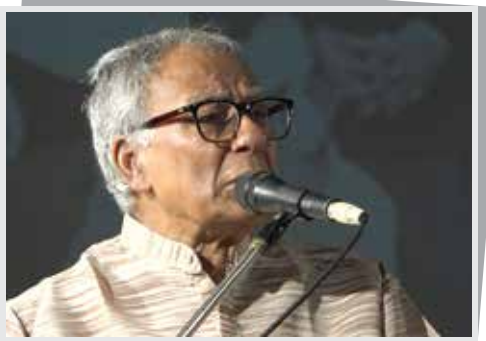

অ্যাডভোকেট এস এম এ সবুর
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ

আজকের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশের সংগ্রামী সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাণপ্রিয় নেতা, তাদের লড়াই-সংগ্রামের নেতৃত্বের সিংহ-পুরুষ, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই যাঁরা উপস্থিত আছেন এবং মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন।

বিষয়টি হলো, যে কথাটি এখানে আসছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে শান্তিচুক্তি, এই শান্তিচুক্তিটি কেন? আর সেই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আজকে আমাকে আলোচনা সভা করতে হবে কেন? যে সরকার বা রাজনৈতিক দল শান্তিচুক্তি করেছিল তারাই আজকে ক্ষমতায়। অতএব এই সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এই চুক্তি বাস্তবায়নের। তার জন্যে আমাকে আন্দোলন করতে হবে এই কথাতো ছিল না। আন্দোলন করবো কেন? আমরাতো সশস্ত্র লড়াই সংগ্রামে ছিলাম। আমার অধিকার, আমার দাবি বাস্তবসম্মত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বলেই আপনি তো আমাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিলেন। এটাতো কোনো দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় না। বিষয় ছিল, আমার অধিকার তুলে ধরেছি এবং সে অধিকার, সে দাবি বাস্তবসম্মত, ন্যায়সম্মত, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বলেই আপনি আমার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

দীর্ঘদিনের একটা সশস্ত্র লড়াই-সংগ্রাম এবং এই উপমহাদেশে এটা বার বার হয়ে আসছে। আমরা সিধু-কানুকে দেখেছি, আমরা চাকতি মুন্ডাকে দেখেছি, অতএব আমাদের অভিজ্ঞতাতো আছেই। অতএব আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে সরকারের প্রতি এবং সুধী সমাজের কাছে যে কথাটি তুলে ধরতে চাই, এইখানে 'চিটাগাং হিলট্র্যাক্টস রেগুলেশন' চালু ছিল। এটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য না, এটা মায়ানমার এবং উত্তর ও পূর্ব ভারতের জন্যও। আমরা হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশনে দেখেছি, সেখানে এই পার্বত্য এলাকার বাইরের কোনো লোকের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ বা অধিকার ছিল না, কোনো ভূমি ক্রয় করা বা অর্জন করার সুযোগ ছিল না।

আমার নিজেরই একটা মামলা লড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো একটি জেলার চেয়ারম্যান তার পৈত্রিক সম্পত্তির জায়গায় কোনো এক অনুপ্রবেশকারী সমতল থেকে যাদেরকে জিয়াউর রহমানের আমলে পাহাড়ে ঢুকিয়ে সেখানে বসতিপ্রদান করা হয়েছিল, দেখা গেল তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো একটা জেলার চেয়ারম্যান হয়েও নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারলেন না, হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা করতে হয়েছে।

এখন যেটা বলতে চাই সেটা হলো, এই চুক্তির প্রধান যে বিষয়টি ছিল সেটি হচ্ছে ভূমি সমস্যা। সেই ভূমি সমস্যাকে সমাধান করতে হবে। আমার অন্য একটা গণসংগঠন মানে বাংলাদেশ কৃষক সমিতির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় সম্মেলন হয়েছে বগুড়ায়, সেখানে আমাদের যে চার/পাঁচটি দাবি হচ্ছে তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সংরক্ষণ। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান আমাদের একজন রিটায়ার্ড জাস্টিস, তার সঙ্গে ভূমি কমিশনের বিষয়ে কথা হচ্ছিল। জানতে চাই, আপনার অভিজ্ঞতা কি? তিনি বললেন যে, অভিজ্ঞতা অত্যন্ত দুঃখজনক। দরখাস্ত আছে, আমরা সমস্যা সমাধানের কোনো ফয়সালা করতে পারি না।

তাহলে একটা কথা হচ্ছে, এই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কাপ্তাই বাঁধ যখন নির্মাণ করা হচ্ছে, সেই সময় আমরা দেখেছি হাজার হাজার আদিবাসীকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে, দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। আর পার্বত্য শান্তিচুক্তির আগে আমরা দেখেছি দীর্ঘদিনের সশস্ত্র লড়াই। লড়াই কখন হয়? অস্ত্র কখন হাতে তুলে নেয়া হয়? যখন কাউকে তার সম্পত্তি, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, উৎখাত করা হয়, তখন সে রুখে দাঁড়ায়। ক্ষোভের থেকে বিক্ষোভ, যখন সেটাও না হয়, তখন সশস্ত্র লড়াইয়ে যায়।

একটা ছোট কথা উল্লেখ করতে চাই। আমার অভিজ্ঞতা আছে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরে ১৯৬৭ সালে ন্যাপের কেন্দ্রীয় সম্মেলন হলো পেশোয়ার। সম্মেলন শেষে করাচিতে যখন ফিরে আসলাম, তখন বেলুচিস্তানের দুইজন নেতা আসলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, সঙ্গে একটা টগবগে যুবক আমার চাইতে অন্তত ৫/৬ ইঞ্চি লম্বা। তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো বেলুচিস্তানের সশস্ত্র লড়াই-সংগ্রামের সে হচ্ছে একজন সেনাপতি। কী হয়েছে বেলুচিস্তানে সেখানে তাদের ভূমির অধিকার, মৌলিক অধিকারের জন্য লড়াই করতে যেয়ে? তাদের যে ঈদের জামাত, সেই ঈদের জামাতের পরে প্লেন থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল। সেগুলো তো আমরা দেখেছি, এখানেও দেখতেছি।

অতএব, আমি আবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই, আদিবাসী সমস্যা এটা হলো জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা তো আমি সবখানেই দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি পার্বত্য চট্টগ্রামে, দেখতে পাচ্ছি কাশ্মিরে, দেখতে পাচ্ছি মনিপুরে, অতএব এই সমস্যা জাতীয় সমস্যা। সুতরাং আসুন, আমরা যারা বিশ্বাস করি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণ করা, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের রক্ষা করা তথা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া- এটা আমাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব, এটা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, এটা আমার মানবিক দায়িত্ব। এটা শুধু রাজনৈতিক অধিকার নয়, মানবিক অধিকারও বটে। এটা আদিবাসীদের সমস্যা না, এই সমস্যা জাতীয় সমস্যা। শরীরের যেকোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে শরীর সুস্থ বলা যাবে না। আমি সমগ্র জাতিকে সুস্থ জাতি দেখতে চাই, সমস্ত বঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষা হোক এটা চাই এবং তার জন্য লড়তে চাই।

আসুন এখানে যারা এই আদিবাসীদের সমস্যা নিজের রাজনৈতিক দলের সমস্যা বলে মনে করেন, জাতীয় সমস্যা বলে মনে করেন তাদের আগামী দিনে এটা শুধু আদিবাসী নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব না, দায়িত্ব জাতীয় নেতৃবৃন্দেরও। আমরা সবাই মিলে অন্তত পক্ষে আজকে রাজনীতির যে ধারা আছে তার বাইরে বামপন্থী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তির জন্যে যে যে কর্মসূচি হাতে নেয়া দরকার, তার সঙ্গে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়টাকে কর্মসূচিতে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে সমাবেশ করি। সেখানে আওয়াজ তুলি যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে, তার সমস্ত অধিকার, ভূমির অধিকার, ভাষার অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ। তার সঙ্গে ঐক্য ন্যাপের পক্ষ থেকে জানাই ধন্যবাদ।

‘পার্বত্য চট্টগ্রামে আধা-সামরিক শাসন চলছে, এর অবসান ঘটাতে হবে’

সোহরাব হোসেন
কবি ও সাংবাদিক

২৬ বছর আগে চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির দুটি পক্ষ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র। সেই চুক্তি ২৬ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি অর্থাৎ চুক্তির দুটি পক্ষের একটি পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করেছে। সেই পক্ষের নাম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। সুতরাং সংলাপটি কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

চুক্তি যারা বাস্তবায়ন করেনি তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদেরকে চুক্তি বাস্তবায়নে বাধ্য করতে হবে। বাধ্য করা শুধু আদিবাসী বা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নয়, শুধু জনসংহতি সমিতির দায় নয়। যদি আমি মানবাধিকারে বিশ্বাস করি, সমতায় বিশ্বাস করি, যদি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকারে বিশ্বাস করি, যদি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য এবং ভূমির অধিকারে বিশ্বাস করি তাহলে এই দায় আমাদেরও। আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু শুধু সভা-সমাবেশ করে হবে না, আন্দোলন করতে হবে অবশ্যই গণতান্ত্রিক পথে। সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে যেই পরিস্থিতিতে পাহাড়িরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল সেটি আর তৈরি করবেন না।

শুধু জাতিসংঘে বা আন্তর্জাতিক ফোরামে চুক্তির কতটুকু অংশ বাস্তবায়িত হয়েছে এই ছেলেভোলানো কথা বললে কাজ হবে না। চুক্তির মূল মর্মার্থ, যেটা চুক্তির মূল কথা ছিল, পাহাড় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর হবে, সেখানে তাদের কর্তৃত্ব থাকবে, তাদের শাসন থাকবে। এর অর্থ এই না যে, বাঙালিরা বসবাস করতে পারবে না। কিন্তু সেখানে তাদের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্র গত ২৬ বছর ধরে অন্ধ, বধিরের ভূমিকা পালন করে আসছে। তারা মনে করেছে, চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে- এর মাধ্যমে পাহাড়িদের অস্ত্র সমর্পণ করা হয়েছে এবং তাদের কিছু কিছু লক্ষ্য, অংশ বাস্তবায়ন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। কিন্তু তাদেরকে বোঝাতে হবে তারা যা বলছে, যা করছে তা ঠিক নয়। পথিক তুমি পথ হারিয়েছ, এই পথ হারানোটা যদি চলতে থাকে, পাহাড়ে আবারো অশান্তি দেখা দেবে। আবার সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন আধা-সামরিক শাসন চলছে। এই আধা-সামরিক শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। সেখানে সুলতানা কামাল যেতে পারেন না, কারণ তিনি পাহাড়িদের পক্ষে কথা বলেন। সেখানে তাকে অঘোষিতভাবে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। আরো অনেককে করা হয়েছে যারা পাহাড়িদের পক্ষে কথা বলেন। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের কথা বলার যেসব ফোরাম, সংগঠন, যেসব ক্ষেত্র সেগুলো প্রায় সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। সংসদ হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলার একটি জায়গা। কিন্তু গত ২ টি সংসদ কিভাবে চলেছে আপনারা তা দেখেছেন। সেখানে তারা ভুলে গেলেন, অবশ্যই পাহাড়িদের অধিকার আদায়ের সঙ্গে আছেন, কিন্তু সংসদে পাহাড়িদের পক্ষে কোনো সংসদ সদস্যকে বলতে দেখিনি। অর্থাৎ তারা সবসময় ভয়ে ছিলেন এবং এখনো আছেন। আগামী সংসদে যারা আসবেন, কিভাবে আসবেন আমি তা জানি না। কিন্তু সেই সংসদে নিপীড়িত মানুষের কথা, নিপীড়িত মানুষের দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হবে আমি এটি বিশ্বাস করি না।

সুতরাং অন্যান্য ফোরাম, সামাজিক ফোরাম, নাগরিক ফোরাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন যারা করছেন তাদেরও শুধু এই সমস্যাটি পাহাড়িদের, এই সমস্যাটি কিছু মানুষের এই চিন্তাটিকে বাদ দিয়ে এই সমস্যাটি রাষ্ট্রের সেটি সবাইকে মাথায় রাখতে হবে।

এই ধরনের চুক্তি তো শুধু বাংলাদেশে হয়নি, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের রাজ্যে অনেকগুলি চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তি কিভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে সেটিও পরীক্ষা করে দেখা দরকার এবং চুক্তির অবশ্যই একটি বাস্তবায়ন সীমারেখা থাকতে হবে যে, এত বছরের মধ্যে, আগামী ১ বছরের মধ্যে, আগামী ২ বছরের মধ্যে এই চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই। অন্যথায় আন্দোলনই বলে দেবে কিভাবে চুক্তি বাস্তাবায়ন করতে হবে।

যারা আজকে তরুণ প্রজন্ম তারা হতাশায় আছেন। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, সারা দেশেই। এই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যদি আমরা আশা জাগরিত করতে না পারি, যদি আমরা সংগ্রামে

তাদেরকে যুক্ত করতে না পারি, তাহলে শুধু পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন নয়, বাংলাদেশের নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের যে চুক্তি, প্রতিটি চুক্তি ভঙ্গ হতে থাকবে। নাগরিকের ভোটাধিকার থেকে শুরু করে সব অধিকার নস্যাৎ হতে থাকবে, যেটি কখনো একটি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য কাম্য নয়। ১৯৭১ সালে এই রাষ্ট্র যে প্রত্যয় নিয়ে গঠিত হয়েছিল, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সাম্য তার কোনোটাই এখন অবশিষ্ট নেই। আসুন, আমরা একাত্তরের প্রত্যয়ে এই পাহাড়িদের অধিকার আদায়ের ন্যায্য আন্দোলনে যুক্ত হয়ে তাদের সঙ্গে থাকি, তাদের পাশে থাকি এবং তাদের আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলন বলে স্বীকার করি। সবাইকে শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ।

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ পুরো বাংলাদেশে আদিবাসীরা অস্তিত্বের সংকটে রয়ে গেছে’

অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস
শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নির্বাহী সভাপতি, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন

আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভা প্রধান, আদিবাসী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা সহ মঞ্চে উপবিষ্ট আদিবাসীবান্ধব যেসব বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতারা আছেন এবং আপনারা যারা সামনে আছেন।

আমরা যেটা বলি যে, কোনো দেশে যদি কোনো প্রধান জাতিগোষ্ঠীর বাইরে কিংবা প্রধান ধর্মগোষ্ঠীর বাইরে অন্য জাতির, অন্য ধর্মের, অন্য সংস্কৃতির মানুষ থাকেন, যেটা পৃথিবীর সব দেশেই থাকে, সবচেয়ে সভ্য রাষ্ট্রের নমুনা হচ্ছে তাদের স্বীকৃতি প্রদান করা, তাদের স্বীকৃতি দেয়া, এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। তাকে স্বীকৃতি দিতে হয় সংবিধানের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় পলিসির মধ্যে। বলা হচ্ছে, যদি স্বীকৃতি নাও দেওয়া যায়, দ্বিতীয় ধাপে মনে হচ্ছে এই যে, অন্তত এই যে ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন চিন্তার মানুষ থাকেন তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের শ্রদ্ধা করা। স্বীকৃতি, সম্মান প্রদর্শন এই দুটো যদি না করা যায়, অন্তত তাদেরকে যেন সহ্য (টোলারেট) করা হয়, যেন সহ্য করা হয় যে, তারাও আছেন, সবাই আমার মত না আসলে। আমার বাইরেও অন্য জাতি, অন্য ধর্মের, অন্য সংস্কৃতি, অন্য ভাষার মানুষ এই রাষ্ট্রে বিরাজমান, বর্তমান তারা থাকেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের সংবিধান থেকে শুরু করে সর্বত্র, সংবিধান খুললে দেখবেন, দেখে মনে হবে এটি একটি বাঙালি মুসলমানের রাষ্ট্র। এখানে কেবল বাঙালি, ‘বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হবেন’ এই রকম নৃবৈজ্ঞানিক অসত্য শব্দ আমাদের সংবিধানের মধ্যে রয়ে গেছে। আমরা তো মনেকরি, বাংলাদেশে ১০০টিরও বেশি আদিবাসী জাতি বাস করে, সবাই বাঙালি কিভাবে হয়ে গেল? এটা সংবিধানের মধ্যে আছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তাহলে বাকি ধর্মের স্বীকৃতি আমাদের সংবিধানে কোথায় আসলে! এই সংবিধান পড়লেই মনে হবে, এটা কেবল বাঙালির রাষ্ট্র এবং কেবল মুসলমানের রাষ্ট্র। এই যে রাষ্ট্র পরিচালনার একটা নীতি, এটিকে বলা হয় ‘মনোলিথিক রাষ্ট্র’। মনোলিথিক রাষ্ট্র মানে, যে রাষ্ট্রে কেবল একটি জাতি, যেমন আমরা বাঙালি রয়ে গেছি, কেবল একটি ধর্ম ইসলামের প্রাধান্য থাকবে। কাজেই বাঙালি মুসলমানের রাষ্ট্র বানানোর যে আয়োজন, রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ নীতি যদি হয় সংবিধান এবং তার মধ্যে যদি এটা প্রথিত থাকে, তাহলে প্রতিদিনকার আমাদের যে জীবন, তার মধ্য এটি প্রতিফলন হতে বাধ্য এবং সেটিই কিন্তু আমরা সর্বত্র দেখছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রথম বাক্যেই তো বলা হয়েছে যে, এটি যারা পাহাড়ি মানুষ তাদের অধ্যুষিত অঞ্চল হবে। কিন্তু সেখানে গেলেই দেখবেন হোটেলের নাম হচ্ছে সুফিয়া। খাগড়াছড়িতে যান, আগের যে এমপি ছিল (বিএনপির), পাড়ার নাম দিয়েছেন ‘ওয়াদুদ পল্লী’। তো এগুলো কি আদিবাসী অধ্যুষিত শব্দ? পার্বত্য চট্টগ্রামে আমি বহুবার গেছি, যেটা হচ্ছে- একটা উগ্র ইসলামিকরণ হচ্ছে, উগ্র বাঙালিকরণ হচ্ছে এখানে একটা, উগ্র ধর্মান্তরকরণ হচ্ছে এখানে। মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গা থেকে একটা উগ্র ইসলামের জায়গা তৈরি করা হচ্ছে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে নই কিন্তু, আমরা বলছি উগ্র ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এবং আমরা বলেছি যে, বাংলাদেশের সব জায়গায় আপনি একটা সিভিল প্রশাসন দিয়ে চালাবেন, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে গেলেই মনে হবে একটা সেনাশাসিত অঞ্চল। আবারও বলি আমি, আমরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে না। একটা স্মার্ট আধুনিক সেনাবাহিনী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য খুবই দরকার। কিন্তু আমরা অবশ্যই সেনাশাসনের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের ৬১ টি জেলায় সিভিল

প্রশাসন আর ৩ জেলায় আপনি সেনাশাসন চালাবেন, এটা দিয়ে বাংলাদেশ খুব বেশিদূর যেতে পারবে না। কেন এরকম হয় বোঝার চেষ্টা করছি আমরা। আজকে যখন ডিসেম্বর মাসের কথা বলছি, বিজয়ের মাসে, সেই বাঙালিরা পাকিস্তানের ২৪ বছর জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের উপর নিপীড়ন করেছিল। এই বাঙালিরাই ২৪ বছর ভাষাগত নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। উর্দু ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলেছিল এবং পাকিস্তানের ২৪ বছরই আমরা সামরিক নিপীড়নের শিকার হয়েছিলাম।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই, এটা আফসোসের ব্যাপার, যে বাঙালিরা এক সময়কার নিপীড়িত, নির্যাতিত, আদিবাসীদের প্রশ্নে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশ্নে সেই বাঙালিরাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন চালাচ্ছে, সেই বাঙালিরাই জাতিগত নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং আদিবাসীদের ভাষাগুলোর উপরও এক ধরনের আধিপত্য চালাচ্ছে। ফলে পাঁচটি ভাষার বাইরে বাকি ভাষা, আদিবাসীদের মাতৃভাষার বই এখনো পর্যন্ত আমরা নির্মাণ করতে পারি নাই। এর কারণটা বোঝার চেষ্টা করি। এক সময়কার নিপীড়নটা ভুলে যাই কিভাবে আমি? নিপীড়িত জাতি কিভাবে নিপীড়নকারী হয়ে উঠে?

তার একটা বড় উদাহরণ খুঁজে পাবেন আজকে গাজা, ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের সংকটের মধ্য দিয়ে। আমি ইহুদিদের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই, দিনের পর দিন আমি কষ্ট পেয়েছি, তাদের জন্য আমি কেঁদেছি যখন আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস পড়ি। পৃথিবীতে এত বেশি মানুষকে একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে হত্যা করা হয় নাই। ৬০ লক্ষ মানুষ ইহুদি, নারী-পুরুষ-শিশু, কোনো কারণ নাই, জাস্ট তারা ইহুদি, এই কারণে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বার দিয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে। এত নির্যাতন-নিপীড়ন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও নাই। সেই নির্যাতিত ইহুদিরা, তারা যখন রাষ্ট্র বানাল একটা, জায়োনিস্ট রাষ্ট্র, ইসরাইল আজকে তারা কিভাবে নিপীড়কের ভূমিকাই অবতীর্ণ হচ্ছে। গাজাতে ১৪ হাজার মানুষকে মেরেছে, ৫ হাজার শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, কয়েক হাজার নারীকে হত্যা করা হয়েছে। তার মানে, যাদের এত নির্যাতন-নিপীড়নের ইতিহাস, নির্মমতা, তারা কিভাবে একটা বড় নির্যাতনকারী, নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়? এটা একটা দেখবার বিষয় আসলে।

সমাজবিজ্ঞানে উহারহণ রয়েছে, একসময়কার যারা কলোনাইজার এবং এক সময়কার যারা কলোনাইজ, উপনিবেশিত মানুষ এবং যারা উপনিবেশ স্থাপনকারী মানুষ, তাদের যে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদ এটা আত্মস্থ হয়ে যায়। তার মানে নির্যাতনকারী এবং নির্যাতিত, তাদের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্যাতন আমার ভিতরে আত্মস্থ হয়ে গেছে। কাজেই বাঙালি জাতির মধ্যে নিপীড়নটাই আত্মস্থ হয়ে গেছে যে কারণে আমি সুযোগ পেলেই কিন্তু নিপীড়নটাকে ব্যবহার করছি নানান ফর্মে। সেটিই কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা বড় জায়গা। রাষ্ট্র দৃষ্টিভঙ্গিটা কী? রাষ্ট্র যাদেরকে আপন মনে করে তাদেরকে বাস ভর্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়ে বসতি করায়, তাদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করে, তাদের জন্য জমিজমার ব্যবস্থা করে এবং যেসব পাহাড়ি উদ্বাস্তু ছিল তাদের জায়গাগুলো দখল করে ওদের বসতিস্থাপন করেছে এবং ফিরে আসার পরেও তাদেরকে সেই জায়গাগুলো দিচ্ছে না। আর যাদেরকে পর মনে করে, তাদেরকে দূরে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় অরুণাচলে। আমি একটা উদাহরণ দিই। আমি কয়েকদিন আগে দেখলাম, দিল্লীর একটা কাগজে, রঞ্জন বসু, সে লিখেছে যে, ১৯৬০ সালে কাপ্তাই লেকের কারণে প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন চাকমারা, যাদের ৭০% ভাগ, তাদের একটা বড় অংশ ত্রিপুরা গেছে, মিজোরাম গেছে এবং একটা বড় অংশ গেছে অরুণাচলে।

প্রায় লক্ষাধিক চাকমা কিন্তু অরুনাচলে আছে ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে এবং সেই চাকমারা ওখানে নেফায়, আজকে যে অরুণাচল প্রদেশ, তিরাগ জেলা, তার ডেভেলপমেন্টের সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে চাকমারা। তারা খুব ইনটেলিজ্যান্ট, পড়াশুনায় খুব ভালো। এখন এতগুলো বছর পরে এসে গত কয়েক মাস আগে নিউজে দেখলাম 'All Arunachal Pradesh Students Union (AAPSU)', তারা বলেছে, এই চাকমারা ভারতীয় নাগরিক না, তাদেরকে আবার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হোক, ৭০ বছর পরে। বাংলাদেশ থেকে তাদের লেকে জায়গা, বাড়িঘর, চাষযোগ্য ভূমি ডুবে গেছে, উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে গেছে। ৭০ বছর পরে বিজেপি-কংগ্রেস একজোট হয়েছে যে, তাদেরকে এখান থেকে বের করে দিতে হবে। তাহলে মানুষের নিপীড়ন-নির্যাতন-বঞ্চনা এর মাত্রা কতদূর যেতে পারে! তারা ভারতীয় নাগরিকও না, বাংলাদেশেরও না, কোথায় গেছে তারা? এতগুলো বছরের যে বঞ্চনা, এত কষ্ট পেয়ে। এগুলো নিয়েছে কেন? উন্নয়নের নামে, যে কাপ্তাই লেক থেকে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি হবে, বিদ্যুৎ হবে। কোনো আদিবাসী বিদ্যুৎ পায়নি, ক্ষতিপূরণ পায়নি। চাকমা রাজবাড়িটা পর্যন্ত ঐ কাপ্তাই লেকে ডুবে গেছে। এই কারণে আমি দেখেছি আদিবাসীরা উন্নয়ন শব্দটাকে ভীষণ ভয় পায়। উন্নয়ন হলেই কি আবার বাড়িঘর ডুবে যাবে কিনা? মধুপুরে ভয় পায় যে, ইকোপার্ক হলেই এখানে দেয়াল উঠবে, আবার হত্যা করা হবে কিনা চলেশ রিছিলদের মত?

কাজেই আজকাল যেটা আমরা বলি যে, উন্নয়ন যার জন্য, যাদের জন্য, তারা কী চায় এবং কিভাবে চায় সেটাই হচ্ছে উন্নয়নের মূল মাপকাঠি। যেমন চুক্তি হয়েছে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে, তারা যদি মনে করে চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছে

তাহলেই হয়েছে, সরকার বললে হবে না। কাজেই, যার সঙ্গে চুক্তি সে মনে করছে যে চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি, মাত্র ২৫টি ধারা হয়েছে, সেটিই হচ্ছে ভ্যালিড বা মূল্যবান কথা। আপনি দাবি করলে তো হবে না আসলে, তারা মনে করছে না এবং আজকাল উন্নয়নের, ইউএনডিপি থেকে শুরু করে জাতিসংঘের সংজ্ঞাই হচ্ছে, যার জন্য উন্নয়ন সে যদি মনে করে যে উন্নয়ন, তাহলে সেটাই উন্নয়ন। এখানে ৫ তলা একটি বিল্ডিং তুলে দিলে সে যদি মনে করে উন্নয়ন না, তাহলে সেটা কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না।

একটা ডেমোগ্রাফিক পলিটিকস শুরু হয়েছে যে, কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদেরকে মাইনোরিটি করা যায়। আজ থেকে ১০০ বছর আগে যান, ২ ভাগ ওখানে বাঙালি ছিল, ৯৮ ভাগ আদিবাসী পাহাড়ি ছিল। আজকে ডেমোগ্রাফি কিন্তু পাল্টে গেছে, ৫৫ ভাগ আদিবাসী, ৪৫ ভাগ কিন্তু বাঙালি মানুষ। ১০ বছর পরে এই ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলে আদিবাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে মাইনোরিটি হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় Unpeopling। Unpeopling শব্দের মানে হচ্ছে, যেমন এই যে মেইনথিন প্রমিলা, আমার খুব প্রিয়, তাদের ঐখানে যাই, একসময় সেখানে বরগুনাতে ৬০-৭০ হাজার ছিল রাখাইনরা, এখন তাদের সংখ্যা একজন বললো ২,৩৫১। তার মানে দেখেন, গুনে পাওয়া যায়নি ২,৩৫১ টা রাখাইন মানুষ এখানে আছে। ৫ বছর পরে একজন রাখাইনও থাকবে না। কাজেই এটাকে সংখ্যালঘু বলে না, এটাকে বলে সংখ্যা শূন্যকরণ। Unpeopling মানে হচ্ছে, একসময় এখানে মানুষ ছিল, রাখাইনরা ছিল, তাদের গান ছিল, ঘুম পাড়ানির গান ছিল, মায়েরা গান শোনাতেন, সেই সত্যিকারের মানুষগুলো নাই। তারা যে একসময় ছিল তার জন্য একটি জাদুঘর আছে, তুমি গেলে আর্কাইভ দেখতে পারবা, কাগজ আছে, ছবি আছে, তাদের পোশাক আছে, খাদ্য কী ছিল সেগুলো লিখে রাখে। এই Unpeopling প্রক্রিয়া কিন্তু সেখানে শুরু হয়ে গেছে। এটিকে বলে একধরনের অস্তিত্ববাদের সংকট। পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পুরো বাংলাদেশে আমাদের আদিবাসীরা একধরনের অস্তিত্বের সংকটে রয়ে গেছে। এবং এভাবে চলতে থাকলে তাদেরকে আরো কোনঠাসা করা হবে এবং আরো প্রান্তিক করা হবে।

এখন তাহলে করতে হবে কী? অনেকে বলেছেন, সন্তু লারমাই কেন ২ লাখ মানুষ নিয়ে ঢাকা শহরে আন্দোলন-সংগ্রাম করেন না। না, এটি শুধু সন্তু লারমার কিংবা আদিবাসীদের সংগ্রাম না। আমি কেন নারী অধিকার নিয়ে কথা বলি? আমি এটা বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের নারীদেরকে মুক্ত করতে না পারলে পুরুষ হিসেবে আমার মুক্তি কোনোদিন সম্ভব না। এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের উচিত ভারতবর্ষের যেসব শ্রমিকরা আন্দোলন করছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা। কারণ ভারতীয় শ্রমিকদেরকে স্বাধীন করতে না পারলে ইংল্যান্ডের শ্রমিকরা কোনোদিনই স্বাধীন হতে পারবে না। কাজেই আমি মনে করি, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশের আদিবাসীরা যদি মুক্ত হতে না পারে, তাদের যদি মুক্তি না হয়, তাহলে বাঙালি অধিপতি গোষ্ঠী হিসেবে আমার মুক্তি কোনোদিনই সম্ভব না। এবং আজকে রাষ্ট্র কিংবা উন্নয়নকে মাপা হয় এটা দিয়েই যে, রাষ্ট্রের যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত সংখ্যালঘু তারা কতটা ভালো আছে। এটা দিয়ে মাপা হয় সেই রাষ্ট্র কতটা উন্নত এবং কতটা অনুন্নত। মনে করা হয়, যদি সংখ্যালঘুরা ভালো থাকে, তাহলে ধরেই নেওয়া হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষরা ভালো থাকবেই। কিন্তু বাংলাদেশে এই আদিবাসীদের যে কষ্ট, তাদের যে দুঃখ, তাদের যে বঞ্চনা, সেগুলো রাষ্ট্র তো দেখছেই না, উল্টো আপনি চাপিয়ে দিচ্ছেন যে, চুক্তি পুরোটা বাস্তবায়িত হয়েছে, আর কোনো কিছু করবার নাই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি একটি অসাধারণ চুক্তি। সেখানে পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদকে যেভাবে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে কাগজে কলমে, সেই মডেলটা পুরো বাংলাদেশে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদে যদি এপ্লাই করা যেতো, তাহলে ক্ষমতার যে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি, সত্যিকারের স্থানীয় সরকারের যে ক্ষমতায়ন বলি, দারুণভাবে এটা বাস্তবায়ন হতে পারত। সেই মডেলটা কিন্তু আমরা আসলে ব্যর্থ বানিয়ে ফেলেছি।

এই যে কালকে আমি, সুলতানা আপা প্রোগ্রামে ছিলাম, মেনন ভাই ছিলেন। মেনন ভাই খুব ভালো কথা বলেছিলেন যে, কোনো আইনই কোনো অবস্থাতেই পাশ হবে না পার্লামেন্টে। উনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন চারবার উনি ঠিক করে দিয়েছেন এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে শুরু করে সবাই ঠিক করে দিয়েছে, আবার যখন আসে, আমলারা একই জিনিস আবারো উপস্থাপন করে। ফাইনালি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যেয়ে কেটে রাখতে হয়েছে। আইনটা হয়েছে, কিন্তু এখনো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। উনি বলেছেন, আইসিটিআই ডিজিটালাইজ হয়েছে, কেন হয়েছে? কারণ, মাঠে একটা আন্দোলন ছিল, সংগ্রাম ছিল, দাবি ছিল। কাজেই আন্দোলন, সংগ্রাম, দাবি দিয়ে যদি কার্যকর চাপ তৈরি করা না যায়, সরকার কোনোদিনই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করবে না। তাকে যতটুকু চাপ দিবেন, আনুপাতিক হারে ততটুকুই বাস্তবায়ন করবে। কাজেই, কথা বলা, আন্দোলন, সংগ্রামের বিকল্প নেই এবং এটি কেবল আদিবাসীদের আন্দোলন না, এটি জাতীয় আন্দোলন। আদিবাসীরা মুক্ত না হলে, নারীরা মুক্ত না হলে, আমরা কেউই বাংলাদেশে মুক্ত হতে পারবো না।

আমাকে শুনবার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনাদের জয় হোক, আদিবাসীদের জয় হোক।

‘আদিবাসীদের জীবন এখন অত্যন্ত দুর্বিষহ’

রবীন্দ্রনাথ সরেন
সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ও
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজকের এই সভার বিপ্লবী সভাপতি, উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুধীবৃন্দ এবং আদিবাসী ভাই ও বোনেরা, সকলকে আমার পক্ষ থেকে, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আমি দু’একটি কথা বলবো, বেশি কথা বলবো না, সেটি হচ্ছে যে, এই সরকার তো আদিবাসীদেরকেই স্বীকার করে না। আমাদের তো সাংবিধানিক স্বীকৃতিই নাই। যার কারণে আমার কাছে মনে হয়, যে চুক্তিগুলো হয় সেই চুক্তিগুলো স্বীকৃতি না দেয়া, বাস্তবায়ন না করা- এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আপনারা দেখুন, রোবায়েত ভাই তো বলেছেন, পাকিস্তান আমলে যখন ২৪ বছর গোলামি করেছি, গোলাম ছিলাম পাকিস্তানিদের কাছে, তখন কেমন লাগতো বাঙালিদের কাছে? ভালো লাগত?

পক্ষান্তরে আদিবাসীদের বৃটিশ আমল থেকে গোলাম করে রাখা হয়েছে। এই সরকারও আদিবাসীদেরকে গোলাম রাখতে চায়। আমরা এখন গোলাম হিসেবে এদেশে বসবাস করছি। এখন আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়াতো বিকল্প নাই। মানুষ আলোচনা করলে অনেক কিছু কথা উঠে আসে, কিন্তু বাস্তব তো ভিন্ন জিনিস। আমরা কতটুকু শক্তি অর্জন করতে পারছি নিজেরা আদিবাসীরা সেটিই বড় কথা। যেমন জাকির ভাই বললেন যে, আপনারা আন্দোলন করেন, ঢাকায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটান। এত সহজ? খালি বললাম, হয়ে গেল! এত সহজ কথা নয়।

এখন একজন আদিবাসী যদি রংপুর থেকে, দিনাজপুর থেকে ঢাকায় চলে আসে, কত টাকা লাগে গাড়ি ভাড়া? বাস যদি আনতে হয়, এখন ৩০ হাজার ৪০ হাজারের নিচে কোনো গাড়ি নাই। এটা কি সম্ভব হবে আমাদের? সম্ভব হবে না, কখনোই সম্ভব হবে না। আমরা করতে পারব না এবং আপনারা দেখেন আদিবাসীদের আন্দোলনে অন্যদের কতটুকু অংশগ্রহণ মানুষের। খুবই কম লোক আসে, ৪/৫ জন লোক আসে। নেতার সঙ্গে ৭/৮ জন আসে, এর বেশি তো আসে না।

আমরা দেখছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নানারকম ঘটনা ঘটছে। ওখানে বড় বড় প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, সেখানে কি আদিবাসীরা সুযোগ পাবে? বাঙালিরাই সুযোগ পাবে। যেমন, বাগদা ফার্ম, ওটাতো দুই হাজার একরের সম্পত্তি, মূলতঃ দুই হাজার একরের থেকে বেশি। সেখানে ইপিজেড হবে। ইপিজেডে কারা কাজ করবেন? সেখানকার আদিবাসীরা হয়তো কিছু কাজ পাবে, যেমন লেবার, মাটি কাটার কাজ, এগুলো করবে, কিন্তু বাইরে থেকে লোক যাবে। সেখানে যে ১৪টি গ্রাম ছিল সেই আদিবাসীদের খোঁজ আজ পর্যন্ত আমরা জানি না কে কোথায় আছে। তারা তো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে গেছে সেই সময়ে পাকিস্তান আমলে এবং অনেকেই ভারতে চলে গেছে। তাদের কোনো হদিস নাই। এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে, হাজার হাজার একর আদিবাসীদের সম্পত্তি এখন বেদখলে। সেই বাগদা ফার্ম যার নেতৃত্বে, যার নির্দেশে ৩ জন আদিবাসীকে গুলি করে হত্যা করা হলো, ২ হাজার আদিবাসীদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হলো, লুটপাট করা হলো সেই এমপি আবুল কালাম আজাদ, সেই চোর-ডাকাত, তাকে আরো নমিনেশন দিয়েছে বর্তমান সরকার। নমিনেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসভা করে বলেছে যে, এখানে ইপিজেড বাস্তবায়ন করবোই। তাহলে আদিবাসীরা এখন কী অবস্থায় আছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তারা আতঙ্কিত।

স্বপ্নপুরি, আমি ওটাতো মরণপুরি বলি। সেই স্বপ্নপুরির মালিক আদিবাসীদের কবরস্থানসহ জমি বেদখল করেছে। তার বিরুদ্ধে মামলা চলছে, তারপরেও তাকে নমিনেশন দেয়া হয়েছে। এরকম অসংখ্য ঘটনা আমাদের রয়েছে।

আদিবাসীদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ। সেজন্যই আমি মনেকরি যে, আদিবাসীদেরকে নিজেদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিশ্চয়ই যারা গণতন্ত্রের মানুষ, যারা বিশ্বাস করেন গণতন্ত্রকে বাস্তবায়ন করতে হবে, সেই মানুষগুলো অবশ্যই আসবে আমাদের সঙ্গে। এখন এটাতো হুজুরের দেশ হয়ে গেছে। এখন আমরা হুজুরের দেশে বসবাস করছি। আদিবাসীদের জীবন এখন দুর্বিষহ। আমরা যতই বলি না কেন আমাদের অধিকার আদায়, অধিকার পাওয়া খুবই কঠিন কাজ এখন এবং লড়াই সংগ্রাম ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নাই। সেই কারণে

আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সকলকে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়েই আমাদেরকে আন্দোলন করতে হবে।

আমরা জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, আমরা তো প্রোগ্রাম করেছি ঢাকায়, আমরা তো পাইনি লোকজনকে। আমিতো বহু নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি কিন্তু কেউ আসেনি। কারণ আমাদেরকে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। কেউতো আসে নাই এবং নেতৃত্ব খর্ব করে দেওয়ার, ধ্বংস করার প্রবণতাও তো আছে আমাদের। তাহলে আদিবাসীরা এগোবে কিভাবে? এগোতে পারবে না তো। এগোতে দেওয়া হবে না। এই হচ্ছে আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং জীবন।

অতএব আমরা আদিবাসীরা সবাই এক হই, তাহলে নিশ্চয়ই অন্যরাও আমাদের সঙ্গে এক হবে এবং সহযোগিতা করবে। কিন্তু খুবই কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটিই আমাদেরকে করতে হবে। একজন ছাত্রনেতা বলছে যে, ওখানে লড়াই সংগ্রাম করব আগের মতো। এখন আপনারা যদি লড়াই সংগ্রাম করেন, আমরা সমতলের আদিবাসীরাও আর চুপ থাকবো না, কারণ গরম হয়ে গেছে, সবাই মাথা গরম এখন। কিন্তু আমাদের আরো দেখতে হবে কৌশলগুলো কী হচ্ছে, কিভাবে ব্যবহার করে। আদিবাসীদেরকে তো ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয় বিভিন্নভাবে, নানাভাবে, বহু এজেন্সি, হিসাব নাই তো। কেউ কথা শোনে না- এই অবস্থায় আছি তো আমরা। সেজন্য আমি মনেকরি, আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন, আপনি সিদ্ধান্ত নেন, আমাদেরকে ডাকেন এবং আরো মিটিং করেন, একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে মাঠে নেমে পড়ি। আমি তো মনে করি, এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এভাবে থাকলে মরবোই তো আমরা, মরতে তো হবেই। আমাদের আর কিছুই নাই তো! কী নির্লজ্জ ওয়াদা দিলেন ভূমি কমিশন গঠনের, আপনি করলেন না। আপনি চুক্তি করলেন, আপনি কাগজে কলমে রেখে দিলেন। নিজের বেলায় সব ঠিক, আমাদের বেলায় বেঠিক। আমরা এখন বহিরাগত, আমরা এখন উদ্বাস্তু, আমরা এখন দিশেহারা। আমাদের সম্পদ, সম্পত্তি থেকেও নাই, যেকোনো মুহূর্তে আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

আর কথা বলবো না। আপনারা আসুন, আমরা সবাই মিলে একটা পথ খুঁজি এবং সেই কাজটা মনযোগ দিয়ে করি। সবাইকে ধন্যবাদ।

‘সেনা শাসনের অবসান ঘটাতে হবে, পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচালিত হতে হবে’

শামসুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির যৌথ আয়োজনে আজকের এই মহতী জনসভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, যিনি আমাদের কাছে সন্তু দা হিসেবে পরিচিত। মঞ্চে উপবিষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং যারা সামনে উপস্থিত আছেন আমার আদিবাসী, অআদিবাসী বোন ও ভাইয়েরা, সবাইকে শুভদিন এবং সবাইকে নমস্কার, সালাম।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২৬ বছর আগে। এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের পক্ষে আজকের এই সভায় উপস্থিত এই সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি একজন স্বাক্ষরকারী আর এই ঐতিহাসিক চুক্তির আরেক পক্ষ ছিল রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন তৎকালীন সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এমপি। দুই জন ব্যক্তি স্বাক্ষর করলেও এই চুক্তি দুইজন ব্যক্তির চুক্তি ছিল না। এটি ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের একটি অংশের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী আদিবাসী মানুষের চুক্তি। এবং সেকারণেই এই চুক্তি অস্বীকার করার সাধ্য কারোর নেই। রাষ্ট্র কখনোই এই চুক্তিকে অস্বীকার করে নাই।

২৬ বছর পার হয়েছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার এসেছে। যে সরকার এই চুক্তিকে সমর্থন করে নাই তেমন সরকারও একাধিকবার ক্ষমতাসীন ছিলেন। কিন্তু তারা বলেন নাই, এই চুক্তি আমরা মানি না। ক্ষমতায় গিয়ে তারা বলেন নাই যে, আমরা এই চুক্তি মানি না। অতএব এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব, অনস্বীকার্য দায়িত্ব। এই দায়িত্ব থেকে

তাদের রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই। এই রাষ্ট্র থাকলে এই চুক্তিও বাস্তবায়ন করতে হবে, এটা হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন, আমি সেই কথাগুলো এক লাইনে শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তি করব। এই লড়াই শুধু পাহাড়ি আদিবাসীদের লড়াই না, এই লড়াই শুধু বাংলাদেশের সমগ্র আদিবাসীদের লড়াই না, এই লড়াই, আমার আগে সবুর ভাই বলেছেন, অন্য বক্তারা বলেছেন, এই লড়াই সমগ্র বাংলাদেশের সমস্ত নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের লড়াই। কারণ আমরা জানি, যে গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশ লড়াই করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধও গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের একটা অন্যতম কারণ, গণতন্ত্রের লড়াইয়ের জন্যই মুক্তিযুদ্ধে আমাদেরকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে। সেই গণতন্ত্র যদি বিপন্ন হয়, তাহলে আসলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন। আর এই গণতন্ত্র থাকে না, যদি এই বাংলাদেশের কোনো একটি অংশে গণতন্ত্র ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, অকার্যকর হয়ে যায়, যেটা পার্বত্য চট্টগ্রামে হয়েছে।

পার্বত্য তিন জেলায় বিগত দুই যুগ ধরে সেখানে সামরিক শাসন চলছে। আমরা সামরিক বাহিনী বন্ধ করে দিতে বলি নাই, আমরা সামরিক বাহিনী তুলে দিতে বলি নাই। আমরা বলেছি, সামরিক শাসন বাংলাদেশের অন্যত্র যেমন কাম্য নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামেও চলবে না। সেখানে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক শাসন, যেটা আমরা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটাই হবে এবং সেটা হবে পার্বত্য চুক্তির আলোকে, পার্বত্য চুক্তিই হবে তার ভিত্তি। এজন্য অনেক আইন হয়েছে পার্বত্য চুক্তি অনুসারে। পার্বত্য চুক্তির কথা মনে রেখে যদিও সেই অনেকগুলো আইনের মধ্যে অনেক উল্টা-পাল্টা সমস্যা আছে, তারপরও আমরা সেই আইনগুলোকে স্বাগত জানাই যে, পার্বত্য চুক্তি অনুসরণে সেই আইনগুলো অন্তত হয়েছে। অন্তত আঞ্চলিক পরিষদ হয়েছে, পার্বত্য জেলা পরিষদ হয়েছে, কিন্তু সেইসব আইনেরও পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয় নাই। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পরে একটা ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে, কিন্তু তা কার্যকর করা হয় নাই। অন্তরায় একটার পর একটা, অন্তরায় আগেও ছিল, চুক্তির পরও অন্তরায় একটার পর একটা বাড়ানো হয়েছে।

আজকে আমি শুধু এই কথাগুলোই বলবো, আজ পেছনে চলে যাবার বা পেছনে ফেরার কোনো সুযোগ নাই। আমাদেরকে সামনে এগুতে হবে এবং সকলে মিলেই এগুতে হবে। আদিবাসী, অআদিবাসী, সমগ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আমাদেরকে এগুতে হবে। এই লড়াই গণতন্ত্রের লড়াইয়ের অপরিহার্য অংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের লড়াই, সমতলের আদিবাসীদের লড়াই, ভূমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই, তাদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, তাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, তাদের নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, নারীর নিরাপত্তার অধিকারের লড়াই, শিশুর নিরাপত্তার অধিকারের লড়াই, কোনো লড়াই বাংলাদেশের অন্য কোনো লড়াই থেকে, মানুষের অন্য কোনো লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন না, একই লড়াই। অতএব সকলকে মিলেই এটা করতে হবে। আর অন্তরায়গুলোর এক এক করে অবশ্যই আমরা পরিত্রাণ চাই।

এক নাম্বার হচ্ছে, সেনা শাসনের অবসান ঘটাতে হবে এবং পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচালিত হওয়ার কথা সেভাবেই পরিচালিত হতে হবে। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে তার যে প্রাপ্য ক্ষমতা আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, তাকে সেই ক্ষমতা দিতে হবে। তার প্রাপ্য বাজেট এবং লোকবল তাকে দিতে হবে। জেলা পরিষদগুলোকে যেভাবে পার্বত্য চুক্তিতে বলা আছে সেভাবে জেলা পরিষদগুলোকে গঠন করতে হবে। পার্বত্য ভূমি কমিশনকে গঠন করা হয়েছে কিন্তু কার্যকর করা হয়নি। তার সভা পর্যন্ত করতে দেয়া হয় না পার্বত্য অঞ্চলে, এটা হতে দেয়া হবে না। এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তার বাজেট, তার লোকবল এবং বিধিমালা যেটা আজ পর্যন্ত অনুমোদন করা হয় নাই। ভূমি কমিশনের বিধিমালা আঞ্চলিক পরিষদ থেকে তৈরি করে কয়েক বছর আগে জমা দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত সেটা অনুমোদন দেয়া হয় নাই। এগুলো অনুমোদন দিতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে যে শান্তির কথা বলা হচ্ছে, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি নাই। এই শান্তি না থাকার জন্য পাহাড়িরা দায়ী না, কারা দায়ী আমরা জানি, সকলেই জানি, আমরা বলি না। মাঝে মাঝে সংঘাত হয়, কয়েকজন নিহত হয় এবং সেটা পত্রিকার পাতায় বড় বড় করে ছাপা হয় যে, পাহাড়িরা পাহাড়িদেরকে হত্যা করেছে। তার পেছনে কে আছে সেকথা কেউ বলে না। এটা বন্ধ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা ঘটনার তদন্ত হতে হবে। নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু তদন্ত হতে হবে এবং কারা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং আইনের কাছে তাদেরকে সোপর্দ করতে হবে।

পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের ন্যায় বিচারের দাবি, এটা তাদের মৌলিক অধিকার। আমি শেষ কথা বলবো এই যে, আমাদের রোবায়েত বলে গেছেন, আমাদের সংবিধানে যে সমস্যাগুলো আছে, সেটা একদিনে সমাধান হবে না, কিন্তু সমাধান করতেই হবে। আদিবাসীদের স্বীকৃতি, আমাদের তিন ধরনের মালিকানার কথা সংবিধানে আছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানা, আরেকটি হচ্ছে আদিবাসীদের যে যৌথ মালিকানা, এই মালিকানা দিতে হবে। সংবিধান তো বহুবার কাটাছেড়া হয়েছে, বহুবার পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু যে পরিবর্তনগুলো অবশ্যম্ভাবী, জরুরি ছিল, সেগুলো আমরা করি নাই, আমরা পেছনের দিকে চলে গেছি।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছে। বাংলাদেশের সব মানুষ ইসলাম অনুসরণ করে না। বহু মানুষ অন্যান্য ধর্ম অনুসরণ করে। তাহলে সব ধর্মের নাম লেখা হোক। তা যদি না হয়, তাহলে কোনো ধর্মের নাম লেখা থাকবে না। যার যার ধর্ম তার তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকবে, আরেকদিকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে, এরকম পরস্পর বিরোধী জিনিস, এগুলো থাকতে পারে না। সাংবিধানিক স্বীকৃতি, এটি একটি জরুরি ব্যাপার। আর বাংলাদেশ একটি বহুজাতির রাষ্ট্র, এটি একটি জাতির রাষ্ট্র না, একটি ভাষার রাষ্ট্র না, বহু ভাষিক রাষ্ট্র। এই যে ডাইভারসিটি, এই যে বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ভাষাগত বৈচিত্র্য, জাতিগত বৈচিত্র্য, এটা আমাদের গর্বের ব্যাপার, আমাদের সম্পদ। এটি আমাদের শক্তির দিক, এটা কোনো দুর্বলতার দিক না। সব মানুষ নিয়ে আমরা এইদেশে বসবাস করেছি হাজার হাজার বছর ধরে এবং আমরা ভবিষ্যতেও করব এবং সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে।

আমি আরেকটি অন্তরায়ের কথা বলব পার্বত্য চট্টগ্রামে, সেটেলার সমস্যা। এই সেটেলার সমস্যা সামরিক সরকার জিয়াউর রহমানের সরকার শুরু করে গেছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত সেটা অব্যাহত আছে। এখনো সেটেলারদের বসতি প্রদানের জন্য সমতল থেকে সেখানে নিয়ে যায়। এটা বন্ধ করতে হবে। তাদের রেশন দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আমি রেশন দেওয়ার বিরুদ্ধে না। তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে নিয়ে এসে সেখানে বসতি প্রদান করেন এবং সেখানে তাদের রেশন দেন। ১ বছর দেন, ৫ বছর দেন, যা তাদের সুযোগ-সুবিধা, সেখানে বসতি প্রদান করেন।

আমাদের অনেক স্টাডিতে, রিপোর্টে আছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সেটেলারদের মধ্যে বহু মানুষ তারা স্বেচ্ছায় ওখান থেকে চলে আসতে চায়, একটি গোষ্ঠী তাদেরকে আসতে বাধা দেয়, নিরুৎসাহিত করে, ভয় দেখায়। এটা বন্ধ করতে হবে। যারা স্বেচ্ছায় আসতে চায়, তাদেরকে পুনর্বাসিত করতে হবে। যে জেলা থেকে তাদেরকে নিয়ে গেছেন সেই জেলায় তাদেরকে পুনর্বাসন করতে হবে। অনেক খাস জমি আছে সেই খাস জমিতে তাদেরকে পুনর্বাসিত করেন। সেখানে তাদের আর্থিক সহায়তা দেন, রেশন দেন, আমাদের কোনো আপত্তি নাই, আমরা বরং সেটা দাবি করি। সেটেলার সমস্যা সমাধান এটা জরুরি। সেটেলার এবং স্থানীয়দের মধ্যে যে সংঘাত সেই সংঘাতে আমাদের সিভিল প্রশাসন, সামরিক প্রশাসন দেখা যায় সেটেলাদের পক্ষ নেয় এবং পাহাড়িদের উচ্ছেদ করে।

আর শুধু পাহাড়িদের উচ্ছেদ না, পাহাড়ের গাছপালাও উচ্ছেদ হয়ে গেছে, পাহাড় উচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমাদের প্রতিবেশ, আমাদের পরিবেশ ক্রমাগত বিপন্ন হচ্ছে এই সেটেলার সমস্যার সমাধান না করার জন্য। প্রধানত এটার অবশ্যই অবসান হওয়া দরকার। আমরা এর আগে, বাজেটের আগে বলেছি, এর জন্য বাজেট রাখেন। ১৯৯৭ সালের পরে আমরা যারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি, আমরা একাধিকবার বলেছি, আমাদের সিএইচটি কমিশনের নেতৃবৃন্দও বলেছেন যে, সেটেলারদের সমস্যা সমাধান করার জন্য, তাদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য যদি আমাদের তহবিল লাগে, আমাদের ফান্ড লাগে, আমাদের বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে, আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র আছে, তারা অফার করেছেন যে, আমরা সহায়তা করতে প্রস্তুত। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সুলতানা আপা এখানে আছেন, সুলতানা আপা নিজেই সাক্ষী, তাতে বলেছেন, না, এর জন্য আমার বিদেশের সাহায্য নিতে হবে কেন, আমার বাজেট থেকেই আমি দিতে পারব। তো সেকথা যদি উনি বলে থাকেন, আমরা তার সদিচ্ছার প্রতিফলন বাস্তবে দেখতে চাই।

আমি আর কথা বাড়াব না। আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আয়োজকদের আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমার কথা শোনার জন্য শ্রোতাদেরও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। নমস্কার।

‘আদিবাসীরা প্রতিমুহূর্তেই আতঙ্কের মধ্যে আছে কী পাহাড়ে কী সমতলে’

রাজেকুজ্জামান রতন
সহ-সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)

সভাপতি শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, আমাদের সভার প্রিয় সুলতানা আপা এবং সুধী মন্ডলী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যেদিন হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে, তখন আমরা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে আমরা একটা প্রকাশনা বের করেছিলাম।

আমরা বলেছিলাম, এই চুক্তি একটা নতুন প্রতারণার ফাঁদে ফেলবে। আমাদের কথাটা প্রমাণিত হউক- এটা আমরা চাই নাই, কিন্তু আমরা আশঙ্কাটা প্রকাশ করেছিলাম। ২৬ বছর পরেও আমাদের সেই দাবিতে বার বার আন্দোলন করতে হচ্ছে, সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

২৬ বছর আগে ১২ বছর ধরে আলোচনা করে ২৬ টা বৈঠক করে আমরা যে চুক্তিটা দেখেছিলাম সেই চুক্তিটা ২৬ বছরেও পুরণ হয়নি, সেই কথাটা আমাদের বলতে হচ্ছে। আজকেও পত্রিকায় দেখলাম, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি তারা তাদের বাণী দিয়েছেন। চুক্তি নিয়ে তাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস আর চুক্তির আরেক পক্ষ তাদের মধ্যে হতাশা। এটি কেমন চুক্তি? এক পক্ষ পুরস্কার নেয়, আর আরেক পক্ষ হতাশা ব্যক্ত করে। তার মানে এটা কি চুক্তির ফাঁদে আটকে ফেলা হলো আমাদের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে?

আমরা এটুকু বিশ্বাস করি যে, সংখ্যা দিয়ে কোনো জাতিগোষ্ঠীকে নির্ধারণ করা উচিত নয়। আমরা বলতে চাই, প্রত্যেকটা জাতি প্রত্যেকটা জাতিসত্তা তার মর্যাদা নিয়ে বাঁচবে। বাংলাদেশের সংবিধানে যেটা স্বীকার করা হয় নাই আমরা সেটাকে নিয়েই বার বার আন্দোলন করতে চাই। প্রত্যেকটা জাতিগোষ্ঠী প্রত্যেকটা জাতিসত্তা তাদের স্বাতন্ত্র্য আছে, তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের জীবনধারা, তাদের জন্মকালীন, বিবাহ এবং মৃত্যুকালীন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে, রক্ষা করে এবং সেটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের।

আমাদের রাষ্ট্র কতখানি গণতান্ত্রিক সেটা বুঝা যায় যখন আমাদের জাতিগোষ্ঠীগুলো তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারছে না। তার মানে একটা জায়গায় অধিকার বঞ্চিত হওয়া মানে সমস্ত জায়গায় বঞ্চনার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সরকারের এখন যা চরিত্র হয়েছে, সরকার যা বলে এখন তার বিপরীতটা ভাবতে হয়। সরকার যখন বলে উন্নয়ন, তখন আমাদের খুঁজে দেখতে হয় এখানে লুণ্ঠন কতটা আছে। সরকার যখন বলে চুক্তির মৌলিক শর্ত বাস্তবায়িত হয়েছে তখন আমাদের দেখতে হবে মৌলিক শর্ত কতটা উপেক্ষিত হয়েছে। তাহলে এই রাষ্ট্র জনগণের প্রতি নিপীড়ন চালাতে চালাতে, এই সরকার জনগণকে প্রতারিত করতে করতে তাদের অবস্থানটা এমন জায়গায় দাঁড় করিয়েছে তারা যেটা বলবে তার বিপরীতটাই আমাদের খুঁজে দেখতে হয়। সরকারের কোন বক্তব্যকে বিশ্বাস করব? কারণ কোনো বক্তব্যেই বিশ্বাসের ক্ষেত্রটা আর নেই। তারা একটা জায়গায় বিশ্বাস করতে বলে, তারা যেটা বলেছে সেটাই সত্য, যেটা করবে সেটাই ঠিক। এটা যদি না মানেন তাহলে আপনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, আপনি উপদ্রব সৃষ্টিকারী, আপনি ষড়যন্ত্রকারী অথবা আপনি উস্কানিদাতা। এই রকমভাবে একটা জনগোষ্ঠীর উপরে নিপীড়নের মনস্তত্ত্ব তৈরি করা হয়েছে।

এর মধ্য দিয়ে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখেছি। এই ২৬ বছর পরে দাঁড়িয়ে আপনারা বলছেন যে, চুক্তি ভঙ্গ। এই চুক্তি ভঙ্গের সংস্কৃতি তো অনেক জায়গায়। শ্রমিকদের সঙ্গে কি চুক্তি হয় না? সেই চুক্তি কি ভঙ্গ হচ্ছে না? আমাদের দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে না এখানে? বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে না এখানে? এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতির যে কারণ হয়েছে, জনগণের মধ্যে এটা নিয়ে এসেছে যুক্তি না করার এবং বিচার বিবেচনা না করার যে সংস্কৃতি। কোনো ধরনের যুক্তি না করে, কোনো ধরনের বিচার-বিবেচনা না করে যা বলেছে তাই মানতে হবে-এই ধরনের একটা আত্মসমর্পণের সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে। তাহলে তার বিরুদ্ধে আপনারা যখন কথা বলেন, তখন অনেক বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে আপনাকে লড়াই করতে হয়। এই লড়াইয়ে আমরা সবাই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

এই চুক্তির সঙ্গে আমরা একটা জিনিস বলেছিলাম, যেকোনো চুক্তির জন্য একটা গ্যারান্টি অনুচ্ছেদ (clause) থাকতে হয়। যদি চুক্তিটা বাস্তবায়ন না হয় তাহলে কী হবে? যেমন করে আমরা ঐ পানি নিয়ে গঙ্গা চুক্তি বা পদ্মা চুক্তির ক্ষেত্রে বলেছিলাম গ্যারান্টি ধারা না থাকলে কী সমস্যা হয়। তাই পার্বত্য চুক্তির মধ্যে কোনো গ্যারান্টি ধারা না থাকলে সরকার যদি চুক্তি বাস্তবায়ন না করে তাহলে কী হবে? কোনো পক্ষ যদি চুক্তি বাস্তবায়ন না করে তাহলে কি হবে? কত সময়ের মধ্যে চুক্তিটা বাস্তবায়ন করতে হবে? তার যেমন সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না, তেমনি কোনো গ্যারান্টি অনুচ্ছেদ না থাকার কারণে এটা একটা দীর্ঘসূত্রিতার ফাঁদে ফেলে দিয়েছে।

এখন যখন বলা হয়, ৯৬ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে, এই শতাংশের হিসাবটা খুবই গোলমেলে। যেমন ধরুন, আমাদের শরীরের কথা চিন্তা করি, আমাদের শরীরের দুই শতাংশ হচ্ছে মাথা, আরা ৯৮ শতাংশ হচ্ছে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এখন যদি বলি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু শরীরের ৯৮ শতাংশ ভালো আছে। তাহলে কি তাকে সুস্থ মানুষ বলবো? আমরা একদিন এই শতাংশের হিসাবটা নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম না? হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তো বলে ফেললেন যে, ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ৯৮ শতাংশ অর্জিত হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে, তিনি ৯৮ শতাংশ বলেছেন, বাকী ২ শতাংশের জন্য আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাহলে শতাংশের হিসাবটা খুব গোলমেলে। মূল বিষয় বাদ

দিয়ে বাকীটাকে শতাংশের মধ্যে ফেললে আসলে প্রধানত সত্যকে আড়াল করা হয়। শতাংশ দিয়ে কি সত্যকে আড়াল করা যায়? সরকার এখন সেই পদক্ষেপের মধ্যেই পড়েছে।

একটা লোভের মানসিকতা তৈরি হয়েছে যে, পাহাড়ে জায়গা বেশি, লোক কম, বসতি কম। আচ্ছা, লোকবসতি কিভাবে গড়ে উঠে? সমতল ভূমিতে এত লোক বাস করে কেন? পাহাড়ে এত কম লোক বাস করে কেন? হাওরে এত কম লোক বাস করে কেন? হাওর তো বাংলাদেশে ধরতে গেলে প্রায় ১০ ভাগের এক ভাগ। ৯ টা জেলা মিলে আমাদের হাওর এলাকা। সেখানে লোকবসতি খুবই কম। এখন কি দলে দলে গিয়ে হাওরে বসতি স্থাপন করবে? তাহলে ওখানকার ভূ-প্রকৃতি, ওখানে একটা জীবনধারা আছে, ওখানে ইকোলোজি বা জিওলোজি, জুলোজি সব মিলিয়ে সবি ওখানে আছে, সেগুলোকে বিবেচনা করতে হবে না? পাহাড়ওতো একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকা, সেটাকে বিবেচনায় না নিয়ে আমাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখিয়ে, ওখানে জনসংখ্যার ভারসাম্য তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। শুধুমাত্র একক দল এটা করেছে তা না, এটার এখনো ধারাবাহিকতা আছে। একসময় তাদেরকে প্রমোশন দিয়ে বাঙালি করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। একজন চাকমা কি বাঙালি হতে পারবে? একজন বাঙালি কি ইচ্ছে করলেই চাকমা হতে পারবে? একজন সাঁওতাল কি ইচ্ছা করলে বাঙালি হতে পারবে?

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এজন্যই একটা কথা এসেছিল, মানুষ ইচ্ছা করলে তার ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করলেই তার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে পারে না, তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে পারে না। বাঙালি ইচ্ছা করলেই মারাঠি হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু বাঙালি মুসলমান, বাঙালি হিন্দু তারা ইচ্ছা করলেই তাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে। এজন্যই একটা কথা বলা হয়েছিল, ভারতবর্ষ বিভাজনের সময় কোনটাকে গুরুত্ব দেয়া হবে? যদি বলি ভারতবর্ষটাকে ফেডারেল রাষ্ট্র করতে গেলে কোনটাকে বিবেচনা করতে হবে? ধর্ম না ভাষা, ধর্ম না সংস্কৃতি? তাহলে আজকেও আমাদেরকে এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে যে, প্রমোশন দিয়ে আমাদেরকে বাঙালি করে দেয়ার চেষ্ট করা হয়েছে।

তারপরে কী বলা হয়েছে? বলা হয়েছে যে, বেশি বাড়াবাড়ি করবা না, প্রয়োজনে একের পর এক লোক পাঠিয়ে তোমাদেরকে মাইনোরিটি করে ফেলব। একথা বলা হয়েছিল যে, হাজার হাজার লোক পাঠিয়ে তোমাদেরকে মাইনোরিটি করা হবে এবং সেই প্রক্রিয়াটাই চলছে। ফলে এটার জন্য শুধুমাত্র কোনো একটা সরকারকে দায়ী করলে হবে না, এটা এখানে শাসকগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যটা দেখতে হবে এবং তারা নিজেদের মধ্যে গদি নিয়ে যতই কামড়া-কামড়ি করুক না কেন পাহাড়কে দখল করা, নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা সম্পদ দখল করা বা লুটপাট করায় তাদের মধ্যে শ্রেণিগত একটা ঐক্য আছে, সেইদিকটাও আমাদের খেয়াল রাখা দরকার।

একসময় সমতলের দরিদ্র মানুষদেরকে সেটেলার হিসেবে পাঠিয়ে এখন কারা যাচ্ছেন? এখন যারা রিসোর্ট বানাতে যাচ্ছেন তারা কি দরিদ্র? তারা কারা? তারা কার পৃষ্ঠপোষকতায় যায়? তারা কাদের সহায়তা নিয়ে যায়? তাহলে লুণ্ঠন প্রক্রিয়াটা প্রাথমিক অস্ত্র হিসেবে, প্রাথমিক বিষয় হিসেবে দরিদ্র মানুষদেরকে পাঠিয়ে কি করা হয়েছিল? পাহাড়ি-বাঙালি বিরোধটাকে ওখানে জিইয়ে রেখে সামরিক উপস্থিতিটাকে ওখানে যুক্তিসিদ্ধ করা। তাহলে সেটাও আমাদের একটু বিবেচনায় রাখতে হবে।

এখন যদি বলি, দিনাজপুরের স্বপ্নপুরী আদিবাসীদের জন্য দুঃস্বপ্নের নগরী হয়ে গেল কিংবা বাগদা ফার্মের মানুষরা আবার আতঙ্কের মধ্যে পড়ছে, যাকে এমপি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তারতো নয়নটা পড়ে আছে ঐ সাঁওতালদের জমির উপরে। আমরা দেখছি আদিবাসীরা প্রতিমুহূর্তেই আতঙ্কের মধ্যে আছে কী পাহাড়ে কী সমতলে। আতঙ্কের মধ্যে যখন আমাদের বসবাস, তাহলে সেই আতঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া তো আমাদের আর কোনো উপায় নেই, আর হতাশার তো জায়গাই নেই। এখন যতটুকু পারা যায় লড়াইটা করতে হবে, যেমন করে আলো যতটুকু জ্বালানো যায় ততটুকু অন্ধকার দূর হয়। ঠিক যতটুকু আন্দোলন করা যাবে, ততটুকু অধিকার অর্জিত হবে। ফলে আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপে ধাপে আপনারা অগ্রসর হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এর পক্ষ থেকে আপনাদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছি। যেখানে অন্যায় হবে সেখানে সাধ্যমত আমরা বামপন্থিরা আপনাদের পাশে থাকছি, পাশে থাকবো। কারণ আমরা নিজেরাও জানি যে, কতখানি নিপীড়িত, কতখানি উপেক্ষিত, কতখানি লাঞ্ছিত, কতখানি অপমানিত হতে হয় প্রতিদিন পদে পদে। বাঙালি বলে আমরা কিন্তু এখানে রেহাই পাই না, বাঙালি বলে আমরা কিন্তু মুসলমান ভাই না। কাজেই এই যে, প্রতি পদে পদে অপমান, লাঞ্ছনার সমাজের মধ্যে আছি, সেখানে এই লাঞ্ছিত এবং নিপীড়িত মানুষরা আমরা ভাই হতে চাই, বন্ধু হতে চাই, সংগ্রামী যোদ্ধা হতে চাই। আমরা ভূমি, ভাষা, ভোট এই সমস্ত লড়াই যেগুলো করেছিলাম, সেগুলো অব্যাহত রাখতে চাই।

এখানে একটা কথা বলতে চাই, বিশেষ করে ডিসেম্বর মাসটা আমাদের জন্য খুবই দারুন মাস। এই মাসের ১৬ ডিসেম্বর

আমরা পরাজিত করেছিলাম পাকিস্তানকে স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু তারপর থেকে দেখলাম, কিভাবে বিজয় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। এই মাসের ৬ তারিখে আমরা সামরিক শাসক এরশাদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। তারপর দেখলাম, তারা কিভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বন্দী হয়ে গেলো। এই মাসের ১৪ তারিখে আমাদের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। আজকে আমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে কিভাবে দাসানুরূপ বানানো হচ্ছে। একদিন তারা বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করেছিল, আজকে তারা বুদ্ধিজীবীদেরকে অনুগত বানাচ্ছে। আর এই মাসের ২ তারিখে আপনারা একটা চুক্তি করেছিলেন, আমরা দেখছি ২৬ বছর ধরে চুক্তিকে কিভাবে অসম্মানিত, পদদলিত, উপেক্ষিত করা হচ্ছে। ফলে ডিসেম্বর একদিকে বিজয়ের, আরেকদিকে বিজয় হারানোর মাস। সেই মাসে আপনারা প্রতি বছর একত্রিত হন।

আমি দু'একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আন্দোলনটা ছড়িয়ে দিতে হবে। একটা উদ্যোগ হয়েছে, আরেকটা বিভাগীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম হওয়ার কথা। আগামী ২৩ তারিখেও একটা কর্মসূচি আছে, সেগুলোতেও আমরা থাকবো। যেসমস্ত জেলাগুলোতে আমাদের নানা জাতিসত্তার অবস্থান আছে, প্রত্যেকটা জেলা শহরেই আমাদের কর্মসূচি করতে হবে। বরিশালে যদি কর্মসূচি হয়, পটুয়াখালী, বরগুনাতে যদি হয় ওখানকার সাধারণ মানুষরা বুঝবে আমরা যাদেরকে প্রান্তে ফেলে রেখেছি, তাদের দুঃখে তাদের পাশে না দাঁড়ালে আমরাও কিন্তু এই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রান্ত হিসেবে থাকব। ফলে আদিবাসী এবং বাঙালিদের মধ্যে লড়াইটাকে গড়ে তুলবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, চুক্তি বাস্তবায়ন হয় নাই-এই কথাটাকে কত ব্যাপকভাবে প্রচার করা যায়, এটাকে কতবেশি সংখ্যক মানুষের মাঝে নিয়ে যেতে পারি। চুক্তি হয়েছে বলে যারা গর্ব করছেন, চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছে বলে প্রতারিত করছেন, তাদের মুখোশটাও একটু খুলে দেয়া দরকার।

সম্পদ যেখানে আছে লুণ্ঠন সেখানে আছে- এই কথাটি হচ্ছে সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকাগুলোই দুঃখজনকভাবে আদিবাসীদের এলাকা। সেটা সমতলে হোক, পাহাড়ে হোক অথবা সমুদ্র উপকূলে হোক। কাজেই সম্পদ লুঠের একটা যে মহোৎসব চলছে এদেশে, তার বিরুদ্ধে লড়াইটা আমাদের। আমরা পাহাড়ি-বাঙালি, আদিবাসী সবাই মিলে নিপীড়িত মানুষেরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে পারি- এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

'সবাই মিলে রাজনৈতিক শক্তির সমাবেশ ছাড়া বিকল্প নাই'

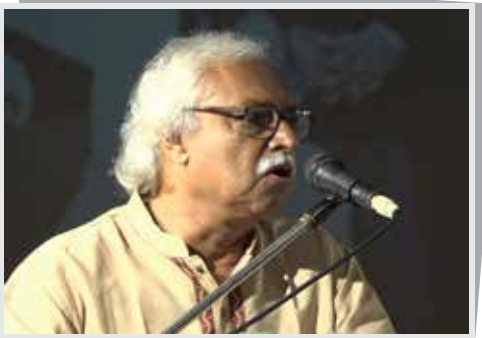

রুহিন হোসেন প্রিন্স
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

মঞ্চে উপস্থিত সুলতানা আপাসহ নেতৃবৃন্দ এবং সামনে উপস্থিত ভাই ও বোনেরা। আমি কথার শুরুতেই আয়োজকদের আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের পার্টি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আজকে যে উপলক্ষে এখানে সভা, যে পার্বত্য চুক্তির ২৬ বছর পূর্তিতে আমরা এখানে আলোচনা করছি, এই চুক্তির নাম তো শান্তি চুক্তি ছিল না। কিন্তু সাধারণভাবেই বলা যায় সবাই আমরা গ্রহণ করেছিলাম শান্তি চুক্তি হিসেবে। কিন্তু ২৬ বছর পরে এসে দেখি, যে চুক্তিটা হলো এবং যাদের জন্যে যে অঞ্চলের জন্যে হলো এবং এটা প্রকৃত অর্থে সারা দেশের জন্য হলো, সেখানে অনেক কিছু হলো, কিন্তু এখনো শান্তি ফিরে এলো না। এই বাস্তবতার উপরে দাঁড়িয়েই আজকে এখানে সভা করছি। একসময় আমরা দেখলাম, আজকে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি তিনি যে বাণী দিয়েছেন সেখানে তিনি বলছেন যে, এটি একটি বিশ্বের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। ২৬ বছর পরেই কিন্তু উনি এটা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী বলছেন বিশ্ব ইতিহাসের বিরল ঘটনা। কতগুলো পত্র-পত্রিকায় স্থানীয় সাংবাদিক এবং অন্যরা যেভাবে নিউজগুলো করছে, একদিকে সেখানে বলা হচ্ছে পাহাড়ি জনপদে চোখ ধাঁধানো উন্নয়ন। এটাতো একটা দিকের কথা বললাম। আর আজকে যাদের আয়োজনে এসেছি, যিনি আজকের সভায় সভাপতিত্ব করছেন এবং ঐ অঞ্চলের জনগণের পক্ষে যিনি স্বাক্ষরকারী ছিলেন, তিনি যে কথা বলেছেন, তার একটি পার্ট তবুও আমি পড়ছি আমার জন্যে, সভার জন্যে।

'পক্ষান্তরে সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতই ফ্যাসিবাদী সামরিক কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা

সমাধানের নীতি গ্রহণ করে চলেছে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠছে। বলাবাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মত দেশের এক দশমাংশ এলাকাকে অগণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে রেখে দেশে কখনোই গণতান্ত্রিক শাসন বিকশিত হতে পারে না।'

উনার শেষ কথাটাতে বিকশিত হওয়াটাকে একটু যে গণতান্ত্রিক শাসন রক্ষা করা আর নামে-বেনামে সেটাও করা যায় কিনা, আমি যদি বুঝে থাকি সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। আমরা যদি আবারও পেছনে ফিরি, ২৬ বছর পর এসে কী বলতে হচ্ছে, যেটা ওনারা বলছেন– 'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন জোরদার করুন।' তার মানে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের কথাটাও বলা হয়েছে।

আমি কথাগুলো উল্লেখ করালাম এই কারণে, কারণ আমি খুব বেশি সময় নিচ্ছি না কথা বলার জন্য। তাহলে ২৬ বছর পরে দাঁড়িয়ে যে বাস্তবতা সরকার মহল, যারা এটার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করছেন, আমরা যারা সমর্থন শুধু না আমরা চাই এটা বাস্তবায়ন হোক, এই কথাগুলোর জায়গাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এটা আমরা দেখতে পেলাম। আমি এবার একটু ফিরে যাই, আমি এখানে যখন এই কথাগুলো শুনছিলাম, এই কথাগুলোর মধ্যে অনেক কথা আছে, এখন অন্যরা বলবেন, বিশিষ্ট জনেরা আছে। আমি অন্যদিকে যাব না।

রাষ্ট্র যদি তার চরিত্র না বদলায় তাহলে এখানে কিছু করা যাবে না। কথা আসলো, শুধু এই সরকার না শাসকগোষ্ঠীর চেহারা আমরা দেখেছি, ঐ যে সেটেলারদের নিয়ে আসা। এখন ক্ষমতাসীনদের কথা বলছি, ক্ষমতার বাইরে যারা আছে তারাতো এই চুক্তিকে বিবেচনাই করে না। তাহলে শাসকগোষ্ঠীর পজিশনগুলোর কথা কিন্তু এখানে আসলো। এখানে কথা আসলো, আমাদের সংবিধান, তার পরিস্থিতি আমাদের কী করে রেখেছে এবং ঐটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে কোথায় আমরা যাব! তাহলে এই সামগ্রিক কথায় আমার সামান্য দুটি কথা হলো, আসলেই কী আমরা সবাই মিলে এটা উপলব্ধি করছি, আমি পাহাড়ি জনপদের কথা বলছি না, সমগ্র বাংলাদেশে যারা আমরা বাস করি আমি সবাইয়ের কথা বলছি। আমাদের বিবেচনায় চুক্তি যখন হয়েছিল তখনো এই ব্যাপারে আমাদের ঘাটতি ছিল। আমরা সমগ্র দেশবাসীকে এই বিষয়ে সচেতন, সংগঠিত করতে পারিনি। এমনকি যে রাজনৈতিক দলগুলো আমরা আপনাদের সাথে আছি বলে দাবি করছি, আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় আমরা সবাইও সেভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি।

আর যাদের কাছে প্রত্যাশা করছি আমি তাদের কথায় আর একটু পরে আসছি। তাহলে আমাদের বিবেচনায় সরকারের যে বয়ান সেটি কি এগ্রি করবো? মোটেই না। হ্যাঁ, আমি এগ্রি করতে পারি এভাবে যে, আমি যে এই ধরনের একটি বিরল ঘটনা, একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত, আমি চুক্তি করলাম, বাইরে বিদেশে পদক-টদক পাইলাম, মানলাম না এবং বাস্তবায়ন করলাম না। সে অর্থে বিরল, সে অর্থে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত যে, চুক্তি করলাম কিন্তু বাস্তবায়ন করলাম না, এটাকে ঝুলিয়ে রাখলাম। সে ধরনের বিবেচনা হলে আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু বাস্তবতা যেখানে দাঁড়িয়েছে, শান্তিচুক্তির ২৬ বছর পরে এসে দাঁড়িয়ে দেখছি যে, ঐ অঞ্চলের জনপদের মানুষের মধ্যে বোবা কান্না রয়েছে। গত ১ বছরে আমার হয়তো সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়নি সময় এবং ব্যস্ততার কারণে, কিন্তু তার আগে ঐ যে চিম্বুক পাহাড়ে যে অপকর্মগুলো হয়েছে, সেগুলো দেখতেও সেখানে গিয়েছিলাম। সেগুলো জানি, ঐ অঞ্চলের উন্নয়নের নামে মানুষকে আজকে যেভাবে ঠেকে ফেলানো হচ্ছে, এ অঞ্চলের জনপদকে নতুন একটা সংকটের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দখলদারিত্বের নতুন নতুন মাত্রা তৈরি করা হচ্ছে, যা এই যে শান্তির কথা বলা হচ্ছে তা অশান্তির পথে যেতে বাধ্য। তাহলে এই পরিস্থিতি কি চলতে থাকবে? আমরা মনেকরি, এই পরিস্থিতি চলতে দেওয়ার কোনো কারণ নাই, চলতে দেওয়া যাবে না। সেজন্য কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই।

একই সাথে আমি এই কথাই বলতে চাই বিনয়ের সঙ্গে যে, এইখানে অনেক সময় মনে হয়, আমরা যখন আছি আমরা কিন্তু বার বার নির্ভর করে থাকি কারোর উপরে, কোনো গোষ্ঠীর প্রতি। কিন্তু আজকে ইচ্ছা করে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করলাম। কারণ এই আলোচনা কিন্তু বরাবরই হয়, আজকে নতুন হচ্ছে তা না। আমরা কি বুঝতে পারছি না এটাতো একটা রাজনৈতিক সংকট? তা যদি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে না পারি, যে একটা অর্থনৈতিক বিষয় থাকে সেটা বাদ দিয়ে আসলে রাজনীতি হয় না। সুতরাং ঐখানে তো অর্থনীতির নতুন নতুন ঘটনা, দখলদারিত্ব করার ঐ ঘটনা ঘটে। সুতরাং রাজনীতি বা ঐক্যমত না থাকার কারণে ঐখানে কিন্তু ঘটে যায়। তাহলে যারা এটা ঘটাচ্ছে তারা হয়তো কোনো কারণে চুক্তি করেছে, আপনি কি তাদের বাস্তবতা, যেখানে তারা দাঁড়িয়েছেন সেই জায়গায় তাদের প্রতি ভরসা করে এটা বাস্তবায়ন করতে পারবেন? সামান্য কয়েকটা সিম্পথম তো আপনারা এখানে উল্লেখ করলেন যে, নির্বাচনের নামে মনোনয়ন, যদিও নির্বাচন নামে তো বাংলাদেশে কিছু নাই, নির্বাচন হচ্ছে না। কয়েকদিন পরে একটা প্রহসন হবে, ক্ষমতার ভাগ ভাটোয়ারা, ক্ষমতা আরো বেশি কী করে কুক্ষিগত করা যায়।

ঐ যে বললাম চোখ ধাঁধানো উন্নয়ন, বলা হয় এই উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য আরো অনেক বছর পর্যন্ত ক্ষমতায়

থাকতে হবে। এই জন্যই এটাকে দীর্ঘায়িত করতে হবে। তাহলে যদি আমরা আজকে মনেকরি, শাসকগোষ্ঠীর কারণে এই পার্বত্য অঞ্চলের চুক্তি বাস্তবায়ন হলো না, আর এই শাসকগোষ্ঠীর শাসন যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে দিল্লী আরো দূরস্থ হবে।

তাহলে রাজনৈতিকভাবে এটার সমাধান চাইলেই আমার কাছে মনে হয়, আজকে পাহাড়ি আদিবাসী, সমতলের আদিবাসী, এই জনপদের বাঙালি এবং অন্যরা সবাই মিলে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির সমাবেশ ছাড়া বিকল্প নাই। এই বিকল্প বিবেচনা না করলে এই রাজনৈতিকভাবে সমাধান বা পার্বত্য চুক্তির সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি না। আমার মনে হয়, সেটি সময় এসেছে, গতবারও আমরা বলেছিলাম, এইটা নিয়ে আমরা খুব বলতে চাই না, এখানে সন্তু দা আছেন, অনুরোধ করবো যে, তাদেরকে আমরা অনেকদিন ধরে অনুরোধ করছি, তারাও হয়তোবা নানা সংকটে আছেন আমরা জানি। আমি সেই আলোচনায় যাচ্ছি না, কারণ আমরা জানি ঐখানে ষড়যন্ত্রের মাপটা কী। কোনোভাবেই যাতে এই অংশ কাজ না করতে পারে তার জন্য কী করা হচ্ছে সবই আমরা জানি। কিন্তু একটা মেইনস্ট্রিম পলিটিক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আজকে বিকল্প শক্তি সমাবেশ করার বিষয়টি আপনারা বিবেচনা করবেন কিনা আরেকবার অনুরোধ আমি আপনাদের কাছে রাখছি। কারণ, এর তো কোনো বিকল্প নাই, বাংলাদেশে আমরা তো বিকল্প দেখছি না। কারণ, দিন যত যাবে দেখবেন আমরা হয়তো অনেকেই আছি, আমি জানি না আমাদের অনেকে কয়দিন থাকবো। কারণ ক্ষমতার মোহ যদি আমাদের মধ্যে পেয়ে বসে তাহলে দেখবেন পিছনে ফিরতে সময় লাগবে না। দেখবেন এখানে এসে কথা বলছি, কিন্তু নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে ঐ জায়গায় গিয়ে স্যারেন্ডার করছি। সুতরাং আপনারই তো ২৬ বছর হয়ে গেলো, মুক্তিযুদ্ধের ৫২-৫৩ বছর হয়ে গেলো, আর কত দেরি করব আমরা? আর দেরি করার প্রয়োজন নেই। আসেন আমরা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যে শ্লোগান এখানে উচ্চারিত হয়েছে সেটি ধরে আমরা এগিয়ে যাব, দায়িত্ব পালন করবো। স্থানীয় মানুষ নিশ্চয়ই আরো বেশি দায়িত্ব পালন করবেন। একই সঙ্গে আসেন বাংলাদেশে একটা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ গড়ে তোলার সংগ্রামে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। তাহলেই আমরা রাজনৈতিকভাবে যে চুক্তি করেছি এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে পারবো।

আমরা আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে আছি, একই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এবং আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার সহ সবকিছুর জন্যই লড়াই করবে, আমাদের যে বিকল্প নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বাম গণতান্ত্রিক জোট, আমরাও এইভাবে মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাব- এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

‘আমরা আরেকবার বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধাবস্থার মধ্যে দেখতে চাই না’

ড. মেসবাহ কামাল
সমন্বয়কারী, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক
সংসদীয় ককাস ও অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাব্বিশ বছর পূর্তির এই দিনে যখন যারা চুক্তি করেছিলেন, সেই দুই পক্ষ যখন আলাদাভাবে দিনটি পালন করছে, শুধু এই বছরই নতুন না, বিগত অনেকগুলো বছর ধরে আলাদাভাবে পালন করছেন, তখন সেইখানে দাঁড়িয়ে এই কথা বলাটা সত্যি হয়ত তীর্যক মনে হতে পারে যে, আমি আনন্দিত যে, চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তারপরও আমি এই চুক্তির তাৎপর্য বিবেচনায়, এই চুক্তির যে ইমপ্যাক্ট, সেটার প্রভাব, সেই বিবেচনায় আমি মনেকরি যে, আনন্দিত হবার মত যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা এই চুক্তি সম্পাদন প্রমাণ করেছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি একটা রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ ছিল। এটা প্রমাণ করেছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক সমস্যা। কেননা, এই সমস্যাটা হচ্ছে একটা জাতি সমস্যার বিষয়। বাংলাদেশে যে কেবল এক জাতির মানুষ বাস করে না, এখানে যে বহু জাতির মানুষ বাস করে, যা অস্বীকৃত হয়েছে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে, বাহাত্তরের সংবিধান থেকে, সেই বাস্তবতা, যে দেশটা বহু জাতির মানুষের দেশ, সেই বাস্তবতার স্বীকৃতি ছিল এই চুক্তি। যেহেতু বহু জাতির মানুষের দেশ, সেহেতু সকল জাতির মানুষের অধিকারের প্রতিষ্ঠা হতে হবে এবং সেই প্রতিষ্ঠার পথ ছিল এই ৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত চুক্তি। এটা একটা দিক।

আর এই চুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল যে, পাহাড়ের মানুষ যে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সংগ্রাম করছিলেন, তাদের সেই সংগ্রাম ছিল ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম। এটা তার প্রমাণ ছিল। এবং চুক্তিও সেই কথা বলেছে, কেননা সেই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন তারা অস্ত্র সমর্পণ করলে তাদেরকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না, বরং তাদেরকে পুনর্বাসিত করা হবে। তারা যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন, সেই জন্য তাদেরকে পুনর্বাসিত করা হবে। এবং শুধু তারা নন, যারা এই যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দেশ ত্যাগ করে ভারতে যেয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন শরণার্থী হিসেবে, তারা দেশে ফিরলেও নিজ নিজ বাড়িঘরে, নিজ জমিতে পুনর্বাসিত করা হবে। সেই জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের যে অধিকার লংঘিত হয়েছে তার স্বীকৃতি হিসেবে সেইখানে তাদের সেই অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। এই কাঠামোগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, একটা হচ্ছে তিন পার্বত্য জেলায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং তিন পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদের কর্মকাণ্ডকে পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য এবং বেসরকারি ও সরকারি প্রশাসনও আছে, বেসরকারি উদ্যোগ, সেগুলোকে সমন্বয়সাধন ও তত্ত্বাবধানের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ গড়ে তোলা হবে।

এই সমস্ত কিছুই, এমনকি ভূমি ব্যবস্থাপনা, তার দায়িত্বও কিন্তু এই পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়। কাজেই পার্বত্য জনগণকে ক্ষমতায়ন করার ব্যবস্থাও পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে করা হয় এবং ৩৩টি বিষয় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্র যেটা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাহাত্তরের সংবিধান এই দেশটাকে একটা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে, আপনারা অনেকেই বাহাত্তরের সংবিধানকে প্রশংসা করেন, আমি এখন যত পেছন দিকে তাকাই, আমি দেখি, না, এত প্রশংসা করার মত এতকিছু নাই। ওর মধ্যে অনেক গলতি আছে। তার মধ্যে একটা গলতি হচ্ছে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বানানো। সেই এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই কিন্তু এই শান্তিচুক্তি বলেছিল যে, পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর হাতে কেন্দ্র থেকে ৩৩টি বিষয় হস্তান্তর করা হবে। তার মানে এই রাষ্ট্র আর এককেন্দ্রিক থাকবে না। এই রাষ্ট্র বহুকেন্দ্রিক হবে। আসলে তো একটা ডেমোক্রেটিক স্টেটে, একটা ডেমোক্রেসিতে ডিসেন্ট্রালাইজেশন হতে হয়। এবং সেই ডিসেন্ট্রালাইজেশনটা আরও কার্যকর হয় যখন সেটা রেভ্যুলেশন হয়। সেই রেভ্যুলেশনের ব্যবস্থাটা কিন্তু প্রথমটা তৈরি করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি।

কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্যে যে অমিত সম্ভাবনা, যে অমিত নতুন পথনির্দেশ আছে, সেই বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং একটা আনন্দের ব্যাপার। এবং একটা রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ শুধু নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আপাতভাবে হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা সশস্ত্রভাবে সংগ্রাম করছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, তারাও কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসার পথ তৈরি করতে পেরেছেন। আমি তুলনা করি যে, যেভাবে ইয়াসির আরাফাত, যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী বলে একসময় ঘোষণা করেছিল, তারা যখন চুক্তি স্বাক্ষর করলেন তারপরেই কিন্তু দেখা গেল যে, ইয়াসির আরাফাতকে পৃথিবীর মুক্তিকামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং হোয়াইট হাউসে তাকে রিসিভ করতে বাধ্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র একসময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে, যে রাষ্ট্র একসময় সন্তু লারমাকে দুষ্কৃতিকারী বলেছে, বলেছে সন্ত্রাসবাদী, যেভাবে একসময় পাকিস্তানীরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছিল দুষ্কৃতিকারী, বলেছিল ভারতীয় এজেন্ট, সেই রাষ্ট্রই কিন্তু আবার তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে এবং তাদেরকে সাদরে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে, এটা তাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। যেভাবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, অত্যন্ত যৌক্তিক, একইভাবে পাহাড়ের মানুষের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, অত্যন্ত যৌক্তিক এবং তার প্রমাণ হচ্ছে পার্বত্য চুক্তি।

এই চুক্তির মাধ্যমেই কিন্তু পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেদিক থেকে আমি মনেকরি, এই দিনটা সত্যি উদযাপন করার মত দিন। কিন্তু আমি লজ্জিত বোধ করছি মন্ত্রণালয়ের জন্য, যে মন্ত্রণালয়ের নাম হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এটা তাদের লজ্জা যে, তারা আজকে এই দিবসটা আলাদাভাবে পালন করছেন। তারা এই চুক্তি যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের সবাইকে নিয়ে এই দিবসটা পালন করার মত পরিবেশ তৈরি করতে পারেননি। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের লজ্জা এবং আমি মনেকরি এটা সরকারের লজ্জা। সরকার এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে এই আওয়ামীলীগ সরকার তখন ক্ষমতায় ছিলেন, তারাই তো চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। আজকে যখন তারা চুক্তি স্বাক্ষরকারীদেরকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠান করতে পারছেন না, তাদের মনে হয়, একটু আত্মানুসন্ধান করে দেখা উচিত যে, কেন তারা এটা করতে পারছেন না।

আমি আসলে যখন এখানে এসে গোড়াতে শুনছিলাম তখন আমাদের একজন তরুণ ছাত্রনেতা বক্তব্য রাখতে যেয়ে

বললেন, সরকার আসলে কী চায়? তিনি এই প্রশ্ন করলেন। আমি তার কথা থেকে এবং পরবর্তীতে যে আলোচনাগুলো হলো তার থেকে আপনারা সবাই বুঝেছেন, আমরাও বুঝেছি, আসলে এই চুক্তি নিয়ে টালবাহানা চলছে। এটা নিয়ে যেভাবে, এটাকে বাস্তবায়ন না করার এবং এই চুক্তিটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা রাষ্ট্র করছে, এতে করে বিশ্বাসের সংকট তৈরি হয়েছে। এতে করে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। এবং সরকার যদি ভাবে যে, তারা এই চুক্তিকে ভুলিয়ে দিতে পারবে, তাহলে কিন্তু তারা ভুল করছে। এখানে শামসুল হুদা ভাই, আমাদের বর্ষীয়ান সংগঠক, তিনি বলেছেন, কোনো সরকারই কিন্তু এমনকি যারা, যে দল বলেছিল যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে নোয়াখালী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে, সেই দলও যখন ক্ষমতায় এসেছে তারাও কিন্তু এই চুক্তি অস্বীকার করতে পারে নাই। কোনো সরকারই কিন্তু এই চুক্তিকে অস্বীকার করতে পারে নাই। শামসুল হুদা ভাই সঠিকভাবেই বলেছেন। এই চুক্তি রাষ্ট্রের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চুক্তি। এই চুক্তিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাহলে কী করতে হবে? তাহলে রাষ্ট্রের কৌশল হচ্ছে, এই চুক্তিকে ভুলিয়ে দিতে হবে।

এখনতো পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষজন বলবে, বাঙালি জাতি তাদের সঙ্গে শঠতা করেছে। এই শঠ হিসেবে যে পরিচিতি আদিবাসী মানুষের কাছে বাঙালি জাতির হচ্ছে, এই পরিচয় তো বাঙালি জাতির একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমি বহন করতে চাই না। আমি নিশ্চিত এখানে বাঙালি যারা আছেন, আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা সহ তারা কেউই সেটা মেনে নিতে চান না। আসলে আদিবাসীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা কী? সেখানেই তো সমস্যা। এই রাষ্ট্র যে বহু জাতির মানুষের রাষ্ট্র, এটার স্বীকৃতিটা তো আমরা ৭২ সালে দিতে পারি নাই। আমরা ভুল করেছি বললে মনে হয়, কম বলা হয়। আমরা অপরাধ যেটা করেছি বাহাত্তরে, সংবিধান প্রণয়নের সময়, সেই অপরাধ যে আমরা করেছিলাম সেটা কি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে বুঝতে পেরেছি? আমি একটা উদাহরণ বলি, আমাদের সমতলে বাংলাদেশের যত আদিবাসী আছে, তার বোধ হয় অন্তত তিনভাগের একভাগ, কেউ কেউ মনে করেন চারভাগের তিনভাগ, কেউ কেউ মনে করেন তিনভাগের দুই ভাগ আদিবাসী বাস করেন সমতলে। এই সমতলের আদিবাসীদের এবং পাহাড়ের আদিবাসীদের মধ্যে ৫০টা জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নামে। আদিবাসী দেওয়া উচিত ছিল, সেটা দেয়নি, কিন্তু ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নামে দিয়েছে। সেটা একটা খুবই ওয়েলকাম ডেভেলপমেন্ট।

কিন্তু যেটা বলার জন্য বলছি, এই স্বীকৃতির ধারাটা প্রথম শুরু হয় ২০১০ সালে, যখন একটা আইন হয়, যখন আমাদের প্রমোদ মানকিন দা ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী এবং তিনি যখন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক (উপজাতি শব্দটি আমি কোট আনকোট ব্যবহার করছি, এর সঙ্গে আমি একশভাগ দ্বিমত করি), যখন এই কোট আনকোট উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি বিলটা হয়, সেটা আইন হয়, তার মধ্যে কয়েকটা জাতির নাম তালিকাভুক্ত করেন, ২৭টা জাতি, তার মধ্যে তিনটি ছিল রিপিটেশন, আসলে ২৪ টা জাতির নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। সেই ২৪টার মধ্যে একটা ছিল বর্মণ জাতি এবং এই বর্মণ জাতি ২০১০ সাল থেকে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। সেই বর্মণ জাতি পরবর্তীকালে যখন ৫০ টা জাতি স্বীকৃতি পেয়েছে, তার মধ্যে এই বর্মণ জাতি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত আছে। দেখা গেল যে, ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন মহামান্য ডিসি বাহাদুর, তিনি, যখন এই বর্মণ ছাত্ররা তার কাছে যাচ্ছে সার্টিফিকেটের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে ভর্তির জন্য তারা আবেদন করবে, তো তাদেরকে দিচ্ছেন না। কারণ তিনি বলছেন, বর্মণ হচ্ছে বাঙালিদের উপাধি এবং বাঙালি হিন্দুদের একাংশ এই বর্মণ ব্যবহার করে। কাজেই এটা আদিবাসী নয়। আরে, তুমি বলার কে? তুমি দেখ, তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, বাঙালি বর্মণ আছে, কিন্তু আদিবাসী বর্মণও তো আছে। বাঙালির মধ্যে একটা বর্মণ উপাধি আছে বলে তুমি আদিবাসী বর্মণদেরকে দেবে না, তোমাকে এই অধিকার কে দিয়েছে? তুমি এটা দেখে নিতে পারো যে, সে আদিবাসী কি নাকি আদিবাসী না। আদিবাসী বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে একটু জ্ঞান লাভ করো, লেখাপড়া করো। মাতবরি করার জন্য, প্রশাসন চালানোর জন্য একটু লেখাপড়ার দরকার হয়। তিনি দেবেন না। তারপরে এটা নিয়ে ছাত্ররা অনেক বিক্ষোভ করলো, তারপরে তিনি বললেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে যদি একটি চিঠি আনা যায়, তাহলে তিনি এদেরকে সার্টিফিকেট দেবেন। এখন আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি বের করা মানেই ভগবানের কাছ থেকে চিঠি বের করার মতই কঠিন। সেটা অনেক কষ্ট করে চিঠি বের হয়েছে এবং সেই চিঠি ডিসির কাছে পাঠানো হয়েছে যে, সরকারের অধিভুক্ত যে জাতিসমূহ সেই জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে বর্মণ অন্যতম। কাজেই তাদেরকে সার্টিফিকেট দিতে কোনো বাধা নেই। তারপরেও ডিসি সাহেব দিচ্ছেন না। কী কারণে দিচ্ছেন না? তিনি এখন একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছেন। সেটা হচ্ছে কী! সেটা হচ্ছে, মন্ত্রণালয় থেকে যে চিঠি গেছে, সেই চিঠির মধ্যে বর্মণ বানান লেখা হয়েছে বর্মণ, আর ওখানে যারা ছাত্ররা আবেদন করেছে চিঠির জন্য তাদের কারো কারো সার্টিফিকেটে বানান আছে বর্মন। তো যাদেরটা 'ন' দিয়ে লেখা তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না। তো তিনি 'ন' আর 'ণ' এই বানান পার্থক্য দিয়ে এখন সার্টিফিকেট দেওয়া থেকে বিরত আছেন।

এই যদি হয় দৃষ্টিভঙ্গি, তার মানেটা কী? কতভাবে এদেরকে বঞ্চিত করা যায়! কত ছলে-বলে-কৌশলে এদেরকে বঞ্চিত করা যায়! এই যে ছলে-বলে-কৌশলে কথাটা বলছি, এটার কথা একটু আগে রাশেদ খান মেনন ভাইকে রেফার করে একজন বক্তা বলছিলেন, গতকাল বোধ হয় রোবায়েত ফেরদৌস বলছিলেন যে, গতকাল মেনন ভাই যেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে তিনি এই কথাটা উল্লেখ করেছিলেন। যখন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন হলো, সেই সংশোধনের সময় কতবার, সেই ড্রাফ্ট করে দেওয়ার পরেও দেখা গেছে যে, সেটা আবার ফিরে ফিরে একই জিনিস এসেছে। শেখ হাসিনা সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন, ড. গওহর রিজভী, তিনি নিজে আমাকে বলেছেন, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের একটি মিটিং হওয়ার পরে সেই মিটিঙের রেজুল্যুশনটা আর লেখা হচ্ছে না, সেটা তৈরি হচ্ছে না এবং ঐ রেজুল্যুশনটা লেখার জন্য তিনি নিজে, একজন উপদেষ্টা, তাকে টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরতে ঘুরতে তার আট মাস লেগেছে। তারপরেই সেই রেজুল্যুশন লেখা হয়েছে। একজন সরকারের উপদেষ্টাকে যদি টেবিল থেকে টেবিলে আট মাস ঘুরতে হয় একটা আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মিটিঙের রেজুল্যুশন কী হয়েছে সেটা বের করার জন্য, তাহলে আমাদের কতখানি অনিচ্ছা, এই রাষ্ট্র কতখানি অনিচ্ছুক সেটা বোঝার জন্য যথেষ্ট।

আমি খুব বেশি সময় নেবো না, আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই, আসলে এই বাংলাদেশ যে বহুজাতির মানুষের দেশ, এটার বাস্তবতাকে স্বীকার করুন এবং না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা যে চাই শান্তি চিরস্থায়ী হোক, আমরা আরেকবার বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধাবস্থার মধ্যে দেখতে চাই না। এখন আবার বহু লোক সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন ওখানে এবং তারা আমাকেও ত্রিপুরার বন্ধুরা জানিয়েছেন যে, তারা সেখানে যেয়ে আবার নতুন করে আবাস করার চেষ্টা করছেন। তার মানে, এখন আবার শরণার্থী তৈরি হচ্ছে। কেন এই দেশ থেকে শরণার্থী হয়ে মানুষ অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে? আমরা কি চায় আবার নতুন করে শরণার্থী সমস্যা তৈরি হোক? এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ৬৫ হাজার লোক ফিরেছে, সেই ৬৫ হাজারকে তো পুনর্বাসন করার কথা ছিল, ক'জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে? আমাদের এই যুদ্ধাবস্থাকালে যে ৯০,৫০০ পরিবার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিল, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর জীবন কী আমি জানি, ৭১ সালে গোটা নয় মাস আমার পরিবার উদ্বাস্তু ছিল, বাংলাদেশের অন্তত ৪ কোটি মানুষ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ছিল, সেই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে ৯০,৫০০ পরিবার, প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু, তাদের পুনর্বাসন করার কথা ছিল, সেটা কি হয়েছে?

যারা অস্ত্র সমর্পণ করেছেন তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য পুনর্বাসন করার কথা ছিল, বেশি না, সাড়ে ১৯শ/২ হাজার মানুষ, সেটা কি করা হয়েছে? এই জায়গাগুলো যদি না করেন এবং সেখানকার মানুষ যদি নিজ ঘরে, নিজ বাসভূমে ফিরে যেতে না পারেন, উৎপাদনের উপকরণ যদি তারা হাতে না পায়, তাহলে কী খাবে? আপনারা তো সেটেলারদেরকে দিচ্ছেন রেশন, এদেরকেও রেশন দিন। না হলে এই মানুষগুলো কী করবে? এই মানুষগুলোর তো জীবন-জীবিকা একেবারে চূড়ান্ত দিকে পৌঁছে গেছে।

আমি যে কথাটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে, ভূমি সমস্যার সমাধান করুন, পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে যে যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সেটা করুন। আসলে আজকে যেটা বলা হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের হারানোর কিছু নাই, আমরা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে দেখেছিলাম, শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারার হারানোর কিছু নাই। আজকে আমার মনে হচ্ছে, সেই শ্লোগান শুনলাম। শৃঙ্খল ছাড়া আদিবাসীর হারানোর কিছু নাই। আমি মনেকরি, পাহাড়ের মানুষ আজকে সমতলের মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। লড়াই কিন্তু দীর্ঘকাল পাহাড়ের আদিবাসীরা এককভাবে করেছিলেন, আজকে পাহাড়ের আদিবাসীর সঙ্গে সমতলের আদিবাসী যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো অনেকেই কিন্তু সামনে এগিয়ে এসেছেন। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি, আওয়ামীলীগ- এদের কারোরই আদিবাসী সংক্রান্ত নীতির প্রশ্নে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়, যদি রাইট উইং এবং লিবারেল রাইট বলে যারা পরিচিত তাদের অবস্থান যদি একই হয়ে যায়, সেটা দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে দেশের জন্য। অন্তত চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে এটা প্রত্যাশিত নয় এবং তারা অন্তত রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক সমাধানের গুরুত্ব বোঝেন, বুঝবেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি। এবং যারা আদিবাসীর সংগ্রামকে সমর্থন করেন, এখানে আছেন আমি দেখেছি, কমিউনিস্ট পার্টি, বাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি সহ যে দলগুলো আছেন, আপনাদের অনুরোধ করবো, আপনারা আদিবাসীদের আয়োজিত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন গত ২৬ বছর ধরে আমি দেখছি, আপনারা নিজেদের দলের পক্ষ থেকে প্রোগ্রাম আয়োজন করুন এবং তাদেরকে ডাকুন সংহতি দেওয়ার জন্য। তাহলে আপনাদের আন্তরিকতার এবং আপনাদের দায়িত্ববোধের আরও অধিক পরিচয় মিলবে। আপনাদের ধন্যবাদ।

‘সারাক্ষণই তারা বলছে চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে, এটা এককথায় মিথ্যাচার’

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
কো-চেয়ারপারসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন

আজকের আয়োজনের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয়, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, যাকে আমরা সন্তু দা বলে সম্বোধন করি, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এই সমাজের অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যারা রাজনীতিক এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ এবং সঙ্গে যারা আছেন সুধীজন, আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুভ অপরাহ্ন, আমরা দুপুর গড়িয়ে ফেলেছি কথা বলতে বলতে এবং আপনারা অনেক ধৈর্য্য ধরে আমাদের সবার বক্তব্য শুনছেন, সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর মাস, আমাদের বিজয়ের মাস। আমাদের অর্জিত বিজয়, সেই বিজয়ের মাস। এই মাসে আমরা বিশেষ করে স্মরণ করি আমাদের ৩০ লক্ষ শহীদকে, আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি ১৪ই ডিসেম্বর যাদের দিবস পালন হয়, শহীদ বুদ্ধিজীবী, তাদের কথা এবং একই সঙ্গে বলতে চাই, সেই জায়গা থেকে যদি কথাটা শুরু করি, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের ভিতে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে একটা কথা সংক্ষেপে বলতেই চাই, কারণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই কথাটা আসে, কাজেই এটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায় এবং সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। সেটা হলো যে, আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানি। এই কথাটা আমি একটু বিরোধিতা করি। আমার একটা হাত যদি কেটে দেওয়া হয় বা পা যদি ভেঙে দেওয়া হয়, আমার দেহ থেকে যদি মস্তক ছিন্ন করা হয়, তাতে কিন্তু আমরা বলি না যে সম্ভ্রমহানি হয়েছে। তো নারীর একটি শরীরের উপর যদি নির্যাতন হয় সেটা সম্ভ্রমহানি হবে কেন? তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। আমার মনে হয়, এই জায়গাটাতে পরিষ্কার করা দরকার যে, আমরা বলবো যে, ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন এবং যে নারীরা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের সম্ভ্রমহানি হয়নি, তারা নির্যাতিত হয়েছেন, তাদেরকে আমরা বীরাঙ্গনা বলেই স্বীকৃতি দিয়েছি, তাদের বীর বলেই পরিচিত করবো সবার কাছে।

আমি কথা শুনতে শুনতে যে কথাটা মনে হয়েছিল কিংবা আমার দীর্ঘদিনের যে কর্মকান্ড, সেটার অভিজ্ঞতা থেকে এবং আজকে যে পরিস্থিতিতে আমরা দাঁড়িয়েছি, মনে হচ্ছে আমরা সামগ্রিকভাবে একটা অত্যন্ত অসুস্থ, অস্বচ্ছ রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। রাজনীতি তো সমাজকে প্রভাবান্বিত করে, অতএব রাজনীতি যেহেতু এত অসুস্থ, এত অস্বচ্ছ, আমাদের সামাজিক যে ব্যবস্থাপনাগুলি রয়েছে সেগুলি অত্যন্ত অস্বচ্ছ, যেটাকে বলে অযোগ্য, অথর্ব কতগুলি প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনা নিয়েই আমাদের সমাজটা এগুচ্ছে। আরেকটা কথা বলতে চাই আজকে দাঁড়িয়ে, সেটা হলো- হ্যাঁ, এই যে আমাদের এত বড় ধরনের অর্জন, আনন্দের অর্জন, আনন্দে বিষাদে মেশানো অর্জন, কারণ আমরা অনেক স্বজন হারানো দুঃখ বুকে ধারণ করে এই স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, সেই স্বাধীনতা আসলে বেদখল হয়ে গেছে, দেশটা আসলে বেদখল হয়ে গেছে। বেদখল কাদের দ্বারা হয়েছে? আমি এককথায় বলতে চাই, যারা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী। যদিও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির দাবিদার যারা তারা ক্ষমতায় আছেন, তারা বলেন, তারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি, সমস্ত দেশ কিন্তু চলে যারা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ছিল তাদের কথায়। সেটা না হলে মানুষের এত বঞ্চনা কেন? সেটা না হলে আমরা সমতার একটা সমাজ গঠন করতে পারলাম না কেন? আমাদের শিক্ষানীতি পরিবর্তন করতে হয় কেন? যেকোনো কথা বলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হয় কেন?

একটা চুক্তি করে একটা রাষ্ট্র, একটা সরকার যিনি আজকের প্রধানমন্ত্রী, তিনি সেদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই এই চুক্তিটা করেছিলেন, তিনি সেই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে পারেন না কেন? তার মানে তার হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেছে। তার ক্ষমতা হরণ করা হয়েছে এখানে। নাহলে তো তিনি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে পারতেন। মেসবাহ বলেছেন, চুক্তিটা যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেটা একটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার। সেটা নিশ্চিত। রাজনৈতিকভাবে যে সমস্যাটা সমাধান করা যায় সেটা আমরা দেখাতে পেরেছিলাম। এবং আজকে নাকি বলা হয়েছে এটা বিরল ঘটনা, বিরল ঘটনা কেন হবে? অনেক চুক্তি কিন্তু সাধিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে। মানুষ পর্যায়ে পর্যায়ে যখন নানা ধরনের দ্বন্দ্বে, কলহে, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, চুক্তি সাধিত হয়েছে। কাজেই এটা কিভাবে বিরল সেটা জানি না। এটা নিয়ে উচ্ছ্বাস করার আছে। উচ্ছ্বাসটা যদি সেইভাবে দেখি আমি, আমাকে ক্ষমা করবেন, এটার জন্য আমাকে বিপদেও পড়তে হতে পারে, কিন্তু দায়িত্ব নিয়েই বলছি, উচ্ছ্বাসটা যদি

সেইভাবে দেখি, আমরা অনেক সময় কাউকে ঠকিয়ে ফেললে উচ্ছ্বসিত হই না? যদি মানুষকে কিছু কথাবার্তা বলে, হ্যাঁ তার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিয়েছি এবং আদায় করে নিয়ে আমি এমন একটা অবস্থানে আছি, সেই আদায় করা জিনিসটা নিজেই ভোগ করতে পারছি, অপর পক্ষ আর পারছে না। তখন আমরা উচ্ছ্বসিত হই। অথবা আমাদের রাষ্ট্রপতি অথবা আমাদের প্রধানমন্ত্রী খুবই উচ্ছ্বসিত হতে পারেন, অথবা তার দলও খুব উচ্ছ্বসিত হতে পারে। কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমরা উচ্ছ্বসিত হতে পারছি না। কারণ আমরা অপরপক্ষে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা প্রতাড়িত হয়েছি। আমরা ঠকেছি। হ্যাঁ, একটা রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের অবসান ঘটাতে পেরেছি। সেটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রশংসার ব্যাপার, অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু তারপরে কী হচ্ছে?

একটা উপায়কে আমরা লক্ষ্য হিসেবে জাহির করে পুরস্কৃত হচ্ছি, উচ্ছ্বসিত হচ্ছি। এই চুক্তিটা তো একটা উপায় ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর একটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য উপায়। সেই উপায়টাকে লক্ষ্য ধরে সেখানেই শেষ, আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করে নিয়েছি সেখানেই শেষ, তারপরে কি হবে না হবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার তো প্রয়োজনই নেই, বরং সেটার উল্টো কথা আমরা বলে যাচ্ছি। সারাক্ষণই তারা বলছে যে, চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা এককথায় মিথ্যাচার এবং অসত্য। আমরা যখন মিথ্যাচার মেনে নিতে বাধ্য হই, আমাদের তখন কোথাকার কথা মনে হয়? আমরা গোয়েবলসের কথা জানি, একটা কথা বারবার বারবার করে বললে, প্রবচনের মত হয়ে গেছে, একটা মিথ্যা কথা বারবার বলে মানুষকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা। সেই জায়গা থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির মানুষ সরে আসতে পারছে না। এটার থেকে দুর্ভাগ্যজনক আমাদের জন্য আর কী হতে পারে!

আজকের সরকার, আজকে যারা ক্ষমতায় আসেন, তাদের মধ্য থেকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি যে বিশেষ বিধান রাখা হয়েছিল সেই আইনটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটাও একটা কিন্তু অপপ্রচেষ্টা। এটার বিরুদ্ধে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে। যাতে কোনো অবস্থাতেই বাতিল করতে না পারে, আমাদের সেটা নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা একটুখানি বলি এখানে। একটা সময়ে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায়ই যেতাম। একটা পর্যায়ে আমরা যখন কমিশন হিসেবে যেতাম, আমাদেরকে সামরিক বাহিনী তাদের যে ক্যান্টনমেন্ট আছে সেখানে নিয়ে যেতো, আমাদেরকে তাদের ভাষায় ব্রিফিং করতো পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে। ওখানে একটা পর্যায়ে এসে তারা বলছেন যে, তারা কত আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, এজন্যই বোধ হয় পরবর্তী পর্যায়ে আমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে, আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আপনাদের কী ভূমিকা থাকতে পারে? আপনারা তো নিরাপত্তার কাজটা করবেন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তো আপনাদের ভূমিকা থাকার কথা নয়। সেটা তো অন্যদের কাজ। তারা বলেছেন, না না, এটা তো পাহাড়ি অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, পাহাড় থেকে নামা উঠা ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের প্রশিক্ষণ আছে, এগুলো আমরা ভালো পারি। আমি প্রশ্ন করলাম, পাহাড়িদের থেকেও আপনারা পাহাড় ভালো উঠানামা করতে পারেন? সেটার উত্তর আমি পাই নাই। সেটার উত্তর অন্যভাবে হয়ত পেয়েছি।

আমি আজকে এটা খুবই সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যে বলা হচ্ছে, এভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, সেটা তো শুধু দেশের সীমানার মধ্যে হতে পারে, তাই না? হা হা..এখানে বৃহৎ জনগোষ্ঠী আছে, আমি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অংশ, আপনারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। আচ্ছা বলা গেলো। আপনি যখন এই সীমানার বাইরে যাবেন, তখন যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কী? আপনি কি বলবেন যে, আপনি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী? আমি কিন্তু বলতে পারবো, আমি বাঙালি, আমি বলতে পারবো আমি মুসলমান। কিন্তু আপনারা কিভাবে বলবেন যে, আপনারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী? কিসের তুলনায় ওখানে যেয়েও আপনারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী? কাজেই, এটা যে কত ভিত্তিহীন একটা পরিচয়, এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, সেটা বলার জন্য আমি একথাটা বললাম। এটার আসলে কোনো ভিত্তিই নাই। আপনি ইউরোপে যান, আপনি আমেরিকায় যান, ওখানে যেয়ে আপনি কিভাবে বলবেন যে, আমি একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী? আপনাকে বলতেই হবে যে, আমি চাকমা, আমি মারমা, আমি সাঁওতাল, আপনাদের আদিবাসীদের যে পরিচয় আছে সেটাই বলতে হবে। তার মানে আপনার পরিচয়টাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা। তার মানে আপনার পরিচয়টাকে একেবারে মুছে ফেলার একটা চেষ্টা।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের যে বিষয়গুলো দেখেছি, চুক্তির যেগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়। এই উদাহরণটা আমি অনেকবার দিয়েছি, আবারও দিই, যারা শুনেছেন তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি, যারা শুনেন নাই তাদের জন্য বলছি। আমি রান্না করে টেবিলে একটা খাবার আসতে হবে। তো আমি বাজার করি, আমি কুটনা কুটি, আমি বাটনা বাটি, আমি মশল্লা তৈরি করি, আমি মাছ ধুই, মাংস ধুই, আমি তরকারি তৈরি করি। কিন্তু রান্না আর করি না। কিন্তু আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন হ্যাঁ, আমি তো করছি, আমি তো করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিষয়টাও সেরকমই হয়ে

আছে। হ্যাঁ, কিছু কিছু তো বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয়ে, আমি যেটা চাইছিলাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর নিঃসংকোচ, স্বাভাবিক জীবন, তাদের অধিকারের জীবন, তাদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে এমন একটা জীবন, সেখানে আমি পৌঁছাতে পেরেছি? পারি নাই তো, সেটা তো আমি আনতে পারি নাই। তাই যত কিছুই করি, সেই পারাটা কিন্তু অর্থহীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ সরকার যে কথাগুলি বলছে, যে বাস্তবায়নের কথাগুলি বলছে, তা অর্থহীন কথা বলছে এবং সার্বিকভাবে একটা অসত্য কথা বলছে। এটা আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। এটা যদি আমরা বুঝতে না পারি, এটা যদি আমরা বার বার বলতে না পারি, তাহলে প্রতারণার সুযোগটা আমরা বেশি করে দেবো।

সামরিক আধিপত্য সেখানে বজায় রয়েছে। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি নিয়েও আমার এই প্রশ্নটা আছে। আজকে কত বছর ধরে তারা সেখানে! এবং তাদের অজুহাতটা কী? তারা সেখানে শান্তি রক্ষার জন্য আছে। এতদিন থেকেও তারা যদি সেখানে শান্তি রক্ষা করতে না পেরে থাকে, তাহলে তারা মানে মানে সরে আসে না কেন! 'নারে ভাই, এ কাজ আমাদের দ্বারা সম্ভব না, আমরা শান্তি রক্ষা করতে পারি না! পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি রক্ষা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের নতুন কিছু কৌশল নিতে হবে। আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে। সামরিক বাহিনী দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।' এটা তাদের মেনে নিতে হবে, মেনে নিয়ে নতুন কৌশল বের করতে হবে। আমরা সামরিক আধিপত্য থেকে মুক্তি চাই। এই অঞ্চল সামরিক শাসনের অধীনে থাকুক, এটা আমরা চাই না। কারণ আমরা আমাদের ৫২ সালের যতগুলো আন্দোলন বিশ্লেষণ করি, ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, প্রত্যেকটির পেছনে, বিশেষ করে ৫৮ সালের পর থেকে সবচেয়ে বড় একটা প্রণোদনা ছিল যে, এই দেশের মানুষ সামরিক শাসনের অধীনে থাকবে না। তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে আমরা সামরিক শাসনের অধীনে রেখে দেবো কেন? কোন যুক্তিতে? কোন আদর্শে? কোন প্রত্যয়ে? কোন ভাবনায়? সেখানেও একটা ফাঁকিবাজির ব্যাপার রয়ে গেছে।

আমরা বলছি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি, আমরা দেশ পরিচালনা করছি, কিন্তু আমরা একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে, বৃহৎ ছেড়ে দিলাম, ক্ষুদ্র বলতে হবে, একটা জনগোষ্ঠীকে সামরিক শাসনের অধীনে রেখে দিলাম। এটাও তো একটা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কথা। সেজন্য আমি বলছি যে, আজকে দেশটা দখল হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির হাতে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকলে এটা চলতে পারে না। এটা স্ববিরোধী। সংবিধানের কথা বলেও কোনো লাভ নাই। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মও রয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতাও রয়েছে। এটা কোন ধরনের সংবিধান সেটা নিয়ে চিন্তা হয়। তারপরও তো রয়েছে, স্থানীয় সরকারগুলিকে শক্তিশালী করার বিরাট একটা ব্যাপার ছিল এবং চুক্তির মধ্যে কিন্তু সেটা ছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার একেবারে সম্পূর্ণভাবে সেখানে যারা পরিচালনা করবেন তারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা। সেই জায়গায় আজকে অসম্ভব রকমভাবে একটা অস্বচ্ছতার মধ্যে চলে গেছে। সেগুলো তো হয় নাই, এখন যদি স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হয়, আমার শংকা আছে, সেখানে ফলাফলটা আমরা কী দেখতে পাবো। কাজেই সেখানে একটা বড় ফাঁকির মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

ভূমি সমস্যার সমাধান হয়নি। যারা অভ্যন্তরীণভাবে ভূমিচ্যুত হয়েছেন তাদের পুনর্বাসন হয়নি, যারা বাইরে থেকে এসেছেন, যেটা আমাদের চুক্তির মধ্যে অঙ্গীকার ছিল যে, তাদেরকে পুনর্বাসন করা হবে, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, সেগুলি কিছুই করা হয়নি। আমরা একটার পর একটা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। একটার পর একটা কথা দেওয়া থেকে সরে এসেছি। একটা কিছু আমরা আন্তরিকভাবে করতে পারি নাই।

আজকে নির্বাচন সামনে এসেছে। নির্বাচন একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আমি কয়েকদিন ধরে চিন্তা করছি, মাথাও খারাপ করছি নিজেকে প্রশ্ন করে করে। নিজের ডামি প্রার্থী দেওয়া হবে, এটা খোলাখুলিভাবে আলোচনা হচ্ছে এবং এই নির্বাচন যদি হয়, ডামি প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যারা জিতে আসবে তাদেরকে আমরা কি স্বীকার করে নেবো যে, তারা আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছে? এবং আমরা সারা বিশ্বকে বলবো যে, আমরা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করেছি, আমরা অবাধ নির্বাচন করেছি? সেখানেও তো ফাঁকিবাজি। আপনারা একাই ফাঁকিবাজির শিকার হননি, আমরা নিজেরাও ফাঁকিবাজির শিকার হয়েছি। নিজের সঙ্গে নিজেরা ফাঁকিবাজি করছি। আত্মপ্রতারণা করছি। একটা জাতি যখন আত্মপ্রতারণার জায়গায় চলে যায়, তাদের অবস্থা কী হতে পারে সেটা ভেবে শংকিত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। যারা এখানে নির্বাচিত হয়ে আসবেন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হোক, ডামি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই হোক, যারা এখানে আসবেন তাদের কিছু কিছু পরিচয় তো আমরা পেয়েছি। বিশেষ করে আবুল কালাম আজাদের কথা তো বলতেই হয়। যিনি মনোনয়ন পেয়েই ইপিজেড/জোট তৈরি করেন। আমি তো সেটা কিছুদিন আগে একটা পত্রিকায় লিখেওছি। আওয়ামীলীগের যবে থেকে মনোনয়ন দেওয়া শুরু হয়ে গেছে তখন থেকেই ওরা বিজয়ীর মতন আচরণ করা শুরু করেছে। এখন তাদের মনোনয়ন নিশ্চিত হয়েছে, এখন তো তারা আরও ডবল বিজয়ীর মতন

আয়োজন করছেন এবং এখনই তারা কাজকর্ম করতে শুরু করবে যেটা তাদের নিজেদেরই স্বার্থে যাবে। এই সংসদ হবে একটা বিত্তশালী সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং ব্যবসায়ীদের একটা ক্লাবের মতন। এই সংসদ তো আর জনগণের সংসদ নাই। এখনো নাই, আর থাকবেও না। সেই জন্য আমি শংকা প্রকাশ করছি।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি একটা কথা বলেই শেষ করবো, সেই কথাটা হলো, আমি অনেক বার বলেছি, আবারও বলি, দুঃখের সঙ্গে বলি, সেটা হলো, আমার মনে হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে উপহার দেওয়া হয়ে গেছে। সেটা কাদের কাছে উপহার দেওয়া হয়ে গেছে সেটা স্পষ্ট করে বলার আর অপেক্ষা রাখে না। আমরা জানি, কারা কারা ওখানে আছেন, কারা ওখানে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, যা কিছু অধিকার সমস্ত কিছু ভোগ করছেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষই এখন নিজ দেশে পরবাসী হয়ে আছে। এই ঘটনার নিন্দা জানানো ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু উপায় নাই। এটার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা বার বার বলেছি, আমি রাজনৈতিক শক্তির যারা প্রতিনিধি আছেন এখানে, তাদের কাছে আবেদন জানাবো যে, আপনারা এই বিষয়টা আসলে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করুন, শক্তভাবে দাঁড়ান, আপনারা যারা জনকল্যাণের রাজনীতি করেন, শুধুমাত্র একটা ছোট্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে, খালি বক্তৃতা ও বক্তব্যের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে, আগের মতন যখন আপনাদের দেখেছি, আমি আবারও বলছি, ষাটের দশকে দেখেছি, সত্তরের দশকে দেখেছি, সেইভাবে মানুষের পাশে এসে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। না হলে কিন্তু আমরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবো না।

আমি অনেক দেশে দেখেছি, আদিবাসীদের প্রতি যে নিপীড়ন হয়েছে, যে অত্যাচার হয়েছে, সেটার জন্য রাষ্ট্র একটা পর্যায়ে ক্ষমা চেয়েছে। আমি সেই দিনের আশায় থাকবো, যেদিন আমাদের রাষ্ট্র আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইবে যে, আমরা আপনাদের কাছে অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি, আমাদের ক্ষমা করে দিন। সেটা যতদিন না হবে, এই রাষ্ট্র যে আমার, এই রাষ্ট্রের যে আমি একজন অংশ সেটা নিয়ে সংকোচে থাকছি। আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। সবার জন্য শুভকামনা রইলো।

‘পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আবারও নতুন কিছু ভাবনার উদয় হচ্ছে’

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ, সম্মানিত সুধীবৃন্দ, সংগ্রামী তরুণ সমাজ। সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম দিবস উপলক্ষে অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। এখানে অবশ্য কিছু বিষয় অবতারণা হয়েছে। যেগুলো হয়তোবা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তবে আজকে সময়ের অভাবে আমি বলবো যে, আমি ঐ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না।

এখানে একটা প্রস্তাব এসেছে, রাজধানী ঢাকার বুকে পার্বত্য অঞ্চলের পার্বত্য চুক্তির সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত, যারা দাবি জানাচ্ছে বা যারা বাস্তবায়ন চায়, তাদের উদ্যোগে এখানে একটা কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশ করানো। আমার মনে হয়, এই প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয় এবং সেটা সম্ভব হবে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। তবু আমি বলি যে, এখানে আমরা প্রতিবছর রাজধানীর বুকে নানা আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে ওখানকার বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি। এই প্রসঙ্গে শুধু এটাই বলবো, যে পার্বত্য অঞ্চল বলা যেতে পারে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই কোনো না কোনো ধরনের সামরিক শাসনাধীন রয়েছে এবং বর্তমানেও এই সামরিক শাসনের উপস্থিতিটা সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজভাবে অনুভব করা যেতে পারে। সুতরাং ওখান থেকে উদ্যোগ নিয়ে ঢাকার বুকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দাবিতে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে বক্তব্য দেওয়া বা কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে সেই পার্বত্যাঞ্চলের বিশেষ শাসনব্যবস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা সেটা হতে দেবে না।

যা হোক, আরেকটা বিষয় আমি এখানে উত্থাপন করতে চাই। ২৬ বছর আগে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই স্বাক্ষরের

দুটো পক্ষ আছে। একটা হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষ, আরেকটা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের পক্ষ। দুই পক্ষই কিন্তু এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। তবে সেখানে এদেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক জনগণও দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয়, পার্বত্য অঞ্চলে যে আন্দোলনটা হলো, আন্দোলনের পরিণতি কী হতে পারে? আমি সেই আন্দোলনের একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে, বছরের পর বছর ধরে আমি সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের লড়াই-সংগ্রামে আমি আমার সারাটি জীবন এখানে রয়ে গেছি এই আন্দোলনের সঙ্গে, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত। এখানে আন্দোলন-সংগ্রাম বা চুক্তির নানা দিক দিয়ে এখানে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আমি শুধু আমার অনুভূতি থেকে এটা বলতে পারি যে, যেখানে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, দমন, পীড়ন, নির্যাতন থাকে, সেখানে আন্দোলন থেমে যায় না। পার্বত্য অঞ্চলে, এদেশের একজন মুক্তিকামীর মুক্ত মনে, মুক্ত একটা জীবন ও সমাজ নিয়ে বেঁচে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজমান, সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে বলতে পারি যে, পার্বত্য অঞ্চলের যে স্বাধিকারকামী ও মুক্তিকামী যারা আছেন তারা কিন্তু এই আন্দোলন থেকে সরে যাবেন না। সরে যাচ্ছেও না।

বিদ্যমান পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সেখানে অবশ্যই এই আন্দোলন বৃহত্তর পরিসরে ক্রমাগত ঘনীভুত হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। তাই আজকে আমার নতুন করে এদেশের সরকার ও শাসকগোষ্ঠীকে বলার নেই। বহুবার বলা হয়েছে, বহুকিছু বলেছি। অনেক সমালোচনা, অনেক পর্যালোচনা এখানে হয়েছে। শুধু এইটুকু বলবো, বাংলাদেশের যে বিদ্যমান পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের। সেটা অন্য বাস্তবতা। সেখানে সেনাশাসনের যে বাস্তবতা, সেই বাস্তবতা অনুভব করা উচিত এবং আমি মনেকরি, পার্বত্য অঞ্চলে জুম্ম জনগণ বিগত ২৬ বছর ধরে তারা চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আসছে। কিন্তু আজকে আশা-আকাঙ্ক্ষা আপাত পর্যায়ে আমি মনেকরি তারা ভাবতে আর পারছে না, তারা হৃদয়ে আর ধারণ করতে পারছে না। তাদের মধ্যে যে বাস্তবতা, সেই বাস্তবতা হচ্ছে যে, বেঁচে থাকার জন্য সম্মান, অধিকার নিয়ে তার যে দায়-দায়িত্ব, সেটাকে মনে রেখে আজকে মনে হচ্ছে যে, পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আবারও নতুন কিছু ভাবনার উদয় হচ্ছে।

আজকে এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দিবস উপলক্ষে যারা বরাবরের মতই সংহতি প্রকাশ করতে এসেছেন, সহমর্মিতা জানাতে এসেছেন, এখানে আমাদের প্রধান অতিথি, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সবাইয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আজকে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের যে সংগ্রাম, লড়াই, যারা বরাবরই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আজকেও তারা আছেন, আমি অবশ্যই তাদের কাছে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের তথা এদেশের নিপীড়িত-নির্যাতিত আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। আমি আবারও তরুণ সমাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, পার্বত্য অঞ্চলের তথা সারা দেশের আদিবাসী সমাজের, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫০টির অধিক যে আদিবাসী জাতি তাদের মধ্যেকার যে তরুণ সমাজ, আপনারা ভাববেন, ভাবুন, আপনারা বাস্তবতাকে অনুভব করুন এবং সেই বাস্তবতার আলোকে আপনার উপর যে দায়-দায়িত্ব, সংগ্রামের বা লড়াইয়ে যে দায়-দায়িত্ব, সেটা আপনারা আরও গভীরে গিয়ে অনুভব করুন, সেটাই আমি কামনা করি।

> দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ..এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়। *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

প্র • ব • ন্ধ

একালের সাঁওতাল যোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ সরেন

॥ পাভেল পার্থ ॥

‘তকারে জানামলেন দং দ
হিহিড়ি দং দ পিপিড়ি রে,
চীর কন ধীরতি পাঁচ কন পৃথিমি বীইগীন নাতরে
গীইয়ে গহালরেয় জানামলেনা।’

[কোথায় জন্ম নিয়েছিল সাঁওতালদের গানের সুর দং দ?
হিহিড়ি পিপিড়ি নামের জঙ্গলদ্বীপের বীইগীন গ্রামে জন্মেছিল সুর।]

(দং সুরের এই গানটি সংগ্রহ ও অনুবাদ করেছেন নিরলা মার্ডী)

সাঁওতালী পুরাণ থেকে জানা যায়, ‘হিহিড়ি-পিপিড়ি’ জনপদে জন্ম নেওয়া সাঁওতালেরা খজখামান, হারাতা, সাসাংবেডা হয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে ‘দামিন-ই-কোহ্’ যা সাঁওতাল পরগণা হিসেবে পরিচিতি পায় সেই এলাকায় এসে আবারও সাঁওতাল সভ্যতা গড়ে তুলে।

‘হিহিড়ি-পিপিড়ি’র আখ্যানসহ এমন বহু সাঁওতালি আখ্যান শুনিয়েছিলেন তুমুল জনপ্রিয় আদিবাসী নেতা ও বিপ্লবীকর্মী রবীন্দ্রনাথ সরেন। বলেছিলেন, আমরা পিলচু হাড়াম পিলচু বুঢ়হির বংশধর। পৃথিবীতে যখন প্রাণের উদ্ভব হয়, তখন চারধারে কেবল জল আর জল, প্রাচীন হাঁসেরা মাটির তলা থেকে কাদামাটি আবিষ্কার করেছিল। সাঁওতালদের বহু গোত্রপ্রতীক নানা বৃক্ষ-পাখি-বুনো প্রাণ। প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষার শপথ জন্মের পর থেকেই প্রতিটি সাঁওতাল শিশুর শুরু হয় নিজের পরিবারেই। রবীন্দ্রনাথ সরেনের পারিস বা গোত্র ‘সরেন’। নীল কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ এই গোত্রের প্রতীক। সরেন গোত্রকে সাঁওতাল সমাজে একইসঙ্গে ‘যোদ্ধা’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সরেন আরও বলেছিলেন, আমরা ফুলমণি, সিধো, কানহু, বীরসা, শিবরাম মাঝির উত্তরাধিকার। যাদের নাম উল্লেখ করা হলো তাঁরা হুল, উলগুলান কিংবা তেভাগা সংগ্রামের নায়ক। তারা সাঁওতাল।

এই ভূমির অন্যতম আদি বাসিন্দা সাঁওতাল জাতি এখন বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী। বাংলাদেশের সর্বশেষ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২’ অনুযায়ী দেশে আদিবাসী জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৬,৫০,১৫৯ জন এবং জাতিগোষ্ঠী ৫০টি।

শুধু সাঁওতাল নয়, দেশের সব আদিবাসীদের অধিকার ও প্রাণ-প্রকৃতির সুরক্ষার দাবি নিয়ে ফুলবাড়ি থেকে ভীমপুর, বাগদাফার্ম থেকে বগুড়া, নাচোল থেকে ভাওয়াল, চা বাগান থেকে মধুপুর, সমতল থেকে পাহাড়ে সাহস নিয়ে দাবড়ে বেড়ানো রবীন্দ্রনাথ সরেন ১২ জানুয়ারি গভীর রাতে অনন্তলোকে যাত্রা করেন। জাতিগত নিপীড়নকে বারবার প্রশ্ন করে দাঁড়ানো এক সাঁওতাল যোদ্ধা যেন মহাবিশ্বের নক্ষত্রপুঞ্জে

মিশে গেলেন দুম করেই। বহু কাজ, বহু কথা, বহু দরবার অমীমাংসিত রয়ে গেল।

মেহনতি আদিবাসী নিম্নবর্গের অধিকার, পরিবেশ ও পাবলিক সম্পদ সুরক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ সরেনের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সখ্যতা ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি থেকে। তিনি আমার আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষক এবং বন্ধু। প্রান্তিকতা, অধিকার এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর সামগ্রিক তৎপরতা এক গুরুত্বপূর্ণ ডিসকোর্স বিকশিত করেছে। সকল প্রাণের মৃত্যুই শূন্যতা তৈরি করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সরেনের অসময়ে প্রস্থান আমাদেরকে বহু জটিল প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাঁর চিন্তা-দর্শন ও তৎপরতার নিবিড় পাঠ এবং অনুশীলন জাগিয়ে রাখবার ভেতর দিয়ে হয়ত নতুন প্রজন্ম সকল প্রশ্নের সামনে দাঁড়াবার সাহস পাবে। দগ্ধ ও দায়িত্বশীল হবে। নানা স্মৃতি-বিস্মৃতির ভেতর থেকে চলতি আলাপখানি রবীন্দ্রনাথ সরেনের অবিস্মরণীয় চিন্তা-দর্শন ও কর্মতৎপরতাকে পাঠ করছে।

বারকোণা থেকে দশদিগন্ত

উত্তরাঞ্চলের বহু স্থাননাম সাঁওতালি ভাষার। বীরটোলা, বিরল, বীরগঞ্জ। সাঁওতালি ভাষায় 'বীর' মানে জংগল। দিনাজপুরের পার্বতীপুরের বারকোণা গ্রামটিও ছিল জঙ্গলময়। আশেপাশে সব ছিল আদিবাসী বসতি। বারকোণা গ্রামে ১৯৫৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর জন্ম নেন রবীন্দ্রনাথ সরেন। মা সুমি টুডু ও পিতা দারকাল সরেন। চার ভাইবোনের ভেতর রবীন্দ্রনাথ সবার ছোট। সবার বড় বোন নীলমনি সরেন, বড় ভাই সুন্দর সরেন ও মেজ ভাই বুধরায় সরেন। ভর্তি হন বারকোণা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পার্বতীপুর হাবড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। দিনাজপুর সঙ্গীত কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক। রাজশাহী শাহ মখদুম কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করার পর রাজশাহী ল' কলেজে আইনে ভর্তি হন। কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ আদিবাসী গ্রাম পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। ছাত্রজীবনে বামপন্থী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তরুণ বয়সে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ নিয়ে খুঁজে বেড়ান নাচোলের তেভাগাকর্মীদের।

১৯৯২ সালে তাঁর পরিচয় ঘটে অনিল মারান্ডীর সঙ্গে এবং ১৯৯৩ সালে গড়ে তুলেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদ। উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চল, চা বাগান এবং ঢাকাতেও সম্প্রসারিত হতে থাকে সাংগঠনিক তৎপরতা। আদিবাসী পরিষদের ৯ দফা দাবি প্রণয়েন তাঁর ভূমিকা অনন্য। দিনাজপুর-৬ আসন থেকে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেন। কেবল 'জাতীয় আদিবাসী পরিষদ'-ই নয়, তাঁর অনুপ্রেরণা এবং তৎপরতায় ২০০৩ সালে 'আদিবাসী সাংস্কৃতিক পরিষদ', ২০০৮ সালে 'আদিবাসী ছাত্র পরিষদ', ২০১১ সালে 'আদিবাসী যুব পরিষদ' এবং ২০১২ সালে গঠিত হয় 'আদিবাসী নারী পরিষদ'। 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম', জনপ্রিয় ব্যান্ড গানের দল 'মাদল'সহ বহু স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠন গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি, কাপেং ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন, 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' জাতীয় কমিটির সদস্য হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতিসংঘে আদিবাসী স্থায়ী ফোরামে যোগদানের মাধ্যমে বৈশ্বিক আদিবাসী আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ভূমি কমিশন গঠনের স্বপ্ন

'ধীরে ধীরে বসতভিটা, গাছপালা সবই শেষ হয়ে গেল
আমি এখন নিজ দেশে পরবাসীর মতো।
ওরা এখন আমাকে বলছে
যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পারো তুমি।'

(বরেন্দ্র ভূমিতেই জন্ম নিয়েছি আমি চুনু মাঝি,
রবীন্দ্রনাথ সরেন, ২০০৮)

সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠনের দাবি ও আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বহু রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ইশতেহারেও এই দাবিকে অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। ২০০০ সনের ১৮ আগস্ট নওগাঁর ভীমপুরে ভূমি রক্ষা করতে গিয়ে খুন হন আলফ্রেড সরেন। রবীন্দ্রনাথ সরেন 'আলফ্রেড সরেনের ভূমি আন্দোলনকে' দেশব্যাপী পরিচিত করে তুলতে ভূমিকা রেখেছেন। তারই সহযোগিতায় এ ঘটনা নিয়ে আরণ্যক নাট্যদল 'রাঢ়াঙ' নাটক তৈরি করে। তাঁরই সক্রিয়তায় গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম ভূমি রক্ষা আন্দোলন শুরু হয় ২০১৬ এর দিকে। ১৯৬২ সনে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৫নং সাপমারা ইউনিয়নের রামপুর, সাপমারা, মাদারপুর, নরেঙ্গাবাদ ও চকরহিমাপুর মৌজার ১৮৪২.৩০ একর ভূমি 'রংপুর (মহিমাগঞ্জ) সুগার মিলের' জন্য অধিগ্রহণের নামে কেড়ে নিয়েছিল তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার। ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালালে নিহত হন শ্যামল হেমব্রম, মঙ্গল মার্ডী ও রমেশ টুডু। ফুলবাড়ি উন্মুক্ত কয়লাখনির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় আদিবাসী ও গ্রামের বাঙালিদের নিয়ে।

পরবর্তীতে এটি জাতীয় সংগ্রামে রূপ নেয়। ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট ফুলবাড়িতে এশিয়া এনার্জি কোম্পানির অফিস ঘেরাও

কর্মসূচিতে সহস্র জনতাকে সংগঠিত করার নেতৃত্ব দেন। 'ফুলবাড়ি', 'আলফ্রেড সরেন' ও 'বাগদাফার্ম' রবীন্দ্রনাথ সরেনের তিনটি উল্লেখযোগ্য পাবলিক আন্দোলন।

থামতে দেখিনি কখনও

মাত্র ৬৭ বছরের জীবনে তাঁকে থামতে দেখেনি কেউ। রাতবিরেতে, দিনেদুপুরে, শীত-বর্ষা, গ্রাম কী শহরে। তিনি ছুটে গেছেন রক্তপাত কী আগুনের ভেতর। দাঁড়িয়েছেন বন্দুক কী বাহাদুরির সামনে। সৃজনশীল ও উপযোগী সব কর্মসূচি গ্রহণে তিনি দক্ষ ছিলেন। প্রচারপত্র, পোস্টার, চিঠি, স্মারকলিপি কিংবা অবস্থানপত্র তৈরিতে খুব সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে বানান, আলোকচিত্র ব্যবহার ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে।

১৯৯৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তীতে নাচোলে ইলা মিত্রের উপস্থিতিতে লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ সরেনের ভূমিকা অনন্য। আদিবাসী পরিষদের ৯ দফা দবি বাস্তবায়নের জন্য উত্তরাঞ্চলের ১০ হাজার আদিবাসী নারী-পুরুষকে নিয়ে ঢাকায় বিশাল গণসমাবেশ করেন ১৯৯৮ সালের ৮ ডিসেম্বর। ২০০৯ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহীতে ভূমিরক্ষায় আয়োজন করেন দীর্ঘ গণপদযাত্রা। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে এক লাখ গণস্বাক্ষর নিয়ে ২০১০ সালের ১০ ডিসেম্বর মানববন্ধন করেন জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে। দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা মুন্ডাদের একত্র করতে ২০১১ সালে তাঁর উৎসাহে সবিন চন্দ্র মুন্ডা ও নরেন পাহান শুরু করেন 'জাতীয় মুন্ডা সম্মেলন-২০১১'। একই সালের ৩০ জুন সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সংসদ অভিমুখে মিছিল সংগঠিত হয় তার নেতৃত্বে। ২০১৪ সালে নওগাঁতে সংগঠিত যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে বিচিত্রা তির্কীর সঙ্গে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলেন। ভূমি অধিকারের দাবিতে ২০২২ সালে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে বিশাল সব গণকর্মসূচি আয়োজন করেন।

নানা সময়ে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেও তিনি কাউকে বুঝতে দেননি। চিকিৎসার নামে দিনাজপুরে তাঁর পায়ের তিনটি আঙুলে কেটে ফেলে ডাক্তার। অসুস্থ অবস্থায় রাজনীতিবিদ পংকজ ভট্টাচার্যের পরামর্শে তাঁকে ঢাকায় এনে চিকিৎসা করা হয়। কিছুটা সুস্থ হয়ে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দারুণ ক্ষিপ্র ও চৌকস ভাষণ ও আলাপে জাগিয়ে রাখেন আদিবাসী আন্দোলনের ময়দান। কিন্তু কী নিদারুণ! আবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন দিনাজপুরে লাইফসাপোর্টে থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে হঠাৎ করেই এক তীব্র শীতের রাতে সব শেষ।

'নিঞাঃ কড়ামরে দ চীরটি পাটাঃকান
(যন্ত্রণায় আমার বুক চুরমার হয়ে যাচ্ছে)
'নিত মেনাঃ দাড়ে মেনাঃ
নওয়া দাড়ে দ বাং তাঁহেঁ না,
সেরমা রে সিঞ চান্দ কর্মচীরি বাবা মেনায়
নওয়া দাড়ে দ বাং তাঁহেঁ না'

[আজকে শরীরের শক্তি আছে, এই শক্তি সারাজীবন থাকবে না। আকাশে দিনের বেলা সূর্য আছে, এই শক্তি সবসময় থাকবে না।]

(দং সুরের এই গানটি সংগ্রহ ও অনুবাদ করেছেন নিরলা মার্ডী)

রবীন্দ্রনাথ সরেনের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা দৃঢ় ও দীর্ঘ। সংগঠন কী পরিবারে আমরা আমাদের গল্প ও সিদ্ধান্তগুলো ভাগাভাগি করতাম। আদিবাসী পরিষদের পোস্টার কি চিঠি দেখে দেইনি বা রবীন্দ্রনাথ সরেন আমার কোনও লেখা পড়েননি এমন খুব কম ঘটেছে। কিন্তু কী দুঃসহ, এই লেখাটি তিনি পড়তে পারবেন না। সাঁওতালি ভাষায় চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'নিঞাঃ কড়ামরে দ চীরটি পাটাঃকান' (যন্ত্রণায় আমার বুক চুরমার হয়ে যাচ্ছে)।

রাজশাহীতে সাঁওতালি ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আদিবাসী মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিকে তিনি সামনে এনেছিলেন। নওগাঁয় ওঁরাওদের 'কারাম পরব' ও দিনাজপুরে সাঁওতালদের 'বাহা পরব' জাতীয়ভাবে আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি কোনও আয়রোজগার করতেন না, মানুষের সহযোগিতা এবং গণ চাঁদার মাধ্যমেই কাজ করতেন। কীভাবে যে বিশাল সব আয়োজন সফল করেছেন হাতে একটি পয়সা ছাড়া সেসব এখনো বিস্ময় জাগায়। আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা এবং তরুণদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন।

এতসব কর্মতৎপরতার ভেতর পরিবারেও সময় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কন্যা ভারত এবং পুত্র বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। তিনি সবসময় কৃতজ্ঞ ছিলেন তাঁর স্ত্রী সংস্কৃতিকর্মী ও নেতা বাসন্তী মুর্মুর প্রতি। কারণ কৃষিকাজের মাধ্যমে সংসারের যাবতীয় ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা সামলেছেন বাসন্তী। পুরো পরিবারই সক্রিয়ভাবে জড়িত হন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, বাংলাদেশে এমন উদাহরণ বিরল। বিরলকে দৃষ্টান্তে আর অসাধ্যকে সাধ্য করবার প্রমাণ হিসেবে হাজির করবার যে দীক্ষা রবীন্দ্রনাথ সরেন জাগিয়ে রেখে গেছেন, বিশ্বাস করি তা নিরন্তর বিকশিত হতে থাকবে।

লেখাটি ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত 'সকাল সন্ধ্যা.কম (www.shokalshondha.com) থেকে সংগৃহীত।

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতারণা

॥ দীপায়ন খীসা ॥

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংঘাতের অবসানে তৎকালীন সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক এই 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। ২৫ বছর পেরিয়ে ২৬ বছরে চুক্তির বয়স। বাস্তবতা হলো, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের ২৫ বছর পেরিয়ে গেলেও এই চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ এখনও বাস্তবায়িত হয়নি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুমিয়া মানুষের অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে তার অনন্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও বিকাশের কাজটি এখনো অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলে শাসকগোষ্ঠী এখনো ঔপনিবেশিক কায়দায় পাহাড়ী মানুষের উপর শাসন ও শোষণ অব্যাহত রয়েছে।

এটা একটা খুবই আশ্চর্য্যের ঘটনা। চুক্তির আয়ুষ্কাল বাড়ছে আর বাড়ছে। ১, ২, ৩ করে এখন ২৬ রছরে পদার্পণও করছে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার যে গতি সেটা মন্থর থেকে মন্থরতর পর্যায়ে গিয়ে থমকে পড়ে আছে। বরং চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছেনা সেটা স্বীকার না করে সরকার সংশ্লিষ্টরা চুক্তির অধিকাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে এই ধরনের অসত্য তথ্য প্রচার করে চলেছে। আমরা প্রায়ই শুনি শাসকমহল বলে থাকেন জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিবাসীদের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার অসহযোগিতার কারণে চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এখন তাহলে আসল বিষয়টা কি? যারা দীর্ঘ ২৪ বছরের অধিক সময় সশস্ত্র লড়াই করলেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা চুক্তিতে উপনীত হলেন। শাসকগোষ্ঠী অভিযোগ করছে সেই জনসংহতি সমিতি এবং দলটির নেতা চুক্তি বাস্তবায়নে সহযেগিতা করছেন না। যাঁরা জীবন বাজি রেখে সর্বোচ্চ ত্যাগ করে একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করলেন। দুই যুগের অধিক কঠিন এক সংগ্রামী জীবন কাটালেন। সেই সংগ্রামী জীবন পেরিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর আবার দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে নিরলস সংগ্রাম করছেন, সেই তারা চুক্তি বাস্তবায়নে অসহযোগিতা করছেন। এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করাটাই একটা বড়সড় অপরাধ। আমরা দেখছি রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিগণ প্রতিনিয়িত এই অপরাধ করেই চলেছেন।

চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল দুটি পক্ষের মধ্যে। একটি পক্ষ হচ্ছে জনসংহতি সমিতি এবং অন্য পক্ষ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। চুক্তিটি ক, খ, গ ও ঘ এইভাবে ৪ টি খণ্ডে বিভক্ত। 'ক' খণ্ড সাধারণ, 'খ' খণ্ড পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পার্বত্য জেলা পরিষদ, 'গ' পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং 'ঘ' পুনর্বসান, সাধারণ ক্ষমা ও অন্যান্য বিষয়াবলী। ক খণ্ডে ৪ টি, খ খণ্ডে ৩৫ টি, গ খণ্ডে ১৪টি এবং ঘ খণ্ডে ১৯ টি ধারা আছে। এসবের আবার অনেকগুলো ধারার বিভিন্ন উপধারা রয়েছে। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। তারপর তৎকালীন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদল্লাহকে আহ্বায়ক করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই জাতীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বেশ কয়েক দফা বেঠকে মিলিত হয়। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষ একটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে উপনীত হয়। স্বাক্ষরিত হয পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। ২ ডিসেম্বর ২০২৩ এই চুক্তিটি ২৬ বছরে পদার্পণ করছে। চুক্তির এই ২৬ বছরের প্রথম পৌনে চার বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। মাঝখানের বিএনপি এবং মঈনউদ্দিন-ফকরউদ্দিন সরকার বাদে আবার টানা তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায়। চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। আর চুক্তি স্বাক্ষরের পর সবচয়ে বেশি মেয়াদে ক্ষমতায়ও আওয়ামী লীগ। আর এই চুক্তি করার কারণেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারও অর্জন করেছিলেন। বর্তমান যে টানা তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষতমায় আছে, সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু শেখ হাসিনা। আমরা নিয়মিত শুনছি আওয়ামী লীগ সরকারের লোকজন বলে বেড়ান তারা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। সুতরাং তারাই চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন। আরও মজার বিষয় হচ্ছে ১৯৯৭ সালের পর যতগুলো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। সর্বশেষ ২০১৮ এর নির্বাচনে দলটির নির্বাচনী ইশতেহারেও চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন সে যেন এক দূর অস্ত।

আমরা ধরে নিলাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি। কিন্তু ২০০৯ থেকে

টানা ১৫ বছর দলটি আরও অধিক দাপট নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন। আওয়ামী লীগের এমন দাপুটে ক্ষমতার সময়ে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থমকে থাকল। বিষয়টি তাহলে কি? ২০০৯ সালে ক্ষমতায় ফেরার পর আওয়ামী লীগ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বেশ ঘটা করে বলা শুরু করেছিল 'বিএনপি জামায়াত সরকার চুক্তিটি ডীপ ফ্রীজে রেখেছিলেন, আওয়ামী লীগ সেই ডীপ ফ্রীজ থেকে চুক্তিটি বের করে এনেছে। দীর্ঘ সময় ডীপ ফ্রীজে রাখার কারণে চুক্তিতে বরফের পুরু আস্তর জমেছে। বরফের আস্তর কেটে যেতে একটু সময় দরকার।' কিন্তু আওয়ামী লীগ চুক্তিটি ডীপ ফ্রীজ থেকে বের করে কি করেছিল? সেটা তারাই ভালোই জানবেন। নাকি একবার বের করে আবার গোপনে ডীপে চালান করে দিয়েছিল? কারণ আওয়ামী লীগের সেই ডীপ ফ্রীজ তত্ত্বের বাস্তবিক কোনো ধরনের কার্যকারিতা আমরা দেখতে পাই নি। বরং টানা ১৫ বছরের মেয়াদকালে আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের পথেই হাটলো না। ইদানীং চুক্তি সংশ্লিষ্ট সরকারের দায়িত্বশীলমহল বলা শুরু করেছে, চুক্তি অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। একটা ছোট অংশ অবাস্তবায়িত আছে। সেটাও হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য. চুক্তি বাস্তবায়ন না করে অসত্য তথ্য প্রচার করা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। সেটা তারা বিগত ১৫ বছর ধরে একটানা করেই চলেছেন।

সরকারের এই ক্রমাগত মিথ্যাচারের বিষয়ে জনসংহতি সমিতির সূত্র জানাচ্ছে- 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে পাশ কাটিয়ে তথা পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পর্যালোচনা মূল্যায়ন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি মূল্যায়ন, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটি একটা প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। সরকার (গত এপ্রিলে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরামের ২২তম অধিবেশনে) উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এই মর্মে অসত্য ও একতরফা তথ্য প্রচার করছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৮টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে; অবশিষ্ট ২৯টি ধারা সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো হয় আংশিক বাস্তবায়ন করে অথর্ব অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে, নয় তো সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে।' পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছরে দাঁড়িয়ে এটাই হচ্ছে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার আসল চিত্র।

চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে বাজারে আরেকটি তথ্য বেশ জোরেশোরে প্রচারিত হয়ে আসছে। সেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চুক্তি বাস্তবায়নে খুবই আন্তরিক। কিন্তু নানান পারিপার্শ্বিক বাধার কারণে তিনি চুক্তিটি বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। বাজারে প্রচারিত এই তথ্যটি অনেকেই আবার বিশ্বাসও করেন। একথা ঠিক যে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার সময় আগ পর্যন্ত সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা চুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে বেশ আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষরের নানান বাধাকে উপক্ষো করে তাঁর সরকার ১৯৯৭ সালে আন্তরিকতার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পথে এগিয়েছিলেন। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে তিনি কতটুকু আন্তরিক সেটার প্রতিফলন আমরা জনসংহতি সমিতির প্রদত্ত তথ্যে দেখতে পাচ্ছি। ২০০৯ সাল থেকে টানা তৃতীয়বার শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। বিখ্যাত দ্যা ইকোনমিস্ট শেখ হাসিনাকে চলতি বছরের ২৪ মে এশিয়ার লৌহ মানবী বলে ভূষিত করেছেন। আমরা জানি দল এবং সরকারে সর্বক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং তিনি চুক্তি বাস্তবায়ন চান, তিনি চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক। তা সত্ত্বেও কোনো এক অজানা কারণে চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বাজারের এই কথা মনে হয় বাস্তবে খাটছে না। এশিয়ার প্রতাপশালী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি সত্যি সত্যিই চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক হতেন সেই সুতাঁর এক টানা ১৫ বছরের শাসনামলে আবাস্তবায়িত অবস্থায় থাকার কথা না।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা বেশ কিছুদিন ধরেই বলছেন, 'চুক্তি তো বাস্তবায়ন হচ্ছেই না, বরং শাসকগোষ্ঠী চুক্তিকে ভুলিয়ে দেওয়ার নানান কলাকৌশল চালিয়ে যাচ্ছেন।' সন্তু লারমার এই বক্তব্যই চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর আসল চরিত্র ফুটে উঠে। চুক্তির ২৬ বছরে আমরা বরং পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর উল্টো যাত্রা দেখতে পাচ্ছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির স্বাক্ষরের অন্যতম দর্শন ছিল পাহাড়ের সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। তাই নিরাপত্তার চশমা দিয়ে এই সমস্যাকে চিহ্নিত করা যাবে না। নিরাপত্তা চশমা দিয়ে দেখার ভুল শুধরে রাষ্ট্র ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরে এক ঐতিহাসিক ও সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু চুক্তির ২৬ বছরে এসে রাষ্ট্র এবং শাসকগোষ্ঠী আবারও ভুল পথেই হাঁটছে। সেই কারণে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থমকে গেছে। বরং চুক্তি অধিকাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে বলে গোয়েবলসীয় মিথ্যাচারে শাসকগোষ্ঠীর অতি উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আসল সত্যি

হচ্ছে চুক্তিকে ভুলিয়ে দেওয়ার আরেক ষড়যন্ত্র শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চুক্তি বাস্তবায়ন না করে উল্টো চুক্তি ভুলিয়ে দেওয়ার অপতৎপরতা বেশি দৃশ্যমান। এটা স্পষ্টতই চুক্তি স্বাক্ষরকারী দল জনসংহতি সমিতি এবং জুম পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর প্রতারণারই সামিল। যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। এবং চুক্তির ২৬ বছর বয়সের মধ্যে চলতি টানা ১৫ বছরসহ মোট ১৮টি বছর দলটির ক্ষমতার মেয়াদকালের আওতায় পড়েছে। তাই জুম্ম জগণের সঙ্গে এই প্রতারণার একটা বড় দায়ভার আওয়ামী লীগেরই উপরই বর্তায়। তবে জুম পাহাড়ের মানুষ জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে এই প্রতারণার জবাব দিতে প্রস্তুত আছে। সেই কারণে চুক্তি বাস্তবায়ন না করে নিরাপত্তার চশমা নিয়ে পাহাড়কে দেখার ভুল দর্শন শাসকগোষ্ঠীর জন্য বুমেরাং হয়ে ফিরে আসার সমূহসম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

> “জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের জন্য মৃত্যুকে জয় করেছি। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, আমরা আমাদের অধিকারের জন্য আমরা জীবিত অবস্থায় মৃত থাকতে চাই না। আমরা চাই মানুষের মতো বেঁচে থাকতে এবং বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতে।”
>
> –জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

ক্রোড়পত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ক্রোড়পত্র ২ ডিসেম্বর ২০২৩

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: আলোচ্য ক্রোড়পত্রটি জাতীয় দৈনিক 'সমকালে' ২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। আরো বহুল প্রচারের জন্য ক্রোড়পত্রটি এখানে পুনরায় পত্রস্থ করা হলো।]

সভাপতির কিছু কথা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জুম্ম জনগণ তথা সমগ্র দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সেই কাঙ্ক্ষিত সমাধান এখনো অর্জিত হয়নি।

পক্ষান্তরে সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো ফ্যাসীবাদী সামরিক কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধানের নীতি গ্রহণ করে চলেছে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠছে। বলাবাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো দেশের এক-দশমাংশ এলাকাকে অগণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে রেখে দেশে কখনোই গণতান্ত্রিক শাসন বিকশিত হতে পারে না।

জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসীরা আশা করে যে দেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও বুদ্ধিজীবী সমাজ পার্বত্য সমস্যা সমাধানে অধিকতরভাবে এগিয়ে আসবেন।

তাই পার্বত্য চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশের স্বার্থে ও জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে অধিকতর সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু ২৬ বছরেও পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান আজো অর্জিত হয়নি।

বলাবাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ সরকার গত ২০০৯ সাল থেকে ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়েও বর্তমান সরকার পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ তো গ্রহণ করেইনি অধিকন্তু চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম

বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর হতে বসেছে।

উল্লেখ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে পাশ কাটিয়ে তথা পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পর্যালোচনা মূল্যায়ন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি মূল্যায়ন, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটি একটা প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

সরকার (গত এপ্রিলে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরামের ২২তম অধিবেশনে) উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এই মর্মে অসত্য ও একতরফা তথ্য প্রচার করছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৮টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে; অবশিষ্ট ২৯টি ধারা সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো হয় আংশিক বাস্তবায়ন করে অথর্ব অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে, নয় তো সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে। দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে চুক্তির অবাস্তবায়িত মূল বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা গেল-

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ:

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ক' খন্ডের ১নং ধারায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ'-এর বিধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পাহাড়ি অধিবাসীদের ভূমি অধিকার সংরক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ যথাযথভাবে কার্যকর করে পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ শাসনকাঠামো স্থাপন, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, পরিষদসমূহে সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি হস্তান্তরকরণ, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়াদি বাস্তবায়ন অপরিহার্য ও জরুরি।

ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে উভয় পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সংলাপ চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক তৎকালীন চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলকে বারংবার জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন যে উনিশ্‌শো আশি দশকে পুনর্বাসিত পাঁচ লক্ষাধিক সেটেলারদেরকে সমতল অঞ্চলে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন দেয়া হবে। তবে বিশেষ কারণে তা চুক্তিতে উল্লেখ করা যাবে না। কিন্তু আজ অবধি সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান করা হয়নি যা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকার বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করে চলেছে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করা হয়েছে বলে সরকার কর্তৃক যে বক্তব্য পেশ করা হয় তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অথচ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণকল্পে (১) সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিভিন্ন ভাষা-ভাষী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল মর্মে সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, (২) সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের ৪ উপ-অনুচ্ছেদে 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের' শব্দসমূহের অব্যবহিত পরে 'বা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর পাহাড়িদের' শব্দসমূহ সংযোজন করা, (৩) উনিশ্‌শো আশি দশকে পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে সমতল জেলাগুলোতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।

আইন সংশোধন সংক্রান্ত:

চুক্তির 'ক' খন্ডের ২নং ধারায় এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে বলে বিধান করা হয়। পার্বত্য চুক্তির এই ধারা অনুসারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সংশোধন করার মাধ্যমে এই ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে সরকার দাবি করে আসছে। অথচ পার্বত্য চুক্তির এ বিধান কার্যকর করার জন্য ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন, ১৯২৭ সালের বন আইন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন (আইন, বিধিমালা, আদেশ, পরিপত্র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন বা Allocation of Business ইত্যাদি) সংশোধন করা অপরিহার্য। পার্বত্য

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বেশ কয়েকটি আইন, বিধি ও পরিপত্র সংশোধন করার জন্য সুপারিশমালা পেশ করা হলেও সরকার কর্তৃক আজ অবধি কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। এমনকি ভূমি কমিশনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। সুতরাং এ বিধান সম্পূর্ণ 'বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন:

পার্বত্য চুক্তির 'খ' ও 'গ' খন্ডের বিধানাবলীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি।

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদ

পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডে পার্বত্য জেলা পরিষদ সংক্রান্ত ৩৫টি ধারার মধ্যে ৩৩টি ধারা বাস্তবায়িত ও ১টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মাত্র ১৬টি ধারা বাস্তবায়িত, ১৫টি ধারা অবাস্তবায়িত এবং অবশিষ্ট ৪টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো নিম্নে উত্থাপন করা গেল, যেগুলো সরকার 'বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে দাবি করছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা বাস্তবায়িত হয়নি-

'অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা' সংজ্ঞা সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩নং ধারা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু কার্যকর করা হয়নি। উক্ত ধারা লঙ্ঘন করে ২১/১২/২০০০ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক অফিসাদেশের মাধ্যমে সার্কেল চীফের পাশাপাশি ডেপুটি কমিশনারদেরও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহারের জন্য বার বার দাবি করা সত্ত্বেও প্রত্যাহার করা হয়নি। ডেপুটি কমিশনাররা পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন।

'ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন' সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ৯নং ধারাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সংযোজিত করা হলেও বাস্তবায়ন করা হয়নি। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য পার্বত্য জেলা ভোটার তালিকা বিধিমালা-২০০০ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা-২০০০ এর খসড়া প্রণয়ন করে। আইনের ৫৩ ধারা অনুসরণে আঞ্চলিক পরিষদ এ সব বিধিমালার উপর সুপারিশ পেশ করে। তবে উক্ত বিধিমালাসমূহ আজ অবধি প্রণীত হয়নি। কাজেই এ বিধান 'বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

'নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ' সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ১০নং ধারাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এখনো 'নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ' করা হয়নি।

'উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন' সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ১৯নং ধারায় সন্নিবেশিত 'জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে'- এই অংশটি আইনে সংযোজিত করা হয়নি। অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে পার্বত্যবাসীর নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করার আত্মনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন ধারা গড়ে উঠেনি। তাই এ বিধান 'আংশিক বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

'পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সদস্য নিয়োগ বদলি' সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ২৪নং ধারাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। এ বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়নি। অপরদিকে পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশবাহিনীর বদলি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে আসছে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে 'পুলিশ (স্থানীয়)' ও 'আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' বিষয় হস্তান্তর করা ও পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু কমিটির এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে ১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকৃত ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন

মোতায়েন করার নির্দেশনা জারি করা হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন।

পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ভূমি বন্দোবস্তী, হস্তান্তর, ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা প্রদান, অধিগ্রহণে বিধিনিষেধ সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ২৬নং ধারাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। বস্তুত বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ইহা কার্যকর করা হচ্ছে না। আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির দোহাই দিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ডেপুটি কমিশনারগণ নামজারি, ইজারা ও বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন।

চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৪(ক) ধারা মোতাবেক 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যতম একটা বিষয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের কার্যাদিও পার্বত্য জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়নি।

'ভূমি উন্নয়ন কর আদায়' সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ২৭নং ধারাটি আইনে সংযোজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। অথচ জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে এখনো ন্যস্ত করা হয়নি। এ ক্ষমতা এখনো ডেপুটি কমিশনারগণ প্রয়োগ করে চলেছেন। তাই এ বিধান 'বাস্তবায়িত' হয়েছে বলে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরযোগ্য বিষয় বা কার্যাবলী সংক্রান্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৩ ও ৩৪নং ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা কার্যাবলী আইনে সংযোজিত হলেও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। যেমন জেলার আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। এছাড়া পর্যটন, মাধ্যমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো ত্রুটিপূর্ণভাবে পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাই এ বিধানগুলো সম্পূর্ণ 'বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমতও সঠিক নয়।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত চুক্তির 'গ' খন্ডের ১৪টি ধারার সবক'টি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত চুক্তির 'গ' খন্ডের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো নিম্নে উত্থাপন করা গেল, যেগুলো সরকার 'বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে দাবি করছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসব ধারা বাস্তবায়িত হয়নি।

'পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য নির্বাচিত হবেন' মর্মে চুক্তির 'গ' খন্ডের ২নং ধারায় যে উল্লেখ রয়েছে তা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি। কাজেই এ বিধান বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

আরো উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার বিধানাবলী আঞ্চলিক পরিষদ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হয়নি। এ যাবৎ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতার কারণে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ যাবতীয় বিষয়াদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা যাচ্ছে না।

তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করার বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ অপারেশন উত্তরণের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ অনুযায়ী পূর্বেকার মতো জেলার সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন। তাই চুক্তির 'গ' খন্ডের ৯নং ধারা সম্পূর্ণ 'বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকার সংক্রান্ত চুক্তির 'গ' খন্ডের ১৩নং ধারা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে সংযোজনের মাধ্যমে ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে সরকার। বস্তুত চুক্তির এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়নে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করছে না বা পরামর্শ নেয়া হলেও তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ

(সংশোধন) আইন ২০১৪ প্রণয়নের সময় আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ/মতামত উপেক্ষা করা হয়।

পাহাড়ি শরণার্থী পুনর্বাসন:

'ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত' চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১নং ধারাটি বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে সরকার দাবি করছে। কিন্তু জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির মতে, ৯,৭৮০ পরিবার তাদের ভিটেমাটি ও জায়গা-জমি ফেরৎ পায়নি ও অন্যান্য দাবিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়নি। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন ফেনী উপত্যকার মাটিরাংগা, মানিকছড়ি ও রামগড় উপজেলায়, মাইনী উপত্যকার দীঘিনালা ও চেঙ্গী উপত্যকার মহালছড়ি উপজেলায় এবং রাংগামাটি পার্বত্য জেলাধীন মাইনী ও কাচলং উপত্যকার লংগদু উপজেলায় অবস্থিত ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম, ভিটে-মাটি ও জায়গা-জমি এখনো সেটেলার বাঙালিদের পুরো দখলে রয়েছে। তাই এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন:

'ঘ' খন্ডের ১নং ধারায় বর্ণিত 'তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা' সংক্রান্ত বিষয়টিও 'বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যা সঠিক নয়।

২৭ জুন ১৯৯৮ তারিখ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় সভায় পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বলতে যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় তদনুসারে ২০০০ সালে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু হিসেবে ৯৩ হাজার পাহাড়ি পরিবারকে পরিচিহ্নিত করা হয়েছে। তবে তাদেরকে স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণপূর্বক পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ও ভূমি কমিশন:

চুক্তির 'ঘ' খন্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন সংক্রান্ত তিনটি ধারা (যথাক্রমে ৪, ৫ ও ৬নং ধারা) রয়েছে। এই তিনটি ধারার মধ্যে সরকারের ভাষ্য অনুসারে ৪নং ধারাটি 'আংশিক বাস্তবায়িত', ৫নং ও ৬নং ধারা দুটিও 'বাস্তবায়িত' হয়েছে যা সঠিক নয়। বিগত ২৬ বছরেও একটি ভূমি বিরোধও নিষ্পত্তি হয়নি।

গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ পাশের মধ্য দিয়ে ১৫ বছর পর ২০০১ সালে প্রণীত ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হয়। আইন সংশোধনের পর ভূমি কমিশনের বিধিমালার খসড়া তৈরি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে ০১ জানুয়ারি ২০১৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার এখনো সেই বিধিমালা চূড়ান্ত করেনি। এর ফলে ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ এখনো শুরু করা যায়নি। এছাড়া ভূমি কমিশনের নেই পর্যাপ্ত তহবিল, জনবল ও পারিসম্পদ।

অস্থানীয় ও অউপজাতীয়দের নিকট প্রদত্ত জমির ইজারা বাতিল সংক্রান্ত:

অস্থানীয় ও অউপজাতীয়দের নিকট প্রদত্ত জমির ইজারা বাতিল সংক্রান্ত চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ৮নং ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে সরকার দাবি করে আসছে। উল্লেখ্য যে, ২০ জুলাই ও ১৮ আগস্ট ২০০৯ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবান জেলায় অ-স্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে এখনো চুক্তি মোতাবেক কোন রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সে সমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৫৯৩টি প্লটের প্রায় ১৫,০০০ একর জমি এবং রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রায় ৩৫০ একর ভূমি লীজ বাতিল করা হয়। তবে বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক উক্ত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে লীজ বাতিলের দু' মাসের মাথায় স্মারক নং-জেপ্রবান/লীজ মো:নং-১০৬০(ডি)/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ ১৯/১১/২০০৯ মূলে বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করা হয়। অন্যদিকে অবশিষ্ট প্লট কাগজে কলমে বাতিল করা হলেও এখনো সে সব প্লট লীজ গ্রহীতাদের দখলে রয়েছে।

'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার সংক্রান্ত:

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৯৭-১৯৯৯ সালে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে দুই দফায় মাত্র ৬৬টি অস্থায়ী ক্যাম্প এবং ২০০৯-২০১৩ সালের মেয়াদকালে ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার হয়েছে। তবে প্রত্যাহৃত অনেক অস্থায়ী ক্যাম্প পুনর্বহাল করা হয়েছে। তার মধ্যে কেবল কোভিড-১৯ মহামারী কালে কমপক্ষে ২০টি ক্যাম্প পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া বিষয়ে কোন সময়-সীমা আজ অবধি নির্ধারিত হয়নি। ৫৪৫টি অস্থায়ী ক্যাম্পে মধ্যে ১০১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলেও এখনো প্রায় চার শতাধিক সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যান্য অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়নি। উল্লেখ্য, পূর্বের 'অপারেশন দাবানল' এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে সরকার কর্তৃক একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারি করা হয়। এই 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পর্যটন, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অন্যদিকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিবর্তে ১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে 'সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকৃত ২৪০টি ক্যাম্পে পর্যায়ক্রমে পুলিশ মোতায়েন করা হবে' মর্মে এক নির্দেশনা জারি করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা:

এ বিধান যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। চুক্তির এ বিধান কার্যকর করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি।

এ প্রেক্ষিতে ২২ অক্টোবর ২০০০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিষয়টি কার্যকর করার জন্য অনুকূল পরামর্শ প্রদান করে এবং উক্ত পরামর্শ মোতাবেক ২৫-০৮-২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তির এ বিধানটি সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/নিয়োগ প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংস্থার নিকট পত্র প্রেরণ করে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে এর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

> আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন

১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ও উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছে। নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দমন-পীড়ন, ধর-পাকড়, জেল-জুলুম, হত্যা, গুম, মিথ্যা মামলায় জড়িতকরণ, ভূমি বেদখল, স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ, সরকারি মদদে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, অনুপ্রবেশ, জুম্মদের সংখ্যালঘুকরণ, সাম্প্রদায়িক হামলা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, নারীর উপর সহিংসতা ইত্যাদি মানবতাবিরোধী ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ সরকার গত ২০০৯ সাল থেকে ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়েও বর্তমান সরকার পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ তো গ্রহণ করেইনি অধিকন্তু চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

তার অন্যতম উদাহরণ হলো, চুক্তি স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং চুক্তি মোতাবেক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে পাশ কাটিয়ে তথা পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পর্যালোচনা মূল্যায়ন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি মূল্যায়ন, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' গঠন করা এবং চুক্তি বিরোধী এই কমিটির মাধ্যমে পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫ ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে অপপ্রচার চালানো। অথচ পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৭টি ধারা হয় সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়িত অবস্থায়, নয়তো আংশিক বাস্তবায়িত করে অথর্ব অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে।

২০২৩ সালে গত ৯ মার্চ কুয়াকাটায় এবং ২০ আগষ্ট জাতীয় সংসদ ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির যথাক্রমে ৭ম ও ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হলেও এই দু'টি সভাসহ পূর্ববর্তী সভাগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের কোনো অগ্রগতি নেই। ফলে সরকারের অসহযোগিতা ও গড়িমসির কারণে বর্তমানে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিও অকার্যকর সংস্থায় পরিণত হতে বসেছে।

সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে নিজেদের ব্যর্থতা ধামাচাপা দিতে নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সকল স্তরের নেতাকর্মীসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জুম্ম জনগণকে 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত', 'চাঁদাবাজ' ইত্যাদি তকমা দিয়ে অপরাধীকরণ করছে। তারই অংশ হিসেবে জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত অধিকারকর্মী ও জনগণকে সুপরিকল্পিতভাবে অবৈধ গ্রেফতার, বিচার-বহির্ভূত হত্যা, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে আটক, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণ, ওয়ারেন্ট ছাড়া ঘরবাড়ি তল্লাশি ও ঘরবাড়ির জিনিষপত্র তছনছ, মারধর, হয়রানি ইত্যাদি ফ্যাসীবাদী ও মানবাধিকার বিরোধী কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

২০২৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যুদের দ্বারা ২৪০টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে এবং এসব ঘটনায় ১,৯৩৩ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়, ৬৪টি গ্রাম এক বা একাধিক বার সেনাবাহিনীর অভিযানের শিকার হয় এবং ৮৪টি বাড়ি ও পরিবারের সদস্যরা সেনা তল্লাশির মুখে পড়েছে।

(ক) প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

২০২৩ সালে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ১৩৫টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৬৪৩ জন মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ৩১ জনকে গ্রেফতার ও সাময়িক আটক, ২৪৫ জনকে মারধর, আহত ও

হয়রানি, মিথ্যা মামলার শিকার ৫৩ জন, ৬৪টি গ্রামে সামরিক অভিযান পরিচালনা, ৮৪টি বাড়ি ও পরিবারকে সেনা তল্লাশি, ৩১ পরিবারকে উচ্ছেদ ও উচ্ছেদের হুমকি, ৫টি নতুন ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

(খ) সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

২০২৩ সালে সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক ৫৭টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ১,০৫৫ জন ও ৩০টি গ্রামের অধিবাসী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ১৯ জনকে হত্যা, ১৭ জনকে মারধর, ২১ জনকে অপহরণ, ২২ জনকে আটক, ৬ জনকে আটক করার পর পুলিশের কাছে সোপর্দ, ১৯৫ বম ও মারমা পরিবারের প্রায় এক হাজার গ্রামবাসীদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ এবং ২৫টি গ্রামের অধিবাসীদের নানা ধরনের হয়রানি ও উচ্ছেদের হুমকি প্রদান ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

(গ) সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল

২০২৩ সালে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যু কর্তৃক ২৪টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ১৯টি পরিবার ও ২১০ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ৬ জনকে হত্যা এবং ১৮টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

(ঘ) যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

২০২৩ সালে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষ কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশুর উপর ২৪টি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ২৫ জন নারী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে একজনকে হত্যা, ১২ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণ, ৭ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা এবং ২ জন নারী ও শিশুকে অপহরণ ও পাচারের চেষ্টার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

> দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

বিশেষ প্রতিবেদন

কেএনএফ ও সেনাবাহিনীর চাপে ও নিপীড়নে চরম বিপদগ্রস্ত সাধারণ বম জনগণ

বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর একের পর এক হঠকারী ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং কেএনএফ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যেকার যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার জেরে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম আদিবাসী বম জনগোষ্ঠী বর্তমানে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শুরুতে সেনাবাহিনীর মদদে বম পার্টির সৃষ্টি হলেও, পরে অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়ে ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে বম পার্টির সম্পর্ক এবং বম পার্টি কর্তৃক জঙ্গিদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রমাণ পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিক চাপে বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনী বম পার্টির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এতে বম পার্টি যেমন সাধারণ বমদের তাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা, চাঁদা প্রদান, গবাদি পশু, খাদ্যসামগ্রী দিতে বাধ্য করে ও নানাভাবে হয়রানি করতে শুরু করে, তেমনি অপরদিকে সেনাবাহিনীর নানা হয়রানি, নিপীড়ন ও ভয়ভীতির কারণে বম জনগোষ্ঠী আজ অনিশ্চিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ২০২২ সালের শেষ দিকে শান্তিপ্রিয় ও সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনের অধিকারী বম জনগোষ্ঠীর অনেক গ্রামবাসী স্ব স্ব ঘরবাড়ি ও গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হতে থাকে। এতে প্রায় দুই হাজার বম নরনারী দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী ভারতের মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। অপরদিকে আরও কয়েক হাজার মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হয়ে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পার্বত্য চুক্তির সমর্থক বম জনগোষ্ঠীর এক অধিকার কর্মী বলেন, কেএনএফ বা কুকি-চিনদের সঠিক রাজনৈতিক চিন্তার অনুপস্থিতি ও অদূরদর্শী চিন্তা এবং ভুল পদক্ষেপের কারণে আজ বম জনগোষ্ঠী বিপদগ্রস্ত। যার ফলে আজকে সাধারণ বম জনগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে এবং আজ তারা অনেকটা নিরুপায় ও দুর্দশাগ্রস্ত। তারা কেএনএফ-এর কবল থেকে মুক্তি পেতে চায়।

তিনি আরও বলেন, একদিকে কেএনএফ-এর তান্ডব, অপরদিকে সেনাবাহিনী ও সরকারের প্রশাসনের সঙ্গে একপর্যায়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কারণে এ পর্যন্ত ১৩টি (তের) বম গ্রাম আজ জনশূন্যে পরিণত হয়েছে। এছাড়া আরো ১৫টি গ্রাম নিভু নিভু অবস্থায় রয়েছে, যেগুলির মধ্যে ইতোমধ্যে তিনভাগের দুইভাগ মানুষ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। কিছু সংখ্যক এখনও রয়ে গেছে মাত্র। পরিস্থিতি যদি আরও জটিল হয়ে যায় তাহলে ঐ ১৫টি গ্রামও হয়ত খালি হয়ে যাবে।

বম জনগোষ্ঠীর একাধিক সূত্র জানায়, বর্তমানে সাধারণ বম জনগণ যে অবস্থায় রয়েছে, বিশেষ করে মিজোরামে যারা আছে, লংত্লাই জেলায় যারা আছে, যারা শরণার্থী হিসেবে রয়েছে তারা যে ভালো অবস্থায় রয়েছে তা মোটেই নয়।

তারাও কোনোমতে বা মানবেতর অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রথমদিকে যারা প্রথম শরণার্থী হিসেবে মিজোরামে যান তখন কেএনএফ-এর নেতারা বম শরণার্থীদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, শরণার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তৈরি করিয়ে দেওয়া হবে, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। বিনামূল্যে খাবার ও শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এমন কথা বলা হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেকেই বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। বিগত কয়েক মাস আগেও চিকিৎসার অভাবে ফারবা-৩-এ ম্যালেরিয়া ও কলেরা অসুখে ৩-৪ জন মারা গেছে। তারপর মংবু ভিলেজ, বুংত্লাং ভিলেজ, ফাঠোয়ামপুই ভিলেজ ইত্যাদি যেসব এলাকাতে বম জনগোষ্ঠীর শরণার্থী আছে তারা ঠিকমত চিকিৎসা পাচ্ছে না। চিকিৎসা না পাওয়ার ফলে তারা এমনকি ম্যালেরিয়া হলেও মারা যাচ্ছে, ডায়রিয়া হলেও মারা যাচ্ছে। এ পর্যন্ত শরণার্থীদের মধ্যে শিশুসহ অন্তত ১৫/১৬ জন মারা গেছে।

সূত্রগুলো আরও জানায়, বর্তমানে বম জনগোষ্ঠীর এই শরণার্থীরা অত্যন্ত অমানবিক ও মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রথমদিকে শরণার্থীদের পরিবার প্রতি ২০ কেজি করে চাল দেওয়া হতো। বর্তমানে তাদেরকে সেই জায়গায় দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৫ কেজি চাল। যেখানে ২০ কেজি চাল দিয়ে এক পরিবারের একমাস চলে না, সেখানে মাত্র ৫ কেজি চাল দেওয়া মানে সেখানে পরিবারগুলোর কী দুরবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। নিজেরা যে উপার্জন বা উৎপাদনের জন্য কিছু করবে সেই বাস্তবতা ও সুযোগও নেই। কারণ শরণার্থীরা যে এলাকায় রয়েছে, সেগুলো এমনিতেই অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকা বা দুর্গম। ফলে সেখানে কোনোখানে উপার্জনের জন্য মজুরি খাটবে এমন বাস্তবতাও নেই। এদিকে শরণার্থীদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। কোনো স্কুলেই এই ছেলেমেয়েরা ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ তাদের বৈধ কোনো দলিল বা কাগজপত্র নেই।

জানা গেছে, ২০২২ সালের নভেম্বর থেকেই বম জনগোষ্ঠীর মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই শরণার্থী আসার তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বরের ১২ তারিখ। প্রথমদিকে মিজোরামের কর্তৃপক্ষ শরণার্থীদের কয়েক দফা পুশব্যাক করে। পরে ওয়াইএমএ (ইয়ং মিজো এসোসিয়েশন) এর দাবির প্রেক্ষিতে শরণার্থীদের গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে কাগজে কলমে শরণার্থীর সংখ্যা ১২০০ এর মত, কিন্তু এর বাইরেও ৭-৮ শ শরণার্থী রয়েছে। তাই বর্তমানে এই শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০০০ জন।

অপরদিকে বান্দরবানে থাকা বম জনগোষ্ঠীর একাধিক সূত্র জানায়, দেশে বম জনগোষ্ঠীর যারা রয়েছে তাদের অবস্থা শরণার্থীদের মত না হলেও বর্তমানে তাদের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়ে তাদের অনেকের অবস্থাও শরণার্থীদের মত হয়েছে। তাদের যারা মিজোরামে যেতে চায় না, বা যেতে পারে নাই, তারা হয়তো পুশব্যাক হয়ে বা নানা বাস্তবতার কারণে বান্দরবান সদরের কাছাকাছি যেসকল বম পাড়া রয়েছে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে বা মিজোরাম সীমান্তে রয়েছে তাদের অবস্থাও শরণার্থীদের থেকে কোনো অংশে ভালো নয়।

বান্দরবান সদরের আশেপাশে আট থেকে নয়টি বম পাড়া রয়েছে, সেখানে অনেকে আত্মীয়-স্বজনের ঘরে বা পরিচিত কারো ঘরের আশ্রয়ে রয়েছে। রুমা সদরের আশেপাশে যে বমপাড়া রয়েছে, সেখানেও অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে এবং রোয়াংছড়ি সদরের আশেপাশের বম পাড়াগুলোতে কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছে।

সূত্রগুলো জানায়, পরিস্থিতির অবনতি হলে আরও যে গ্রামগুলো শূন্য হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে, সেগুলো হলো- মুনোয়াম পাড়া, যে পাড়ার তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ ইতোমধ্যে অন্যত্র চলে গেছে। তারপর আর্থা পাড়া, বাসত্লাং পাড়া, হেপিহিল বা পুনর্বাসন পাড়া, রোনিন পাড়া বা ফিয়াংপুদুং পাড়া, ম্যুয়ালপি পাড়া, সুনসং পাড়া, রুমনা পাড়া, দার্জিলিং পাড়া, থাইখিয়াং পাড়া, রোয়াংছড়ির দুর্নিবার পাড়া, পানখিয়াং পাড়া, গিলগাল বা অবিচলিত পাড়া, জুরফরং পাড়া, রামথার পাড়া- এই ১৫ টি গ্রামের অবশিষ্ট জনগণও অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে।

অপরদিকে, যে গ্রামগুলো জনশূন্য হয়েছে, সেগুলো হলো- প্রথমে সাইজাম পাড়া, এরপর সিপ্পি পাড়া, এই দুই গ্রাম বান্দরবানের সীমান্তবর্তী রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়নে অবস্থিত। সেনাবাহিনীর কম্বিং অপারেশনের ফলে এই দুটি গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। এদের অনেকেই রোয়াংছড়ি পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, অনেকেই মিজোরামে চলে গেছে। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানের কারণে ১২০ পরিবার অধ্যুষিত পানখিয়াং পাড়াটাও জনশূন্য হয়। এরপর আর্থা পাড়া ও মুনোয়াম পাড়ার মাঝখানে বাসত্লাং পাড়া নামে যে গ্রামটি রয়েছে, সেটাও এখন জনশূন্য। অপরদিকে থানচিতে যেখানে সীমান্ত সড়ক করা হয়েছে, সেখানে প্রথমত বাকত্লাই পাড়া এবং পারাতা পাড়া, এরপর তাজিংডং পাড়ার পাশে শিমত্লাংপি পাড়া, তারপর তিন সীমানা এলাকা সংলগ্ন পাইনোয়াম পাড়া, লুংমোয়াল পাড়া, এরপর একেবারে তিন সিমানা বা মিজোরাম সীমান্তবর্তী থিংদলতে পাড়া, সিলৌপি পাড়া, চাইখিয়াং পাড়া, নিউ রুমনা পাড়া- এই সমস্ত গ্রামগুলো বর্তমানে সম্পূর্ণ জনশূন্য।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বম সম্প্রদায়ের একজন মুরুব্বি জানান, এসমস্ত গ্রামবাসীর অনেক ছেলেমেয়ে দেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। উদ্ভুত পরিস্থিতি এবং আর্থিক দুরবস্থার কারণে সেসব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও বর্তমানে বন্ধ হয়েছে। ফলে বম সম্প্রদায়ের যে তরুণ, শিশু রয়েছে সেই তরুণ বা নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। এভাবে একটা প্রজন্ম যদি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে গোটা বম জাতির জন্য ক্ষতিকর।

তিনি বলেন, বস্তুত কেএনএফ সৃষ্টি না হওয়ার আগে, বম জনগোষ্ঠী মোটামুটি একটা সুশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও নিজেদের উৎপাদন দিয়ে একটা বাঁচার ভিত্তি ছিল। বম জনগোষ্ঠীর প্রায় সবাই ফলমূলের বাগান চাষ করে থাকে, এতে তাদের উপার্জনও ভালো এবং তা দিয়ে পরিবারের ভরন-পোষণ পূরণ করা সম্ভব হয়। ফলমূল বাগানের পাশাপাশি তারা জুম, আদা-হলুদের চাষও করে থাকে। এছাড়া প্রায় পরিবারের নারীরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন কাপড়-চোপড় বুনে ও বিপনন করেও আয়-উপার্জন করে থাকে। বম সমাজে সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী অত্যন্ত কম।

তিনি আরও বলেন, উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে ইতোপূর্বে বম সমাজের মধ্যে যে একটা সামাজিক সংহতি ছিল সেটা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বম সমাজের মধ্যে মুরুব্বিদের নিয়ে যে বম সোস্যাল কাউন্সিল (বিএসসিবি), যুবদের নিয়ে যে ইয়াং বম এসোসিয়েশন (ওয়াইবিএ), ছাত্রদের নিয়ে যে বম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (বিএসএ) এবং মহিলাদের জন্য যে বম মহিলা দল (বিএনএম), এগুলির যে একটা সুশৃঙ্খল কাঠামো ছিল এবং সামাজিক একটা প্রভাব ছিল, কেএনএফের কারণে আজকে সেগুলো প্রায় ভেঙে গেছে বা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। কেএনএফ কর্তৃক বিভিন্ন গ্রামে ডিভিশন কমিটি করা হয়েছে, এখন সামাজিক কোনো সমস্যা বা বিষয় নিয়ে মীমাংসা করতে গেলেও কেএনএফরা হস্তক্ষেপ করে থাকে। ফলে সামাজিক যে একটা ব্যবস্থা ও সংহতি ছিল সেটা আজ মুখ থুবরে পড়ছে। এই অবস্থায় বম সোস্যাল কাউন্সিলও উদ্যোগ নিয়ে কোনো কাজ করতে পারছে না। ফলে এক ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

ওই বম মুরুব্বি আরও বলেন, এই অবস্থায় সেনাবাহিনীও বিশেষ করে রুমা উপজেলায় বমদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় না করার জন্য বিভিন্ন বাঙালি ও পাহাড়ি ব্যবসায়ীদেরকে চাপ দিচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। যেমন, সম্প্রতি একাধিকবার বম বাগানচাষীরা বাজারে কলা বিক্রি করতে নিয়ে গেছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কেউ কিনেনি, এমনকি দরাদরি করতেও আসেনি। অর্থনৈতিকভাবে বমদের পঙ্গু করার জন্য সেনাবাহিনী এটা করেছে। সাধারণ বমরা কেএনএফকে সহযোগিতা করে- এমন অজুহাত তুলে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য সেনাবাহিনী এটা করছে। তাদের ধারণা নাকি এই যে, সাধারণ বমদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করলে কেএনএফরা বেকায়দায় পড়বে। এতে হয়ত তারা সেনাবাহিনীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হবে।

খোঁজ নিয়ে আরও জানা গেছে, মুনলাই পাড়া, লাইরুনপি পাড়া, ইডেন পাড়া, ইডেন রোড পাড়া, জাইঅন পাড়া, হিপ্পি হিল পাড়া, আর্থা পাড়া, মুননোয়াম পাড়া, বাসত্লাং পাড়া ও বেথেল পাড়া- ইত্যাদি বম গ্রাম যেগুলো রুমা সদর এলাকার কাছাকাছি রয়েছে, যারা মূলত বাগানের উপর নির্ভরশীল, তাদের কৃষিপণ্য, উৎপাদিত যে ফলমূল, সেগুলো তারা বাজারজাত করতে পারছে না। গতবারের আমের মৌসুমেও অনেক ব্যবসায়ী বমদের কাছ থেকে আম কিনতে এলে, বাগান থেকে আম ছেঁড়ার পরও তারা ঐ আমগুলো নিয়ে যেতে পারে নাই সেনাবাহিনীর নিষেধের কারণে। এতে বম গ্রামবাসীরা ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই অবস্থায় বমদের কাছ থেকে কোনো কৃষিপণ্য কিনে নিয়ে যেতেও ভয় পাচ্ছে ব্যবসায়ী বা ফলের ব্যাপারীরা। ফলে শুধু রুমা এলাকায় নয়, অন্যান্য বম বাগানচাষীদের কাছ থেকেও কিনতে ভয় পাচ্ছে বা বিরত রয়েছে ব্যবসায়ীরা। বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় যেখানে বম রয়েছে, তাদের এলাকায়ও এর প্রভাব পড়েছে এবং তারাও নিজেদের পণ্য বিক্রিতে ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। অপরদিকে, পরিস্থিতির কারণে পর্যটকের আগমন অনেক কমে যাওয়ার ফলে বমদের হস্তশিল্প বা ঐতিহ্যবাহী কাপড়-চোপরের ব্যবসার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত মন্দাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হওয়ার পর প্রশাসনের কাছ থেকে কয়েকদিন কিছু সহযোগিতা বা ত্রাণ দেওয়া হলেও তৎপরবর্তীতে আর কারো কাছ থেকে তারা সহযোগিতা পায়নি বলে জানা যায়।

বম সম্প্রদায়ের সাবেক এক ছাত্রনেতা বলেন, বস্তুত বম সমাজের যারা শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ রয়েছে তারা কেউই কেএনএফকে সমর্থন করে না শুধু নয়, তারা ঘোর বিরোধী। তারা কোথাও প্রকাশ্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ না করলেও তারা কেএনএফের কর্মকান্ডের সমর্থন করেন না। যারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানাদির দায়িত্বে রয়েছেন বা ধর্মীয় গুরু রয়েছেন তারাও কেএনএফের কর্মকান্ডকে সমর্থন করতে পারেন না। ২০২২ সালের জুন বা জুলাই মাসে কেএনএফ'রা এক ধর্মীয় গুরু পালক বা পাস্তুরকে মারধর করে আহত করে। ওই পাস্তুরকে চিকিৎসাও নিতে হয়েছিল। এছাড়াও কুকি-চিনরা বিভিন্ন অভিযোগ এনে বিভিন্ন বম গ্রামের কার্বারিদেরকে শারীরিক নির্যাতন করে যাদের অনেককেই দীর্ঘ চিকিৎসা নিতে হয়েছে। এমন অবস্থায় চলতে থাকলে বম জনগণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিশেষ প্রতিবেদন

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৫ জুম্মকে মারধরের পর চিকিৎসা নিতে বাধা এবং নানা ষড়যন্ত্র ফাঁস

গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে ৫ জন বহিরাগত মুসলিম সেটেলার বাঙালি জুরাছড়ি সদরে অবস্থিত হিমায়ন চাকমার পৈত্রিক সম্পত্তি ০.২০ একর পরিমাণ জায়গাটি বেদখলের উদ্দেশ্যে জায়গাটির চারিদিকে খুঁটি পুঁতে দেয়। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর জায়গার মালিক সহ জুম্ম এলাকাবাসী সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। উভয়পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

বেদখলের চেষ্টাকারী সেটেলাররা হলো– (১) মোঃ সিরাজ (৩২), পিতা-অজ্ঞাত, পেশায় দিনমজুর ও খুচরা তৈল ব্যবসায়ী; (২) মোঃ সোহেল (৩০), পিতা-অজ্ঞাত, পেশায় করাট কল মিস্ত্রি; (৩) মিঠুন (২৭), চায়ের দোকানদার; (৪) মোঃ ফয়সাল (২৯), পিতা-অজ্ঞাত, পেশায় কাপড় দোকানদার ও (৫) নাম জানা যায়নি।

পরে নিকটবর্তী যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোশাররফ এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে এসে ৬ জুম্মকে ধরে নিয়ে যায়। আরও কিছক্ষণ পর বনযোগীছড়া সেনা জোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্নেল জুলকিফলী আরমান বিখ্যাত পিএসসি ঘটনাস্থলে আসেন এবং সেখান থেকে যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পে যান।

১৩ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর মদদে কতিপয় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদকারী ৫ জুম্মকে সেনাবাহিনী স্থানীয় সেনা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধর করে। গণমাধ্যমে প্রচার ও বিভিন্ন চাপে পরে ঐদিনই রাতে সেনাবাহিনী ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও এক সপ্তাহের অধিক সময় এখনো পর্যন্ত ভুক্তভোগী ওই ৫ ব্যক্তিকে জুরাছড়ি সদরস্থ পার্বত্য জেলা পরিষদ রেস্ট হাউজে গৃহবন্দী অবস্থায় থাকতে বাধ্য করেছে বলে জানা গেছে। এমনকি মারধরের কারণে ব্যাপক জখম হওয়ায় ভুক্তভোগীরা স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইলে এবং চিকিৎসার জন্য রাঙ্গামাটি শহরে যেতে চাইলেও সেনাবাহিনী অনুমতি দেয়নি এবং বাধা দেয় বলে জানা গেছে।

শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনী একদিকে উল্টো মারধরের শিকার হওয়া জুম্মদের কিছুদিন আগে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্ত কর্তৃক এক শিক্ষিকার স্কুটি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার সঙ্গে যেমন জড়িত করার চেষ্টা করছে, অপরদিকে ভুক্তভোগীরা যেহেতু আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের কর্মী, তাই চিকিৎসার জন্য রাঙ্গামাটি গেলে পথে জনসংহতি সমিতির সদস্যরা গুলি করবে এমন ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক যুক্তি দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করে।

ভুক্তভোগী ৫ জুম্ম হলেন- (১) পল্লব দেওয়ান (৪৮), পিতা-অমৃত লাল দেওয়ান, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, জুরাছড়ি থানা আওয়ামী লীগ ও ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বার; (২) সজীব চাকমা (৩২), পিতা-বিপ্লব চাকমা, গ্রাম-বরইতুলি, ৩নং ওয়ার্ড, ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়ন এবং তিনি সাধারণ সম্পাদক, জুরাছড়ি থানা যুবলীগ; (৩) অনুপম চাকমা (৫৫), পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম-ধামাই পাড়া, তিনি ২নং বনযোগী ছড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি; (৪) মিন্টু চাকমা (৩২), পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম-কুসুমছড়ি, ৯নং ওয়ার্ড, ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়ন, তিনি ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও (৫) রন্টু চাকমা (৩৮), পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম-বরইতুলি, তিনি জুরাছড়ি থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

উল্লেখ্য যে, গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোশাররফ এর নেতৃত্বে ১৫-২০ জন সেনা সদস্য সেটেলার বাঙলি কর্তৃক ভূমি বেদখলে বাধাদানকারী জুম্মদের মধ্য থেকে ৬ জনকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে আওয়ামীলীগের সঙ্গে যুক্ত উক্ত ৫ জন এবং আরেকজন নিরীহ গ্রামবাসী। ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া ৬ জনের মধ্যে গ্রামবাসী একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়, অপরদিকে উক্ত ৫ জনকে ব্যাপক মারধর করে সেনা সদস্যরা।

জানা গেছে, যক্ষাবাজার ক্যাম্পের সেনাবাহিনী মারধরের সময় উক্ত ৫ জনকে ইতোপূর্বে দুর্বৃত্ত কর্তৃক এক স্কুল শিক্ষিকার স্কুটি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত বলে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করে। উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে রাতে শিউলী চাকমা নামে এক শিক্ষিকার স্কুটিটি আগুনে পুড়ে দেয় অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা।

জানা গেছে, স্বীকারোক্তিতে সেনাবাহিনী নিজেরাই এই বানোয়াট যুক্তি বা ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য করে যে, বিগত ৭

জানুয়ারি ২০২৪ জাতীয় নির্বাচনের সময় ভোট কেন্দ্রে দায়িত্বরত শিক্ষিকা শিউলী চাকমা উক্ত ৫ জনকে জালভোট দিতে বাধা প্রদান করে, সেই ক্ষোভ থেকেই তারা স্কুটিটি পুড়িয়ে দিয়েছে। অথচ প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, শিউলী চাকমার সেদিন কোনো ভোট কেন্দ্রে দায়িত্ব ছিল না। বস্তুত অন্যায়ভাবে উক্ত ৫ জনকে মারধরের ঘটনাকে জায়েজ ও ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য এবং শিক্ষিকার সঙ্গে ভুক্তভোগী ৫ জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির করার উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনী এই ধরনের একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা চালায়।

ভুক্তভোগীর সূত্র জানায়, নানা চাপে পরে সেনাবাহিনী রাত ৯টার দিকে আটককৃত ও মারধরের শিকার ৫ জনকে ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেয়। এসময় ক্যাম্পের সেনাবাহিনীর একটি দল নিজেরা এসে ওই ৫ জনকে উপজেলাস্থ পার্বত্য জেলা পরিষদ রেস্ট হাউজে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়। এসময় সেনা সদস্যরা ওই ৫ জনকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে যায় যে, তারা যেন সেই জেলা পরিষদ রেস্ট হাউজের বাইরে কোথাও না যায়। বস্তুত সেনাবাহিনী ক্যাম্প থেকে ওই পাঁচ জনকে ছেড়ে দিলেও রেস্ট হাউজে বন্দি করে রাখে।

ঘটনার পরদিন (১৪ জানুয়ারি) সকালে বনযোগীছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তোষ চাকমার সহযোগিতা নিয়ে ওই ৫ জন চিকিৎসার জন্য রাঙ্গামাটি শহরে যাবেন এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং একটি স্পিড বোটও ভাড়া করা হয়। বিষয়টি খবর পেলে বনযোগীছড়া সেনা জোনের সেনাবাহিনী ঐ স্পীড বোটের চালককে রাঙ্গামাটি বা কোথাও যেতে পারবে না বলে নির্দেশ দেয়।

একই দিন পরে, যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য ঝুড়িতে কিছু ফল, যেমন আপেল, আঙুর নিয়ে রেস্ট হাউজে ভুক্তভোগী ৫ জনকে দেখতে আসে। ফল ও কিছু ঔষধপত্র দিয়ে সেনা সদস্যরা আবার চলে যায়। এই সময় আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা ভুক্তভোগীদের জুরাছড়ি উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করাতে চাইলেও সেনাবাহিনী অনুমতি দেয়নি। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারাই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

জানা গেছে, মারধরের শিকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জখম হয়েছে আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সজীব চাকমা ও আওয়ামীলীগের ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক মিন্টু চাকমা। ভুক্তভোগীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইলেও যেতে পারেনি সেনাবাহিনীর বাধার কারণে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, সেনাবাহিনীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষ থেকে পরিচালিত তদন্তে দেখা যায় যে, ভোটের দিন শিক্ষিকা শিউলি চাকমা কোনো কেন্দ্রে দায়িত্বে ছিলেন না। সুতরাং ঐদিন ভোটদান নিয়ে শিউলী চাকমার সঙ্গে মারধরের শিকার ৫ ব্যক্তির কোনো দ্বন্দ্ব এবং তা নিয়ে পরস্পরের প্রতি কোনো ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং ক্ষুব্ধ হয়ে ওই ৫ ব্যক্তি কর্তৃক শিউলী চাকমার গাড়ি পোড়ানোর সেনাবাহিনীর ব্যাখ্যাও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। বস্তুত সেনাবাহিনী তাদের দ্বারা জুম্মদের ভূমি বেদখলে উস্কানি ও প্রতিবাদী ৫ জুম্মকে অন্যায়ভাবে মারধরের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই উক্ত মিথ্যা ও বানোয়াট ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে বলে জানা যায়।

একটি গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায়, রাঙ্গামাটিতে বিশেষত জুরাছড়িতে বিগত জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সেনাবাহিনী ও আওয়ামীলীগের মধ্যে একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনীর ধারণা, নির্বাচন নিয়ে আওয়ামীলীগ ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটা গোপন সমঝোতা হয়েছে, তাই জনসংহতি সমিতি তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে। একারণে জুরাছড়ির সেনাবাহিনী আওয়ামীলীগের উপর ক্ষুব্ধ।

এদিকে গোয়েন্দা ও ভুক্তভোগীদের সূত্রে আরো জানা যায়, সেনা ক্যাম্পে ৫ জুম্মকে যখন মারধর করা হচ্ছিল, তখন সেখানে ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোশাররফ সকলের সামনে এও বলেন যে, 'প্রবর্তক চাকমা ও জ্ঞানেন্দু চাকমাকেও ফোন করে খবর দাও। তাদেরকেও আমরা মারধর করি। তারা কিসের আওয়ামীলীগ করে! কিসের ক্ষমতা দেখায় এখানে!' ঐ ঘটনার পর প্রবর্তক চাকমা ও জ্ঞানেন্দু চাকমা জুরাছড়ি যাননি বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, প্রবর্তক চাকমা জুরাছড়ির আওয়ামীলীগ নেতা ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য এবং জ্ঞানেন্দু চাকমাও জুরাছড়ি আওয়ামীলীগের একজন নেতা ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য।

সূত্রগুলো আরও জানায়, মারধরের শিকার ৫ জনকে রাঙ্গামাটি যেতে বাধা দানের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী এই মিথ্যা ও বানোয়াট অজুহাত দেখিয়েছে যে, তারা নাকি খবর পেয়েছে, জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমিত চাকমা রাঙ্গামাটি যাওয়ার পথে চিলেকধাক এলাকায় ১৫ জন লোক নিয়োগ করেছে। ওই লোকরা ভুক্তভোগী ৫ জুম্মকে গুলি করার জন্য অপেক্ষা করছে। কাজেই ওই ৫ জনের নিরাপত্তার স্বার্থেই সেনাবাহিনী তাদেরকে রাঙ্গামাটি যেতে বাধা দিয়েছে।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বনযোগীছড়া সেনা জোনের জোনকমান্ডার লেঃ কর্নেল জুলফিকলী আরমান বিখ্যাত

পিএসসি, মেজর আউয়াল ও যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোশাররফ এর বিভিন্ন সময়ের ভাঙনমূলক ও এলাকার জনগণের স্বার্থ বিরোধী ভূমিকার কারণে জুরাছড়ির বিভিন্ন স্তরের জনগণ তাদের ব্যাপারে হতাশ ও ক্ষুব্ধ। জনগণের বিশ্বাস, এইসব সেনা কর্মকর্তাদের কারণেই সাম্প্রতিক সময়ে জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর উপর্যুপরি হয়রানিমূলক সেনা টহল, বাড়ি তল্লাশি, জনগণকে মারধর, জুম্মদের ভূমি বেদখল করে তৎস্থলে বহিরাগত সেটেলার বসতিদানের ষড়যন্ত্র, ভাগ করো ও শাসন করো কৌশল অবলম্বন করে জনগণকে হয়রানি ও নিপীড়নকরণ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জানা গেছে, জনগণের পক্ষ থেকে নানাভাবে উক্ত সেনা কর্মকর্তাদের অন্যত্র বদলি করানোর জন্য চেষ্টার কথা শুনলে জোন কমান্ডার কর্তৃক এই মর্মে মন্তব্য করতে শোনা গেছে যে, 'যেখানেই বদলি হয়ে যাই না কেন সিও হিসেবেই থাকবো, কিন্তু বদলি হয়ে যাওয়ার আগে একটা কিছু করে যাবো।' জনগণের অনেকেই জোন কমান্ডারের এই কথাকে হুমকি মনে করছেন এবং তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এঘটনার মধ্যে দিয়ে আরেকবার প্রমাণিত হলো যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কোন শক্তি নেই রোধ করার। আওয়ামীলীগ কর্মীরা প্রায়ই প্রচার করেন যে, আওয়ামীলীগ করলে সেনা নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের কর্মীদেরকে সেনাবাহিনী কিছু করার সাহস রাখে না। কিন্তু এবারের ঘটনায় আওয়ামীলীগের কর্মীদের সেই দম্ভ চূর্ণ হয়েছে।

> '...সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।'
>
> – ***মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা,*** *(২৫ অক্টোবর ১৯৭২ সংবিধান বিলের উপর আলোচনা)*

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে একতরফা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ব্যাপক অনিয়ম

গত ৭ জানুয়ারি ২০২৪ সারাদেশের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলা আসনেও অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন আসনেই সরকারি দল আওয়ামীলীগের প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচনে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও আদিবাসী জুম্মদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতির অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এবং দেশের বিরোধী দল বিএনপির নির্বাচন বর্জনের কারণে প্রায় একতরফা, নিষ্প্রাণ ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় একতরফা নির্বাচন সত্ত্বেও সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও নির্বাচনী প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক অনিয়ম ও জাল ভোটের খবর পাওয়া গেছে। বস্তুত ব্যাপক সাধারণ জুম্ম জনগণের মধ্যে এই নির্বাচনে ভোট দেয়া নিয়ে কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়নি।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন। কিন্তু নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা না থাকায় পরে তিনি তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

জানা গেছে, তিন পার্বত্য জেলার জেলা ও উপজেলা সদর এলাকায় কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি দেখা গেলেও অধিকাংশ কেন্দ্রে বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে ভোটারের উপস্থিতি ছিল নিতান্তই কম। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি আসনের ২৭টি কেন্দ্রে কোনো ভোটার ভোট দিতে আসেননি। অনেক কেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি ২০%-৩০% ভাগেরও নীচে। কিন্তু সরকারি দল ও নির্বাচনী প্রশাসন ভোটারের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখাতে শেষ পর্যন্ত ব্যাপক অনিয়ম ও জালভোটের আশ্রয় নেয় এবং শেষ পর্যন্ত ভোটের ফলাফল দেখায় প্রকৃত ভোট থেকে কয়েকগুণ। এছাড়াও একাধিক এলাকায় ভোটের আগের দিন নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সাধারণ জনগণকে নৌকায় ভোট দিতে নির্দেশ দেয়া হয় বলে জানা যায়। বিশেষ করে, রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, রাজস্থলী, বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক টহল অভিযানের সময় সাধারণ জুম্ম জনগণকে নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে বলা হয় বলে জানা যায়।

জানা গেছে, ২৬ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন না হওয়া, ১৫ বছর ধরে একনাগাড়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার ক্ষমতায় থেকেও চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা, উপরন্তু সরকার ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িত করা, জেলে প্রেরণ, আটক, হত্যা ও চুক্তিপক্ষের জনগণকে নিপীড়ন, নির্যাতন, তল্লাশি, হুমকি, উচ্ছেদ ইত্যাদিসহ মানবাধিকার পরিস্থিতি অবনতির কারণে জনসংহতি সমিতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

রাঙ্গামাটি:

এবার ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সরকারি দল আওয়ামীলীগের প্রার্থী ছিলেন দীপংকর তালুকদার, যিনি নৌকা প্রতীকে ২,৭১,৩৭৩ ভোটে পেয়ে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হন। অপরদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট এর অমর কুমার দে ছরি প্রতীকে পেয়েছেন ৪,৮৬৫ ভোট এবং তৃণমূল বিএনপি'র মোঃ মিজানুর রহমান সোনালী আঁশ প্রতীকে পেয়েছেন ২,৬৯৩ ভোট।

রাঙ্গামাটি আসনের ২১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮টি কেন্দ্রে কোনো ভোটার ভোট দিতে আসেননি। রাঙ্গামাটি আসনের বাঘাইছড়ি উপজেলার ৫টি কেন্দ্রে এবং কাউখালী উপজেলার ৩টি কেন্দ্রে কোনো ভোট পড়েনি বলে নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাঘাইছড়ির এক অধিকারকর্মী জানান, বাঘাইছড়িতে প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার দেখানো হচ্ছে প্রায় ৬০%। প্রকৃতপক্ষে প্রতি কেন্দ্রে গড়ে ভোটার উপস্থিত হয়েছে ১০%-১১% এর মত। কাজেই বাকীগুলো সব জাল ভোট। সিজকমুখ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, সরকারি দলের প্রাপ্ত ভোট ঘোষণা করা হয়েছে ২,৪৮০। কিন্তু প্রকৃত ভোটারের উপস্থিতি বড়জোর ৭০-৮০ জন হতে পারে।

সারোয়াতলী এলাকার অধিবাসী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জুম্ম তরুণ জানান, কেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি একদম কম।

শতকরা হিসেবে বড়জোর ১০%। কিন্তু সরকারি দলের কর্মীরা পোলিং এজেন্টদের দিয়ে প্রতিজনে ২০০/৩০০ জাল ভোট দিয়েছে।

জুরাছড়ি উপজেলার ফকিরাছড়ি সেনা ক্যাম্পের জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসার এর নেতৃত্বে ১২ জনের একটি টহল দল ৩নং মৈদং ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের ভুয়াতুলীছড়া গ্রামে গিয়ে সাধারণ জনগণকে ভোট কেন্দ্রে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। তারপরও তেমন কোনো লোকজন ভোট কেন্দ্রে যায়নি। বিশেষত বগাহালী, ভুয়াতুলীছড়া, বরকলক, ফরেস্ট ভিলেজার, ফকিরাছড়ি, সোহেল পাড়া ইত্যাদি কেন্দ্রগুলোতে ভোটারের উপস্থিতি ছিল একেবারে কম। এমন অবস্থা দেখে পরে সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টরা নিজেরাই জালভোট মেরে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

আরও জানা গেছে, বগাখালী কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার তার নিজের পকেট থেকে ৫ হাজার টাকা পুলিশের এসআই লাল নুন লি বমকে ঘুষ দিয়ে তারা জাল ভোট দিয়ে ১৪০টি ভোট কাস্টিং দেখিয়েছে। অথচ সেখানে সাধারণ জনগণের উপস্থিতি ছিল একেবারে কম, সর্বমোট ২০/২৫ জনের মত। অন্যদিকে বরকলক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাও একই। সেখানে মানুষের উপস্থিত ছিল ১২০-১৫০ মত। কিন্তু সেখানে ভোট কাস্টিং দেখানো হয়েছে ১,০৪৮টি। ফরেস্ট ভিলেজার কেন্দ্রের অবস্থাও একই। সেখানে ভোটারের উপস্থিতি ছিল ৮০/৯০ জনের মত, কিন্তু ভোট কাস্টিং দেখানো হয়েছে ৪৫৭টি। মোট কথা হচ্ছে সব কেন্দ্রেই জাল ভোট দেওয়া হয়েছে কম পক্ষে ৫০%। সদর এলাকাগুলোতে আরো বেশি করে জাল ভোট দেওয়া হয়েছে। বনযোগী ছড়া, ধামাই পাড়া, চকপতিঘাট, ডেবাছড়া, ভুবণজয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঘিলাতুলি, শিলছড়ি ইত্যাদি কেন্দ্রগুলোতেও ব্যাপক জাল ভোট দেওয়া হয়েছে।

বরকল উপজেলার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অধিকার কর্মী বলেন, বরকলেও সরকারি দল কর্তৃক ব্যাপক জাল ভোট দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি ছিল নগণ্য, ২০% এর অধিক নয়। অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্ট না থাকায় বা থাকলেও তারা নিশ্চুপ থাকায় বরুণাছড়ি কেন্দ্র, ধামাইছড়া কেন্দ্র, মাইচছড়ি কেন্দ্র, ভূষণছয়া কেন্দ্র, এরাবুনিয়া কেন্দ্র, বড় কুড়াদিয়া কেন্দ্র, নিস্কেন্দ্রা কেন্দ্র ইত্যাদি কেন্দ্রে ব্যাপক জাল ভোট প্রদান করা হয়েছে। বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের প্রায় কেন্দ্রে সরকারি দলের কর্মীরা দলবল নিয়ে জাল ভোট দিয়েছে।

বরকলের জগন্নাথ ছড়া ভোট কেন্দ্রের এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বেলা ২.৩০টার দিকে বরকল সদর থেকে স্থানীয় আওয়ামীলীগের অংছা ছিং এর নেতৃত্বে ১৪/১৫ জনের একদল কর্মী জগন্নাথ ছড়া ভোট কেন্দ্রে গিয়ে জালভোট দিতে চাইলে এলাকার মুরুব্বি ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বাধার মুখে পড়ে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হন।

কাপ্তাই উপজেলায় নির্বাচনের ৫/৬ দিন আগে থেকে সরকারি দলের নেতাকর্মীরা স্থানীয় মুরুব্বি ও এলাকাবাসীদের সঙ্গে দফায় দফায় সভা করে জানিয়ে আসছিল যে, ভোট কেন্দ্রে এসে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে। যে পরিবার ভোট দিতে না যায় তাহলে সেই পরিবারকে সরকারের সেবা থেকে বঞ্চিত করা হবে, যেমন- বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, ভিজিডি চাউল, সরকারি ঘর, সন্তানের জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় সনদপত্র প্রদান ইত্যাদি সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে। এমনকি হেডম্যানের স্থায়ী বাসিন্দা সনদসহ ভূমি বিষয়ক যাবতীয় সেবা থেকে বঞ্চিত করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়।

খাগড়াছড়িঃ

২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি আসনে সরকারি দল আওয়ামীলীগের প্রার্থী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা নৌকা প্রতীকে ২,২০,৮১৬ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির প্রার্থী মিথিলা রোয়াজা লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ১০,৯৩৮ ভোট। রাঙ্গামাটি আসনের মত এই আসনেও প্রকৃত ভোটারের উপস্থিতি কম এবং সরকারি দলের কর্মী ও প্রশাসনের লোকদের কর্তৃক ব্যাপক জাল ভোট দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

একদিকে অব্যাহতভাবে সরকারের স্বৈরাচারী কায়দায় জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরকারি দলের লোকদের অবাধ দুর্নীতির কারণে, অপরদিকে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের ভোট বর্জন ও হুমকি-ধামকির মুখে সাধারণ জুম্ম ভোটাররা ভোট দানে বিরত থাকেন বলে জানা গেছে। বিশেষ করে উপজেলার কেন্দ্রে কেন্দ্রে আওয়ামীলীগের কর্মীদের উপস্থিতি ও আনাগোনা দেখা গেলেও সাধারণ ভোটাররা অত্যন্ত সামান্য অংশই ভোট দিয়েছেন।

জানা গেছে, এই আসনের ১৯৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৯টি কেন্দ্রই ছিল ভোটশূন্য। পানছড়ি, দীঘিনালা ও লক্ষীছড়ি উপজেলার অন্তর্গত এসব ভোটশূন্য কেন্দ্রগুলো জুম্ম অধ্যুষিত। পানছড়ি উপজেলার ২৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ভোট পড়েনি ১১টিতে,

দীঘিনালা উপজেলার ২৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩টিকে এবং লক্ষীছড়ি উপজেলার ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫টিতে।

দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন কেন্দ্রের জুম্মদের বাড়িতে গিয়ে আওয়ামীলীগ ও সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের কর্তৃক গ্রামবাসীদের ভোট প্রদানের জন্য চাপ দিতে দেখা গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবুও যেখানে সাধারণ ভোটারদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম সেখানে আওয়ামীলীগ কর্মীদের জোরপূর্বক ব্যাপক হারে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খাগাছড়িতে নৌকার পক্ষে ব্যাপকভাবে জাল ভোট দেওয়ার একটি নজির হল- দীঘিনালার ছোট মেরুং বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র। সেখানে ভোটারের চেয়ে ভোট বেশি কাস্টিং হতে দেখা গেছে। খোদ আওয়ামীলীগের প্রার্থী নিজেও প্রকৃত ভোটার সংখ্যার চেয়েও বেশি ভোট পান। যা প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরিত ভোট গণনার বিবরণীতে দেখা গেছে। সেই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ১,৭৮৪। কিন্তু ভোট শেষে গণনায় আপত্তিকৃত ভোট সহ প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা মোট ২,৪৯২, অপরদিকে আওয়ামীলীগের প্রার্থী একাই পেয়েছেন ২,২৯৫, যা প্রকৃত ভোটের চেয়ে বেশি।

বান্দরবান:

এবার ৩০০ পার্বত্য বান্দরান আসনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী বীর বাহাদুর উশৈচিং নৌকা প্রতীকে বিজয়ী ঘোষিত হয়েছেন ১,৭২,২৪৩ ভোট পেয়ে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির প্রার্থী লাঙ্গল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১০,০৪৩।

জানা গেছে, বান্দরবানের বিভিন্ন উপজেলায়ও বিশেষত সাধারণ জুম্ম ভোটারদের মধ্যে ভোট নিয়ে তেমন কোন উৎসাহ ছিল না। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জুম্ম অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম। দিনের শেষ দিকে বেলা ২টা থেকে ৪ টার মধ্যে আওয়ামীকর্মীরা কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রবেশ করে ব্যাপক জাল ভোট প্রদান করে ভোটের হার বাড়িয়ে দেয় বলে একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে।

> ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে এই সংবিধান তাদের কি কাজে লাগবে।’
>
> *—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

সংবাদ প্রবাহ

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

জুরাছড়ি ও বিলাইছড়িতে সেনা টহল, জনমনে আতঙ্ক

গত ২ নভেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন লুলংছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে ওয়ারেন্ট অফিসার রবিউলের নেতৃত্বে ১৬ জনের এক সেনাদল জুরাছড়ি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের পুজু আদাম এলাকায় টহল অভিযান পরিচালনা করে।

একই দিন (২ নভেম্বর) সকাল ৮ টায় বিলাইছড়ি উপজেলার মেরাংছড়া সেনা ক্যাম্পের (৩২ বীর) সুবেদার করিম এর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনাদল এবং জুরাছড়ির শীলছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক এক সুবেদারের নেতৃত্বে বটতলীর (শীলবাচ্যে মৌন) অভিমুখে একত্রিত হয়ে টহল অভিযান চালায়।

সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযানের ফলে এলাকায় চরম আতংকের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উদ্দেশ্যমূলকভাবে জুম্ম গ্রামগুলোতে ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে।

বিলাইছড়িতে পরপর সেনা টহল, জনগণকে হয়রানি ও হুমকি

গত ৫ নভেম্বর ২০২৩ বিলাইছড়ি উপজেলার দিঘলছড়ি সেনা জোন (৩২ বীর) হতে ক্যাপ্টেন আরিফ এর নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনাদল ও একই উপজেলার তক্তানালা সেনা ক্যাম্প হতে ওয়ারেন্ট অফিসার সাইফুল এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের আলীখ্যং নতুন পাড়ায় একত্রিত হয়। উক্ত পাড়ায় 'চন্দ্র চাকমার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী থাকে, কালেক্টর গ্রুপ থাকে এবং পাড়ার লোকেরা সবাই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত' এমন অজুহাতে সেনা সদস্যরা পাড়ার লোকদের নানা ধরনের হুমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। পরে ৪/৫ ঘন্টা অবস্থানের পর বিকেলে সেখান থেকে চলে যায়।

গত ৭ নভেম্বর ২০২৩ সকাল ৮ টায় ৩২ বীর ফারুয়া ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন শিহাবের নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি সেনাদল আর তক্তানালা সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসার সাইফুলের নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনাদল সর্বমোট ৩৫ জনের সেনাদল বিলাইছড়ি উপজেলার ২নং ফারুয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের রয়াপাড়া ছড়াতে একত্রিত হয়। উক্ত সেনাদলটি পাড়ার লোকদের সন্ত্রাসীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এবং সবাই সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ করে এবং নানা ধরনের হয়রানিমূলক প্রশ্ন করে।

পরে ১। বাবলু চাকমা (৪২) পিতা-ধন্যা চাকমা, গ্রাম রয়াপাড়া ছড়া ২। অমর ধন তঞ্চঙ্গ্যা (৪৭) পিতা-মুক্তা চান তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- ঐ। ৩। খুশী লাল তঞ্চঙ্গ্যা(৪৫) পিতা- রতন তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- ঐ। ৪। সিদ্দিক্যা তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫) পিতা- বার্মা তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- ঐ। ৫। উজ্জল তঞ্চঙ্গ্যা (৩২), পিতা- সুন্দজ্যা তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- ঐ। ৬। বিজয় তঞ্চঙ্গ্যা (৩০), পিতা- জন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- ঐ। ৭। লক্ষী ধন তঞ্চঙ্গ্যা (৪৩) পিতা- হরিশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- ঐ। ৮। আঙ্গা ধন তঞ্চঙ্গ্যা (৪৪), পিতা- হাঙ্গারা তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- ঐ এই ৮ জন এলাকার দোকানদারকে তোমাদের দোকানে সবসময় সন্ত্রাসী আনাগোনা করে কিন্তু তোমরা আমাদেরকে খবর দাওনা বলে নানা ধরনের হয়রানিমূলক কথা বলে। পরবর্তীতে আমাদের কাছে খবর না দিলে সকলকে বেঁধে নিয়ে যাব এমনকি তোমাদের মারলে আমাদের কিছু হবে না বলে হুমকি প্রদান করে সেনা সদস্যরা।

৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে বিলাইছড়ির তক্তানালা সেনা ক্যাম্প হতে ওয়ারেন্ট অফিসার সাইফুল এর নেতৃত্বে ১৫ জনের একদল সেনাসদস্য ফারুয়া ইউনিয়নের শুকনা ছড়ায় টহল অভিযানে যায়। সেখানে গিয়ে ১। জীবন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৩৮), পিতা- গুলঙ্যা তঞ্চঙ্গ্যা, ২। ঘারা ধন তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫), পিতা- ঐ উভয়ের বাড়ি ঘেরাও করে। এই সময় ঘারা ধন তঞ্চঙ্গ্যাকে বন্দুক তাক করে গুলি করবে বলে হুমকি দেয় এবং 'এখানে সন্ত্রাসী কোথায়?' বলে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। এমন সময় বাড়ির অদূরে একটি মোটর সাইকেল দেখতে পেলে মোটর সাইকেলটি কার বলে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং বাইকটি সন্ত্রাসীর বলে জোরপূর্বক স্বীকার করানোর চেষ্টা করে।

এমতাবস্থায় ৩২ বীর ফারুয়া ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন শিহাবের নেতৃত্বে ১৫ জনের আরো একটি সেনাদল শুকনা ছড়ায় পৌঁছে। তখন দুই গ্রুপে মিলে মোটর সাইকেলটি জঙ্গলে নিয়ে ঝোঁপ ও লতা পাতা দিয়ে ছবি তুলে নেয় এবং পুনরায় রাস্তায় নিয়ে এসেও ছবি তুলে। এরপর গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে

সেনাসদস্যরা বলে যে, মোটর সাইকেলটি সন্ত্রাসীর বলতে হবে এবং না বললে তাদের সকলকে পরবর্তীতে বেঁধে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দেয় এবং মোটর সাইকেলটি সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিয়ে যায়।

মোটর সাইকেলটির মালিক বরুন তঞ্চঙ্গ্যা (৩২), পিতা- মৃত ললিত চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম-তক্তানালা বলে জানা যায়। তিনি একজন সাধারণ গ্রামবাসী।

গত ৯ নভেম্বর ২০২৩ সকাল ১০টার সময় জুরাছড়ি উপজেলার ফকিরা ছড়া সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনাদল তাগলক ছড়া মোনে টহল অভিযানে যায়। সেখানে 'সন্ত্রাসী কোথায়?' বলে এলাকাবাসীদের নানা ধরনের হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে ও হুমকি দেয়। পরে প্রায় ৩ঘন্টা অবস্থান করে ক্যাম্পে ফিরে যায় বলে জানা যায়।

রাঙ্গামাটিতে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক এক যুবককে গ্রেপ্তার ও অপপ্রচার

গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি পৌরসভা এলাকার কে কে রায় সড়ক থেকে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক শান্তিময় চাকমা ওরফে শ্যামল নামে একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত শান্তিময় চাকমা বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতলীর বাসিন্দা। তিনি একজন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি ও বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত। তাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় এবং নেশাগ্রস্ত একজন লোক। আরেকটি সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তারকৃত শান্তিময় চাকমা ইউপিডিএফের অস্ত্রসংগ্রহকারীর সহযোগী।

অন্যদিকে, নিরাপত্তা বাহিনীর বরাত দিয়ে সেনা মদদ-পুষ্ট বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকায় শান্তিময় চাকমাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপের কোম্পানী কমান্ডার বলে অপপ্রচার চালানো হয়। জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা এই অভিযোগকে সর্ববৈ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেন।

নান্যাচরে সেনা টহল অভিযান

গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩, নান্যাচর সেনা জোন হতে ২০/২৫ জনের একটি সেনা টহল দল নান্যাচরের বড়পুল পাড়ায় টহল অভিযান চালায়। এরপর সেনা সদস্যরা বড়পুল পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান করে। পরে সেখান থেকে সেনা টহল দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ১০/১২ জনের একটি সেনা টহল দল বড়পুল পাড়ার ভিতরে ভদ্রমা ছড়া গ্রামে টহল অভিযান চালায়।

এ সময় সেনা সদস্যরা গ্রামবাসীদেরকে নানা হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে। এতে জনমণে ব্যাপক ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এরপর সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ে এসে সারারাত অবস্থান করে পরদিন ১৪ নভেম্বর ২০২৩, সকাল ৯:০০ টার দিকে নান্যাচর সেনা জোনে চলে যায়।

রাঙ্গামাটি সদর এলাকায় সেনা টহল অভিযান

গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের মরিচ্যাবিল সেনা ক্যাম্প হতে সুবেদার মোঃ শাহাদাত-এর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনা দল বালুখালী ইউনিয়নের গরগজ্যাছড়ি এলাকায় টহল অভিযান চালায়। এরপর দুপুর ১২ টায় তল্লিতল্লা সহ বালুখালী ইউনিয়নের গরগজ্যাছড়ি পুরাতন সরকারি বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান করে।

অপরদিকে একই দিন বরকল উপজেলার সুবলং সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদার এর নেতৃত্বে বিকাল ৩ টার দিকে ২০/২৫ জনের একটি সেনা টহল দল রাঙ্গামাটি বালুখালী ইউনিয়ন পরিষদের ভাঙা বিল্ডিং এলাকায় টহল অভিযান চালায়। এরপর ভাঙা বিল্ডিংয়ে এসে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করে সেনা সদস্যরা চলে যায়।

বাঘাইছড়িতে যৌথ বাহিনী ও প্রশাসন কর্মকর্তাদের অভিযানে ২জন জুম্মর নিজস্ব কাঠ জব্দের অভিযোগ

গত ১৫ নভেম্বর ২০২৩, সকাল ১১ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলা সদর থেকে আসা যৌথ বাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতলী ইউনিয়য়ের দক্ষিণ খাগড়াছড়ি গ্রামে ২জন জুম্মর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য রাখা কাঠ ও মন্দিরের কাঠ জব্দ করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া জুম্মদের স্থাপিত দুটি করাত কলও বন্ধ করে দিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা হল- উমচরণ চাকমা (৭০), পীং- মৃত সুবল চন্দ্র চাকমা, ঠিকানা- উত্তর সারোয়াতলী এবং পুলিন চাকমা (৫৫),পীং- তেজেন্দ্র চাকমা, ঠিকানা- ঐ ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল ১১ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি থেকে যৌথ বাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বাঘাইছড়ি সারোয়াতলী গ্রামে হানা দিয়ে জুম্মদের স্থাপিত দুটি করাত কল ও কয়েক শত লগ সেগুন, গামার ও বিভিন্ন জাতের কাঠ জব্দ করে নিয়ে যায়। এই কাঠগুলো ২ জন জুম্ম ও মন্দিরের নিজস্ব ব্যবহারের কাঠ।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম বন বিভাগের এসিএফ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙ্গামাটির ডিজিএফআই প্রতিনিধি, ৩৭ বিজিবি, রাজনগর জোনের এডি মোঃ হাফিজুর রহমান, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি'র সদস্যদের উপস্থিতিতে এই জব্দের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

রাঙ্গামাটির বালুখালীতে সেনাবাহিনীর ঝটিকা টহল অভিযান, হয়রানি

গত ১৮ নভেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের মরিচ্যাবিল সেনা ক্যাম্প হতে সুবেদার মো: শাহাদাত হোসেনের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সেনাদল ট্রলার যোগে দুপুর পৌনে একটার সময় বালুখালী ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বসন্ত নিচু পাড়ায় টহল অভিযান চালায়। তারা ৮নং ওয়ার্ডের মেম্বার নান্টু চাকমার বাড়িতে চড়াও হয়। নান্টু চাকমা ও তার পরিবার সেসময় বাড়িতে ছিলেন না।

এরপর সেনা সদস্যরা বাড়ির আশেপাশে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর ক্যাম্পে ফিরে যাবার সময় একই পাড়ার পলাশ চাকমার চায়ের দোকানে উঠে। এসময় সেখানে কয়েকজন গ্রামবাসীকে 'সন্ত্রাসী দেখেছো কিনা? এখানে সন্ত্রাসী এসেছে কিনা? মিথ্যা কথা বলবে না, নাহলে সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাব' ইত্যাদি হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসা করে সেনা সদস্যরা।

পরে দুপুর ৩ টার দিকে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার সময় পলাশ চাকমা (২৮), পীং- নীল মোহন চাকমা ও একই পাড়ার সুজনময় চাকমা (৩০), পীং-পূর্ণ মোহন চাকমাকে সেনা সদস্যরা ছবি তুলে নিয়ে যায়।

বিলাইছড়ির ফারুয়ায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান

গত ১৮ নভেম্বর ২০২৩ সকাল ১১ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের ফারুয়া আর্মি ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন সিয়াফ-এর নেতৃত্বে ১৫ জনের একদল সেনাসদস্য ও তক্তানালা সেনা ক্যাম্প হতে ১০ জনের আরেকদল সেনাসদস্য মিলে রোয়াপাতাছড়া ও তক্তালানা উত্তর পাড়ায় যৌথ অভিযান চালায়।

এসময় সেনা সদস্যরা রোয়াপাতাছড়া এলাকায় পৌঁছার পর গ্রামবাসীদের কাছে মুনি তঞ্চঙ্গ্যা, কমল চাকমা ও মিতুন চাকমা নামে তিনজন গ্রামবাসীর নাম জিজ্ঞেস করেন। এই তিন জনের নাম ধরে সেনাসদস্যরা নানান তথ্য জিজ্ঞাসাবাদ করেন স্থানীয় লোকজনদের কাছে।

এরপর সেনাসদস্যরা সেখান থেকে চলে যান তক্তানালা উত্তর পাড়ায়। সেখানে গিয়ে অনিল কুমার তঞ্চঙ্গ্যার (শান্ত) বাড়িতে যায়। বাড়িতে মানুষ না থাকায় আশেপাশের লোকদের কাছে অনিল তঞ্চঙ্গ্যা সম্পর্কে নানান কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে।

রাঙ্গামাটির জীবতলীতে সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার অন্তর্গত জীবতলী ইউনিয়নে কাপ্তাই সেনা জোন ও গবঘোনা সেনা ক্যাম্প হতে বালুখালী ও মগবান ইউনিয়নে যৌথ টহল অভিযান চালানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ নভেম্বর ২০২৩, বিকাল ৩ টার সময় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নের কাপ্তাই সেনা জোন ও গবঘোনা সেনা ক্যাম্প হতে যৌথভাবে সুবেদার মো: সাইফুল এর নেতৃত্বে ১৮/২০ জনের একটি সেনাদল মগবান ইউনিয়নের দোগেইয়া পাড়ার জগনাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তল্লিতল্লাসহ এসে অবস্থান করে। সেখান থেকে এসময় তারা রাত্রে কাপ্তাই হ্রদ ও আশেপাশের এলাকায় টহল অভিযানসহ এলাকাবাসীদের বিভিন্ন হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ ও হুমকি প্রদান করে। পরদিন সকাল সাড়ে ৯ টায় সেখান থেকে হেঁটে ক্যাম্পে চলে যায় বলে জানা যায়।

অন্যদিকে গত ২০ নভেম্বর ২০২৩, সকাল নয়টার দিকে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের পাংখোয়া পাড়া সেনা ক্যাম্প হতে ৯ জনের একটি সেনা টহল দল লক্ষন্যা পাড়ায় এসে গ্রামের ঘরবাড়ি ও পরিবারের লোক সংখ্যার হিসাব নিয়ে চলে যায়।

রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি ও মানিকছড়িতে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান

রাঙ্গামাটি জেলার অন্তর্গত বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ও সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক টহল অভিযান পরিচালনা করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২০ নভেম্বর ২০২৩ বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২ বীর দীঘলছড়ি সেনা জোনের অধীন শুক্কোরছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সেনাদল পার্শ্ববর্তী ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের চঙরাছড়ি গ্রামে হয়রানিমূলক টহল অভিযান চালায়। সেখানে গিয়ে সেনা সদস্যরা স্থানীয় সঞ্চয় চাকমা, পীং-তরেন্দ্র চাকমা, বাবুল চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, সুজন প্রিয় চাকমা, পীং-বিন্দু লাল চাকমা, বম্বু চাকমা, পীং-

রাঙাপ্যান্ট চাকমার ছবি দেখিয়ে কেউ চিনেন কিনা জানতে চায় এবং হয়রানিমূলক নানা জিজ্ঞাসাবাদ চালায়।

এরপর সঞ্চয় চাকমার নামের সঙ্গে মিল থাকায় সঞ্চয় তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক ব্যক্তিকে ধরে স্থানীয় পাড়াকেন্দ্র স্কুলের ভেতর নিয়ে গিয়ে সেনা সদস্যরা নানারকম হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তিনি সঞ্চয় চাকমা হিসেবে স্বীকার করার জন্য চাপ দেয়। পরে ভুক্তভোগী আইডি কার্ড দেখালে পিতা ও মাতার নাম মিল না থাকায় সেনা সদস্যরা তাকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়। ঠিক কী কারণে উক্ত ৪ ব্যক্তিকে সেনা সদস্যরা খোঁজ করছে এলাকাবাসীরা কিছুই জানেন না।

এরপর গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মানিকছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে সকাল ৯টায় তল্লিতল্পা সহ জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনাদল সাপছড়ি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ঢেপ্পোছড়ি এলাকায় টহল অভিযান চালায়। এরপর সেনা সদস্যরা ডেপ্পোছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়। সেখানে থেকে বের হয়ে আশেপাশে এলাকায় টহল অভিযান চালানোর পর সেনা সদস্যরা আবার উক্ত বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়। পরে সেখান থেকে চলে যায়।

রাঙ্গামাটির মগবান ও বালুখালীতে সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক তল্লাশি ও টহল অভিযান

গত ২৭ নভেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের মানিকছড়ি সেনা ক্যাম্প ও রাঙ্গামাটি সদর সেনা জোন হতে জনৈক ক্যাপ্টেন এর নেতৃত্বে দুপুর ১২টার দিকে আনুমানিক ৩০/৩৫ জনের একটি সেনাদল দেপ্পোছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান করে।

পরে সেখান থেকে বের হয়ে নভাঙা গ্রামে যায়। সেখানে গিয়ে সেনা সদস্যরা আশাময় চাকমা (৩৮), পীং-নির্মল কান্তি চাকমা, লক্ষ্মীময় চাকমা (৩৭), পীং-তিলক চন্দ্র চাকমা, জ্যোতি ময় চাকমা (৫০), পীং-তিলক চন্দ্র চাকমা, জ্ঞান ময় চাকমা (৪০), পীং-তিলক চন্দ্র চাকমা, নিরুময় চাকমা (৪২), পীং-চাভরবো চাকমা'র বাড়িতে কোনো কিছু না বলে হয়রানিমূলক তল্লাশী চালায়।

উক্ত তল্লাশী অভিযান শেষ হলে সেনাদলটি পাশের দেপ্পোছড়ি গ্রামে হানা দেয়। সেখানে সুনীল চাকমা (৫০), পীং-সৌভাগ্য কুমার চাকমা, বীর চাকমা (৪০), পীং-অজ্ঞাত ও আরাঙা চাকমা (৪৩), পীং-প্রিয় লাল চাকমা এবং মরংছড়ি গ্রামের তাজল চাকমা, পীং-সুমতি রঞ্জন চাকমার বাড়িতে একইভাবে তল্লাশি চালায়।

অপরদিকে গত ২৬ নভেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের পাংখোয়া পাড়া সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদার এর নেতৃত্বে ১৬ জনের একটি সেনাদল তল্লিতল্পা সহ বিকাল ৩ টার দিকে লক্ষন্যা পাড়ার গিয়ে আশে পাশের জায়গায় টহল অভিযান চালিয়ে ভিজাহিজিং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে রাত্রে অবস্থান করে। পরদিন ২৭ নভেম্বর ২০২৩, বিকাল ৩টার দিকে ক্যাম্পে ফিরে যায়।

জুরাছড়িতে সেনা অভিযান, এলাকায় আতঙ্ক

গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলাধীন বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন লুলাংছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে ওয়ারেন্ট অফিসার রবিউল এর নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সেনাদল ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের পজুআদাম এলাকায় গিয়ে টহল অভিযান চালায়।

একই দিন একই জোনের অধীনে ফকিরাছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে ওয়ারেন্ট অফিসার আনোয়ারের নেতৃত্বে আরও ২০/২২ জনের একটি সেনাদল ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কান্ডেবছড়া নামক এলাকায় টহল অভিযান চালায়। একই দিন, বনযোগীছড়া সেনা জোন হতে জনৈক ক্যাপ্টেন এর নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি সেনাদল ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের আমতুলি নামক এলাকায় টহল অভিযান চালায়। সেনাবাহিনীর উপর্যুপরি এমন টহল অভিযানে এলাকার জনমনে ব্যাপক ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয় বলে এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়।

দীঘিনালার জারুলছড়িতে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান, হয়রানি

গত ২৯ নভেম্বর ২০২৩ রাতে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন ৫ নং বাবুছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের জারুলছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক কমান্ডারের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি সেনাদল বাবুছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের জারুলছড়ি মাছ্যছড়া (দজর পাড়া) এলাকায় ঝটিকা টহল অভিযান চালায়।

এসময় ওই পাড়ার বাসিন্দা কার্বাজ্যে চাকমা'র (২৫) বাড়িতে জনৈক অফিসার ভেতরে প্রবেশ করে এবং উক্ত অফিসার নানা রকম হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেখানে সেনাসদস্যরা কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর সেখান থেকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর রাত ১০.৩০ মিনিটে একই পাড়ার বুদ্ধমনি চাকমা'র (৫৫) বাড়িতে সেনা সদস্যরা হানা দেয়। বুদ্ধমনি চাকমারা তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছিলেন। ঘরের দরজা জোরে

জোরে ধাক্কা দিয়ে বুদ্ধমনি চাকমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে তাকেও নানা রকম হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তাকে বড়ইতুলী পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে সেনাসদস্যরা তাকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

লংগদুতে বিজিবি কর্তৃক জুম্মর ফলজ বাগান কর্তন

গত ৩০ নভেম্বর ২০২৩ বিকাল ৩ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় ৩৭ বিজিবি, রাজনগর ব্যাটালিয়নের ২০/২৫ জনের একদল বিজিবি সদস্য ৩টি গাড়িতে করে এসে কোনো কিছু না বলে গুলশাখালী ইউনিয়নের এক জুম্ম আদিবাসী গ্রামবাসীর আম ও লিচুর মিশ্র ফলজ বাগান কেটে দেয়। ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম স্নেহ কুমার চাকমা, পীং- রনজিত চাকমা, গ্রাম- হাজাপাড়া, ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়ন, লংগদু উপজেলা।

জানা যায়, স্নেহ কুমার চাকমার ঐ জায়গাটিতে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে এক সময় বিজিবি, রাজনগর জোনের ৭ নম্বর চেক পোস্ট ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরে চেক পোস্টটি তুলে নেওয়া হলে দীর্ঘ বছর ধরে জায়গাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পরে থাকে। তখন উক্ত জায়গাটিতে স্নেহ কুমার চাকমা বিগত ৫/৬ বছর আগে আর্থিক ব্যয় ও কায়িক পরিশ্রম করে প্রায় এক একর পরিমাণ জায়গায় এই মিশ্র ফলজ বাগান সৃষ্টি করে। বর্তমানে উক্ত বাগানে রোপণকৃত আম ও লিচু গাছগুলো সম্পূর্ণ কেটে দিয়ে সেখানে 'বিজিবি ক্যাম্পের জন্য নির্ধারিত জায়গা' লিখে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিলাইছড়িতে ডিজিএফআই কর্তৃক ৬ জন জুম্মকে মারধর

গত ৩০ নভেম্বর ২০২৩ বিকাল ৫টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা সদর বাজারে ডিজিএফআই সদস্য মোহাম্মদ সাখাওয়াত কর্তৃক বিনা কারণে ৬ জুম্ম ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল ড্রাইভারকে মারধর করে।

মারধরের শিকার ব্যক্তিরা হলেন– ১. স্বাধীন চাকমা, পীং- জোগাড় চাকমা, গ্রাম- দীঘলছড়ি, ২. আদর বাবু চাকমা, পীং- বালুক্কে চাকমা, গ্রাম- ডেবা মাধা, ৩. প্রিয় চাকমা, পীং- কামিনী রঞ্জন চাকমা, গ্রাম- ধপ্পেচর, ৪. প্রশান্ত চাকমা, পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- ধপ্পেচর, ৫. কাঞ্চন তঞ্চঙ্গ্যা, পীং- বাবন তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- দীঘলছড়ি, ৬. নোহেল চাকমা, পীং-মরচ চাকমা, গ্রাম- ধপ্পেচর। তারা সবাই ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেল চালক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঐ সময় উক্ত মারধরের শিকার ব্যক্তিরা যাত্রী ভাড়ার জন্য বিলাইছড়ি সদর বাজারে অপেক্ষা করছিলেন এবং মোটর সাইকেলের উপর বসে নানাবিধ বিষয় নিয়ে গল্প করছিলেন। এমন সময় ডিজিএফআই সদস্য মোহাম্মদ সাখাওয়াত কোনো কথাবার্তা ছাড়াই তাদের উপর চড়াও হয় এবং বেধরক মারধর করতে থাকেন।

রাইখালীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়ি ঘেরাও, তল্লাশি

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি ও বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র তছনছ করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঐ দিন সন্ধ্যা ৬:০০ টার দিকে কাপ্তাই সেনা জোনের ৫৬ বেঙ্গলের অধীন রাইখালী ইউনিয়নের নারানগিরি ১নং পাড়া সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার মোঃ আব্দুল কুদ্দুস-এর নেতৃত্বে ১৬/১৭ জনের একদল সেনাসদস্য ২নং রাইখালী ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের জগনাছড়ি পাড়ায় যায়। সেখানে গিয়ে সেনা সদস্যরা ঐ পাড়ার অংপ্রু মারমা (৪৩), পীং-মৃত মংহ্লাপ্রু মারমার বাড়ি ঘেরাও করে রাখে এবং ঘরের ভেতর ঢুকে ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। এই সময় অংপ্রু মারমা বাড়িতে ছিলেন না। অংপ্রু মারমাকে না পেয়ে সেনাসদস্যরা তার পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও হুমকি দেয়। পরে তার মাকে জোর করে ছবি তুলে নিয়ে যায় সেনাসদস্যরা।

পানছড়িতে চুক্তির বর্ষপূর্তিতে সেনাবাহিনীর ফায়ারিং, এক বৃদ্ধ গুলিবিদ্ধ

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সুচেন্দ্র পাড়ায় (কালানাল) পার্বত্য চুক্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সেনাবাহিনীর ফায়ারিংকালে বাত্যা চাকমা (৮০) নামে এক বৃদ্ধ গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয়রা জানান, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পার্বত্য চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঐ দিন সেনাবাহিনীর পানছড়ি সাব জোনের উদ্যোগে বাত্যা চাকমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী যৌথখামার এলাকায় ফায়ারিং স্পট বসানো হয়। এ সময় বাত্যা চাকমা তার নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেনা সদস্যদের ফায়ারিং চলাকালে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় হঠাৎ সেনাদের

ছোঁড়া গুলি বাত্যা চাকমার বাড়ির চালের ঢেউটিন ভেদ করে তার ডান পায়ের হাঁটুর উপরে বিদ্ধ হয়। পরে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে পানছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে সেখান থেকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়।

আলিকদমে বন বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা ম্রো জনগোষ্ঠীর লোকজন নিপীড়নের শিকার

বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার কুরুকপাতা ইউনিয়নের মাতামূহুরী রিজার্ভ এলাকায় বসবাসরত ম্রো জনগোষ্ঠীর উপর বন বিভাগের কর্মকর্তাদের চাঁদাবাজি, বাড়িঘর-দোকানপাট ভাংচুর ও হয়রানি চালানোর খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ আলিকদম উপজেলার ৩নং কুরুকপাতা ইউনিয়নের কচুছড়া পাড়ার মেননিক ম্রো এর দোকান কোনো কারণ ছাড়াই ভাঙচুর করে বন বিভাগের কর্মীরা। একইদিন একই ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কাইথক ম্রো পাড়ার ৫টি পরিবারের বাড়িও ভাঙচুর করে বন বিভাগের কর্মীরা। এছাড়া, ঐদিন একই ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের ছোটবেটি এলাকার রেংরুই ম্রো পীং-কর্জং ম্রো এর দোকানও ভাঙচুর করা হয়।

অপরদিকে, গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৩, ৩নং কুরুকপাতা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের মাতামূহুরী রিজার্ভ এলাকার জানালী পাড়াতে ফট্টই ম্রো নামে একজনের ঘর ভেঙে দেয় বন বিভাগের কর্মীরা। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক থেকে তাকে সেই ঘরটি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিল।

তাছাড়া, গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ আলিকদম উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের খেদদিং পাড়াতে গিয়ে বন বিভাগের কর্মীরা ৬-৭টি ম্রো পরিবারের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করে। ঐদিনই নতুন ঘর তোলার চাঁদা হিসেবে রেংয়ং ম্রো নামে একজনের কাছ থেকে ৭,০০০ টাকা নিয়ে নেয় বন বিভাগের কর্মীরা।

জুরাছড়িতে সেনা অভিযান

গত ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া জোনের অধীন লুলাংছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ পিরোজ এর নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনাদল রান্নার সরঞ্জামসহ বিকাল আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময় ১৩৩নং জুরাছড়ি মৌজার ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের ললিত কার্বারির উঠানে অবস্থান এবং আশেপাশের এলাকায় টহল অভিযান চালায়।

রাঙ্গামাটির বালুখালী ও জীবতলীতে সেনা অভিযান, বাড়ি তল্লাশি

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ও জীবতলী ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক টহল অভিযান, তালা ভেঙ্গে বাড়ি তল্লাশি ও বাড়ির ভেতরের আসবাবপত্র তছনছ করে আইডি কার্ড নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ বরকল উপজেলাধীন সুবলং সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ১৮ জনের একটি সেনা টহল দল বেলা ১১টার সময় ট্রলার যোগে রাঙ্গামাটির বালুখালী ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের নিকটবর্তী (ভাঙ্গা বিল্ডিং)-এ এসে ৩/৪ ঘন্টা অবস্থানের পর বিকালের দিকে ক্যাম্পে ফিরে যায়।

পরের দিন ১০ ডিসেম্বর ২০২৩, সকাল ১১:৩০ টার সময়ে আবার সুবলং সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ২২ জনের একটি সেনা টহল দল ঐ একই স্থানে (ভাঙা বিল্ডিং)-এ এসে অবস্থান করে। পরে সেখান থেকে ১০/১২ জনের একটি সেনাদল কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় টহল অভিযান চালিয়ে বিকাল তিনটার দিকে ক্যাম্পে ফিরে যায়।

একই দিনে মরিচ্যাবিল সেনা ক্যাম্প ও জীবতলী ইউনিয়নের গবঘোনা ক্যাম্প হতে যৌথভাবে জনৈক ক্যাপ্টেন ও সুবেদারের নেতৃত্বে ৩৫/৪০ জনের একটি সেনাবাহিনীর টহল দল সকাল ৯টার সময়ে বালুখালী ইউনিয়নের বালুখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান করে।

অন্যদিকে, সকাল ৯ টার সময়ে বালুখালী ইউনিয়নের পাংখোয়া পাড়া সেনা ক্যাম্প হতে সুবেদার মোঃ পারভেজের নেতৃত্বে ১১ জনের একটি সেনা টহল দল দুত্তাং পাড়ার জয়পুর শাখা বন বিহারের আসে। সেখান থেকে গ্রাম কার্বারি জীবন্তরকে আসার খবর পাঠায়। জীবন্তর কার্বারি সেখানে পৌঁছার পর তার কাছে সেনাসদস্যরা ট্রাক্টরের মালিক কে জানতে চায়। উল্লেখ্য, সেখানে দুলিয়া চাকমা ও কিরণ ময় চাকমা নামে দুইজন মাস খানেক আগে থেকে ট্রাক্টর দিয়ে ধান্য জমির মাটি পরিষ্কার ও কেটে সমান করছিলেন।

পরে, সেনা টহল দলটি সেখান থেকে বাদল ছড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। যাওয়ার পথে দুত্তাং পাড়ার বাসিন্দা কিরণ ময় চাকমার তালা বন্ধ বাড়িটি দেখে আশা পূর্ণ চাকমা নামে ঐ পাড়ার একজনকে জিজ্ঞেস করে বাড়িটি তালা বন্ধ কেন? সঙ্গে

সঙ্গে তালাটি ভেঙে সেনাসদস্যরা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে বাড়ির আসবাবপত্র ও বইপত্র তছনছ করে দেয় এবং কিরণ ময় চাকমার আইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

আরো জানা যায়, ক্যাম্পের নিকটবর্তী স্থানে ১২৮ নং বসন্ত মৌজার হেডম্যান শিয়াল জল পাংখোয়ার একটি কলা বাগান রয়েছে। ক্যাম্পের সেনারা মালিককে না জানিয়ে এবং টাকা না দিয়ে ইচ্ছামত কলাবাগানের কলাগুলি কেটে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে সেনারা হুমকি দেয়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়িতে গিয়ে গ্রামবাসীদের খোঁজ

গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলাধীন বনযোগীছড়া জোনের অধীন শিলছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ তোহিদ এর নেতৃত্বে ৩নং মৈদং ইউনিয়নের পানছড়ি মুখ গ্রামে ৫ জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে এবং তাদের নিজ বসত বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ ও ভীতির সৃষ্টি হয়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক যাদের খোঁজ করা হয়েছে তারা হল- ১. চঞ্চল কুমার চাকমা (৫০), পীং-মৃত বিঝুমনি চাকমা, ২. দয়াময় চাকমা লাম্বা (৫৫), পীং-মৃত ব্রজমোহন চাকমা, ৩. সুনীল জীবন চাকমা (৪০), পীং-মৃত সুরক্ষর চাকমা, ৪. লক্ষ্মী কুমার চাকমা (৫৫), পীং-মৃত কালা চোখ্যা চাকমা ও ৫. চিন্তা মুনি চাকমা, পীং- অজ্ঞাত।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনীর অভিযান, বাড়ি তল্লাশি, হুমকি

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩, সকাল ৯ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার বিলাইছড়ি সেনা জোনের আওতাধীন মেরাংছড়া ক্যাম্প হতে সুবেদার করিমের নেতৃত্বে ২৫/২৬ জনের একটি সেনাদল ২ নং কেঙরাছড়ি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের নারাইছড়ি গ্রামে টহল অভিযান চালায়। সেসময় তারা ৩ নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির আসবাবপত্র তছনছ করে দেয়। এছাড়াও, সন্ত্রাসীরা কোথায় থাকে, কখন আসে ইত্যাদি হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নানাভাবে ভয় দেখিয়ে ও হুমকি দিয়ে এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

তল্লাশির শিকার গ্রামবাসীরা হলেন- ১. দয়া লাল চাকমা (৬০), পীং- রূপধন চাকমা, ২. নাকশ চাকমা (৫৫), পীং- হজক পেদা চাকমা, ৩. রবিধন চাকমা (৫২), পীং- অজ্ঞাত। তারা সবাই নারাইছড়ি গ্রামের গ্রামবাসী।

জানা যায়, এসময় সেনাসদস্যরা গ্রামবাসীদের এই বলে হুমকি দেন যে, যদি জেএসএস প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট দেন তারা তাহলে এলাকায় কিছু করবে না। আর যদি তারা জেএসএসকে ভোট দেয় তাহলে এলাকায় কেউ থাকতে পারবে না বলে হুমকি দেয় সেনাসদস্যরা। এ নিয়ে এলাকাবাসীদের মনে আতঙ্ক ও ভয় সৃষ্টি হয়। এরপর নারাইছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সারাদিন অবস্থান করে দুপুরের খাবার খাওয়ার পর বিকাল ৪ টার দিকে ক্যাম্পে ফিরে যায় সেনাসদস্যরা।

জুরাছড়িতে ব্যাপক সেনা অভিযান, বাড়ি তল্লাশি

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় সেনাবাহিনী কর্তৃক মৈদং ইউনিয়নে ব্যাপক সেনা অভিযান এবং অভিযানের সময় অন্তত ২ গ্রামবাসীর বাড়ি তল্লাশি ও জিনিসপত্র তছনছ করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা গেছে, গত ১৩ ডিসেম্বর জুরাছড়ি উপজেলাধীন বনযোগীছড়া জোনের অধীন শিলছড়ি ও ফকিরাছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক লেফটেন্যান্ট ও নায়েক সুবেদার তোহিদ এর নেতৃত্বে ১৮ জনের একটি সেনা টহলদল প্রথমে হাজাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়।

পরদিন (১৪ ডিসেম্বর) সকাল ৯.৪৫ ঘটিকার সময় ঐ সেনাদলটি শরৎ কুমার চাকমা, পীং-মৃত সতীশ চন্দ্র চাকমা'র বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এরপর দুপুর ২:৩০ ঘটিকার সময় ৩নং মৈদং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বসন্ত চাকমা, পীং-মৃত মরত্তো চাকমা'র বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় তার বাড়ির আসবাবপত্র তছনছ ও তার ব্যবসায়িক খাতা-পত্র ও তার নিজস্ব ব্যাংকের চেক বই ছিড়ে ফেলে দেয় বলে জানা যায়। পরে সেনাসদস্যরা ঐ গ্রামের দোকানগুলিতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়।

এছাড়াও, সেনা সদস্যরা রাস্তাঘাটে গ্রামবাসীদেরকে থামিয়ে 'তোমরা রাস্তাঘাট উন্নয়ন হতে দাও না কেন? সন্ত্রাসীরা আসলে আমাদেরকে কেন খবর দাও না? সন্ত্রাসী কোথায়?' ইত্যাদি হয়রানিমূলক প্রশ্ন করে এবং নানারকম ভাবে গ্রামবাসীদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে।

রাঙ্গামাটির জীবতলীতে সেনা টহল অভিযান

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার গবঘোনা সেনা ক্যাম্প ও কাপ্তাই সেনা জোন হতে যৌথভাবে ওয়ারেন্ট

অফিসার মোঃ সাইফুলের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জনের একটি সেনা টহল দল বিকাল ৪:৩০ টার সময় গানবোট যোগে জীবতলী ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের চথাইপ্রু মারমার দোকানের নিকটবর্তী ক্লিনিকে এসে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে ১২/১৫ জনের একটি টহল দল ক্লিনিকের আশেপাশে জায়গায় ও হ্রদে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে তাদের অবস্থানে এসে রাত যাপন করে। পরে ভোর ৫টার দিকে ১৫/২০ জনের একটি সেনা টহল দল ক্যাম্প থেকে আসলে অপর দলটি সকাল ৯:৩০ ঘটিকার সময় ক্যাম্পে চলে যায় বলে জানা যায়।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান, হয়রানি, জনমনে আতঙ্ক

রাঙ্গামাটির সদর উপজেলার বালুখালী, জীবতলী ও মগবান ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক পরপর দুইদিন হয়রানিমূলক টহল অভিযান চালায়। এসময় সেনাসদস্যরা এলাকাবাসীদেরকে নানারকম হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে ও হুমকি দেয়। এতে এলাকাবাসীদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

জানা যায়, গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের মরিচ্যাবিল সেনা ক্যাম্প হতে সুবেদার শাহাদাৎ ও হাবিলদার লোকমান নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জনের একটি সেনাদল বিকাল ৩ ঘটিকার সময় বালুখালী ইউনিয়নস্থ খারিক্ষ্যং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে আনুমানিক ৪ ঘটিকায় হাবিলদার লোকমান এর নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একটি সেনা টহল দল প্রথমে বাদলছড়ি গ্রামে যেতে চাইলেও, সেদিকে না গিয়ে সরাসরি ট্রলার যোগে কাইন্দ্যা ব্রিজের দোকানে ৫:৩০ ঘটিকার সময় পৌঁছে।

ব্রিজের দোকানের রাস্তায় ও আশেপাশে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর হাবিলদার লোকমান লিটন চাকমার দোকানে এসে বসে। সেসময় সঞ্চয় চাকমা (প্রাক্তন মেম্বার) লিটন চাকমার দোকানে আগে থেকে অবস্থান করছিল। জনৈক হাবিলদার তখন দুইজনের কাছ থেকে 'সন্ত্রাসী এই মাসে কাইন্দ্যায় এসেছে কিনা? কতজন এসেছে? তাদের ড্রেস কী রকম? চাঁদা কত করে দিতে হয়?' ইত্যাদি হয়রানিমূলক প্রশ্ন করে। পরে সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার সময় খারিক্ষ্যং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান করে এবং সেখানে রাত্রি যাপন করে পরের দিন ২২ ডিসেম্বর সকাল ৮ ঘটিকায় ক্যাম্পে চলে যায়।

অপরদিকে, গত ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ মগবান ইউনিয়নের গবঘোনা সেনা ক্যাম্প হতে সুবেদার সাইফুল এর নেতৃত্বে ১৫/১৬ জনের একটি সেনা টহল দল সকাল ৯:৩০ ঘটিকার সময় জীবতলী ইউনিয়নের ধনপাতা রুছাই অং মারমার দোকানে এসে পৌঁছে। সেখানে পৌঁছামাত্রই কাউকে কিছু না বলে দোকানে বসে থাকা ব্যক্তিদের জোরপূর্বক ছবি তুলে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ক্যাম্পে যাওয়ার সময় অগইয়া ছড়ি মারমা পাড়ায় পৌঁছলে পান্টু মারমা (৩১), পীং-রাজচন্দ্র মারমা ও আথোয়াই মারমা (৪০), পীং-দায্যা মারমার বাড়ি ও বাড়ির আশেপাশে জায়গায় অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বিকাল ২ টার দিকে ক্যাম্পে ফিরে যায়।

তাছাড়া, একই দিন (২২ ডিসেম্বর) রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নের এস ব্যান্ড সেনা ক্যাম্প হতে রাত ৮ ঘটিকায় সময়ে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সেনা দল জীবতলী ইউনিয়নের জেতবন বৌদ্ধ বিহারে আসে এবং সেখানে অনেকক্ষণ অবস্থানের পর রাত দশটার দিকে ক্যাম্পে চলে যায়। অপরদিকে জীবতলী সেনা ক্যাম্প হতে ১৫/২০ জনের একটি টহল দল জীবতলী ইউনিয়নের ভাঙা ব্রিজ গোড়া নামক স্থানে এসে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ক্যাম্পে ফিরে যায়।

জুরাছড়িতে সেনা কমান্ডার কর্তৃক ২০ পরিবারের জন্য জায়গা দিতে কার্বারীদের নির্দেশ

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া জোনের অধীন লুলাংছড়ি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার জোর করে ২ জন হেডম্যান ও ৯ জন কার্বারীকে ক্যাম্পে ডেকে এক সভা করার খবর পাওয়া গেছে। সভায় ক্যাম্প কমান্ডার রুপান কার্বারীকে ২০ জন সেটেলার বাঙালিকে জায়গা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেন। তবে কার্বারীরা কমান্ডারের নির্দেশ অবৈধ বলে তা মানতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সভায় উপস্থিত দুইজন হেডম্যান যথাক্রমে- ১. মায়া নন্দ চাকমা, ১৪৩ নং কুসুমছড়ি মৌজা ও আনন্দ মিত্র চাকমা, ১৪৭ নং লুলাংছড়ি মৌজা। অপরদিকে, উপস্থিত ৯ জন কার্বারী যথাক্রমে- ১. জ্ঞানশ্বর চাকমা, ২. ললিত চাকমা, ৩. জ্ঞানরঞ্জন চাকমা, ৪. ফুলোক্কা চাকমা, ৫. রুপান চাকমা, ৬. সুশান্ত চাকমা, ৭. কিরণ চাকমা, ৮. অমলেন্দু চাকমা ও ৯. গুনমুনি চাকমা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ জুরাছড়ির বনযোগীছড়া জোনের অধীন লুলাংছড়ি সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ রবিউল উল্লিখিত ২ জন হেডম্যান ও ৯ জন কার্বারীদের ক্যাম্পে ডেকে একটি সভা করে। সভায় ক্যাম্প কমান্ডার নির্দেশের সুরে বলেন, প্রত্যেক মাসে উল্লিখিত কার্বারীদের থেকে একজন ক্যাম্পে এসে

ক্যাম্পের কাজ করে দিতে হবে। ক্যাম্প কমান্ডার, লুলাংছড়ি ক্যাম্পের পাশে বা নিচে লুলাংছড়ি ছড়ার পাশে রুপান কার্বারীকে তার এলাকায় ২০ পরিবারের জন্য জায়গা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেন।

তবে ক্যাম্প কমান্ডার ২০ পরিবার কারা তা উল্লেখ করেননি। অভিজ্ঞমহলের অভিযোগ, বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের অবৈধভাবে বসতি প্রদানের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই ক্যাম্প কমান্ডার জোরপূর্বক উক্ত জায়গা আদায়ের চেষ্টা করছেন। এছাড়াও, ক্যাম্প কমান্ডার, জোন কমান্ডারের নির্দেশ আছে বলে রুপান কার্বারীকে একটি সাদা কাগজে দস্তখত করতে বললে রুপান কার্বারী তার পক্ষে দস্তখত করা সম্ভব নয় বলে সাক্ষর না করে চলে আসেন।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনীর টহল অভিযানে বাড়ি তল্লাশি, জনমনে আতঙ্ক

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটির জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার কেংড়াছড়ি ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক টহল অভিযান চালানো হয় এবং এই সময় অন্তত ৪ জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এতে জনমনে ব্যাপক ভয় ও আতঙ্কেও সৃষ্টি হয়। তল্লাশির শিকার গ্রামবাসীরা হল- ১. কিনাধন চাকমা (৩৫), পীং- পূর্ণ লাল চাকমা,২. পূর্ণ লাল চাকমা, পীং- অজ্ঞাত, ৩. দয়ালাল চাকমা (৬৫), পীং- মৃত রুপধন চাকমা, ৪. নাকস চাকমা (৫০), পীং- নীল মোহন চাকমা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি জোনের ৩২ বীর এর জৈনক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি সেনাদল ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের বেগেনাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে পরদিন সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের নাড়াইছড়ির ভারত্বছড়া গ্রামে উল্লিখিত ৪ জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়।

রাঙ্গামাটির বালুখালীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি সেনাবাহিনীর অবমাননামূলক আচরণ

গত ৪ জানুয়ারি ২০২৪ রাঙ্গামাটি সদর সেনা জোন ও বরকল উপজেলাধীন সুবলং সেনা ক্যাম্প থেকে যৌথভাবে জনৈক ক্যাপ্টেন ও সুবেদারের নেতৃত্বে ৩৫/৪০ জনের একটি সেনা টহল দল বিকাল ৩টার দিকে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের বাদলছড়ি গ্রামের বাদলছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান নেয়। পরে সন্ধ্যার দিকে উক্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী বাদলছড়ি জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে গিয়ে অবস্থান নেয়। সেখানে বৌদ্ধ বিহারটির ভবনটি নির্মাণাধীন রয়েছে। মাসখানেক আগে একদল ভিক্ষুসংঘ নিয়ে গ্রামবাসী বিহারের ভবনটি নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন।

গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন, নির্মাণাধীন ভবনের জায়গায় সেনা সদস্যরা চার দিন ধরে অবস্থান করেন। এসময় সেনা সদস্যরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিহারের জায়গাতেই সাউন্ড বক্স দিয়ে প্রতিদিন আজান দেয় এবং বিহারের আশেপাশে খোলা জায়গাতেই মলমূত্র ত্যাগ করে পরিবেশ দূষিত করে, যা বৌদ্ধ ধর্মকে এবং ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীদের অবমাননার সামিল। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন ৮ জানুয়ারি ২০২৪ সেনাসদস্যরা স্ব স্ব সেনা ক্যাম্পে চলে যায়।

সেনাবাহিনীর কেএনএফের বাংকার ধ্বংসের নাটক, আর কেএনএফের অবাধ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড

গত ১১ জানুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা-রোয়াংছড়ি সড়কের পাশে বালু পাহাড় নামক স্থানে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) এর বাংকার ধ্বংস করে দিয়েছে বলে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যে সংবাদ প্রচার করেছে তা সম্পূর্ণ সাজানো নাটক বলে জানিয়েছে স্থানীয় একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র।

সূত্রগুলো জানায়, গত ৯ জানুয়ারি ২০২৪ স্বয়ং সেনাবাহিনীর একটি দল বালু পাহাড়ে গিয়ে কেএনএফের সঙ্গে কথা বলে কেএনএফ সশস্ত্র সদস্যদের জুরফরং বম পাড়ায় নিরাপদে সরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। পরদিন (১০ জানুয়ারি) সেনাবাহিনীর একটি দল সকাল ৯টা থেকে ১০টার দিকে রোনিন পাড়া ও পাইনখ্যং পাড়ার মধ্যবর্তী টেবিল পাহাড় থেকে থেমে থেমে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এতে আশেপাশের এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এর পরদিনই সেনাবাহিনী বালু পাহাড়ে কেএনএফের বাংকার ধ্বংস করে দিয়েছে বলে প্রচার শুরু করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বম জনগোষ্ঠীর এক মুরুব্বি বলেন, সেনাবাহিনীর এসব কর্মকান্ড হাস্যকর এবং নাটক ছাড়া কিছু নয়। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী কেএনএফকে আড়াল করতে এবং নিজেদের কৃতিত্ব দেখাতে কেএনএফের পরিত্যক্ত বাংকারে ওই তথাকথিত হামলা চালিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বম সম্প্রদায়ের এক অধিকার কর্মী জানান, গত প্রায় ৩ মাস ধরে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের ১৪-১৫

জনের একটি সশস্ত্র দল রুমা উপজেলার ১নং পাইন্দু ইউনিয়নের জুরফরং বম পাড়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান করে আসছিল। তাদের অবস্থানের কারণে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা তাদের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া এলাকাবাসীদের নিয়মিতভাবে কেএনএফের দলটিকে চাঁদা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

জুরফরং পাড়া ও পার্শ্ববর্তী বেথেল বম পাড়ার জনগণ এই সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মী অবস্থায় রয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, এই গ্রামের জনগণ না পারছে বলতে, না পারছে সইতে।

তিনি বলেন, বর্তমানে কেএনএফের সশস্ত্র সদস্যদের হেডকোয়ার্টার্স রয়েছে ১নং পাইন্দু ইউনিয়নের মুননোয়াম পাড়া গ্রামে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী মুনলাই পাড়ার উপরে আমবাগানে ৯ জনের একটি দল রয়েছে। জুরফরং বম পাড়ার কেএনএফের সশস্ত্র দলটি থেকে একটি অংশ প্রায়ই বালু পাহাড়ে তাদের কথিত অস্থায়ী বাংকারে গিয়ে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে চাঁদা উত্তোলনসহ অন্যান্য সন্ত্রাসী কাজ পরিচালনা করে।

স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে কেএনএফের একটি সশস্ত্র দল বালু পাহাড়ে অবস্থান নিয়ে রুমা-রোয়াংছড়ি সড়ক সহ আশেপাশের এলাকায় চাঁদাবাজি ও ছিনতাই শুরু করে। নিরাপত্তা বাহিনীর গোচরেই তারা একের পর এক সন্ত্রাসী কাজ চালায়।

বরকলে বিজিবি বহনকারী লঞ্চের ধাক্কায় ছোট ট্রলারে থাকা জুম্ম শিশু ডুবে নিখোঁজ

গত ১২ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল ১০:৪৫ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলায় কর্ণফুলী নদীতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যদের বহনকারী একটি বড় লঞ্চের ধাক্কায় ইঞ্জিন চালিত ছোট একটি ট্রলারে থাকা ১২ বছরের এক জুম্ম শিশু ডুবে নিখোঁজ হয়। ভুক্তভোগী শিশুটির পরিচয়- উত্তরা চাকমা (১২), পীং-বিদ্যা সাধন চাকমা, গ্রাম-ঠেগা কালাপুনাছড়া, ৭নং ওয়ার্ড, ৩নং আইমাছড়া ইউনিয়ন, বরকল।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রাঙ্গামাটি জেলা সদর থেকে আসা মোঃ ইউসুফ আলী কোম্পানির এস এম আল হোসেন নামক লঞ্চটি বরকলের ছোট হরিণার ১২ বিজিবি জোনের বিজিবি সদস্যদের একটি দলকে বহন করছিল এবং ছোট হরিণার দিকে যাচ্ছিল। এসময় জগন্নাথ ছড়া নাম এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ছোট ট্রলারকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রলারটি নদীতে উল্টে গেলে ট্রলারে থাকা ১০ জুম্ম যাত্রীর সবাই নদীতে পড়ে যায়। এসময় পড়ে যাওয়া ৯ জন যাত্রী সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছে জীবন বাঁচালেও, ১২ বছর বয়সী উত্তরা চাকমা নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনার কয়েকদিন পর শিশুটির লাশ পাওয়া যায়।

বাঘাইছড়িতে জুম্ম গ্রামে নতুন বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর একটি দল রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের মাঝিপাড়া সড়ক সংলগ্ন ভিজাকিজিং এলাকায় নতুন একটি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয় বলে এলাকাবাসীর সূত্রে খবর পাওয়া যায়। জায়গাটি গ্রামবাসীদের সামাজিক মালিকানাধীন মৌজাভূমি বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, মারিশ্যা বিজিবি জোনের নিয়ন্ত্রণাধীন কজইছড়ি বিজিবি ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন ইকবাল এর নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য এই নতুন ক্যাম্প স্থাপনের কাজ শুরু করে। এসময় বিজিবি সদস্যরা গ্রামবাসীদের কাউকে কিছু না বলে উক্ত জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার এবং ক্যাম্প নির্মাণের সরঞ্জাম জড়ো করে। সেখান থেকে যাওয়ার সময় বিজিবি সদস্যরা সেই জায়গায় চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সেখানে একটি সাইনবোর্ডও স্থাপন করে যায়।

সাইনবোর্ডে তারা 'বিজিবি অস্থায়ী ক্যাম্প সংরক্ষিত এলাকা (সকল প্রকার স্থাপনা তৈরি, মাটি কাটা, দখল এবং চলাচল নিষেধ)' বলে নির্দেশ জারি করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক এলাকাবাসী বলেন, সেনাবাহিনী ও বিজিবি প্রায়ই এভাবে গায়ের জোরে, বেআইনিভাবে এবং জনগণের কোনো প্রকার সম্মতি ব্যতিরেকে ক্যাম্প স্থাপনের নামে জুম্মদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সামাজিক মালিকানাধীন ভূমি বেদখল করে চলেছে।

জুরাছড়িতে নির্মাণাধীন ট্রানজিট রোডের কারণে ২০টি জুম্ম পরিবার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন

রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার ৪ নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম কনস্ট্রাকশন বিভাগ' এর তত্ত্বাবধানে চলমান ট্রানজিট রোডকে প্রসারিত করার কাজে অন্তত ২০টি জুম্ম পরিবার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। জানা যায়, এতে প্রায় ১৫ পরিবারের বাগান-বাগিচা ধ্বংস ও ৫ পরিবারের বসতবাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের প্রকাশিত এক রিপোর্টে রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সংযোগ সড়ক বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক ৬১১ একর ভূমির প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয়। সমীক্ষায় জানানো হয় যে, উক্ত রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সড়ক নির্মাণ করা হলে ১১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, ৫৬৪ পরিবার প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ২৪১টি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ১৫৭ পরিবার ব্যবসায়িক কাঠামো হারাবে, ১০টি সাংস্কৃতিক অবকাঠামো (৩টি মসজিদ, ৩টি মন্দির ও ৪ টি স্কুল) ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ৩২টি পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে জানানো হয়।

১৫টি পরিবারের বাগান-বাগিচা ক্ষয়ক্ষতির তালিকা নিম্নে দেয়া হল-

১. সুরেশ চন্দ্র চাকমা, পীং-বিজুমন চাকমা, গ্রাম-রক্তছড়া পাড়া, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ - সেগুন গাছ ৫০টি, গামারী গাছ ১০ টি, আম গাছ ২০ টি, কমলা গাছ ৩৫ টি।

২. লক্ষী রঞ্জন চাকমা, পীং-দেবজিৎ চাকমা, গ্রাম-করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ৫০টি, গামারী গাছ ১০টি।

৩. কৃষ্ণ চাকমা, পীং-ফকির চাকমা, গ্রাম-করল্যাছড়ি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ৫০টি, গামারী গাছ ১৫টি।

৪. শান্তি রঞ্জন চাকমা, পীং-বৃষ চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ- সেগুন গাছ ৬০টি।

৫. কালো রঞ্জন চাকমা, পীং- কৃষ্ণ মোহন চাকমা, গ্রাম- করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ১০০টি, গামারী গাছ ২০টি, কমলা গাছ ৫টি, কাঠাল গাছ ১০টি।

৬. মনুরঞ্জন চাকমা, পীং-কৃষ্ণ মোহন চাকমা, গ্রাম-করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ - সেগুন গাছ ৫০টি, গামারী গাছ ১০টি, কাঠাল গাছ ৫টি, আম গাছ ৬টি।

৭. জগদিশ চাকমা, পীং-অমর ধন চাকমা, গ্রাম-লাম্বা ছড়া মুখ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ১৫০টি, গামারী গাছ ১০টি।

৮. কালকেতু চাকমা, পীং- মৃত রাত্তোরাম চাকমা, গ্রাম- করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ১৬০টি, গামারী গাছ ১০টি।

৯. রুনি চাকমা, পীং-মঙ্গল চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ - সেগুন গাছ ৩০টি, গামারী গাছ ১০টি।

১০. রুপেশ কার্বারী, পীং-অজ্ঞাত। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ২০টি, গামারী ৫টি।

১১. রত্ন মন চাকমা, পীং-উদয় কুমার চাকমা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ৭০টি, গামারী ৫টি।

১২. নিপন চাকমা, পীং-হজ মুনি চাকমা, গ্রাম-করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ৫০ টি।

১৩. অসিম চাকমা, পীং-অমর ধন চাকমা, গ্রাম-করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ২৫টি, গামারী গাছ ৫টি।

১৪. অশোক কুমার চাকমা, পীং- সশিরাজ চাকমা, গ্রাম-দুমদুম্যা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ৫০টি।

১৫. লক্ষী লাল চাকমা, পীং- লক্ষীচন্দ্র চাকমা, গ্রাম-করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- সেগুন গাছ ৬০টি, গামারী গাছ ৬টি।

এখানে উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত মনুরঞ্জন চাকমার গাছ বাদে বাকী সবগুলোর গাছের বয়স আনুমানিক ৪-৬ বছরের মধ্যে। ৫টি পরিবারের বসতবাড়ি ও চায়ের দোকান ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা নিম্নে দেয়া হল- ১. অসীম চাকমা, পীং-অমর ধন চাকমা, গ্রাম- করল্যাছড়ি, ৬নং ওয়ার্ড, দুমদুম্যা ইউনিয়ন; ২. লক্ষীরাণী চাকমা, স্বামী-মৃত ছারাধন চাকমা, গ্রাম- ঐ; ৩. অনন্ত চাকমা, পীং-অমরধন চাকমা, গ্রাম- ঐ; ৪. রনি চাকমা, পীং-মঙ্গল চন্দ্র চাকমা, গ্রাম- ঐ (বসত

বাড়ি ও চায়ের দোকান); ৫.সতেজ চাকমা, পীং-নিপেন চাকমা, গ্রাম- ঐ।

বাঘাইছড়িতে সীমান্ত সংযোগ সড়ক: আশ্বাস দিয়েও ক্ষতিপূরণ দিতে নারাজ সেনাবাহিনী

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের আন্দোলন ও ক্ষতিপূরণের দাবির প্রেক্ষিতে একাধিকবার ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলেও সম্প্রতি সেনাবাহিনীর এক মেজর কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন। সেনাবাহিনীর এমন ঘোষণায় ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। গ্রামবাসীরা সেনাবাহিনীর এমন আচরণকে হয়রানিমূলক এবং তাদের অধিকার নিয়ে টালবাহানা বলে মনে করছে।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উক্ত সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের প্রকল্প কর্মকর্তা বিএ-১০০৬৯ মেজর মোঃ শামীম সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের তিনজন প্রতিনিধি ও স্থানীয় ইউপি সদস্যকে কচুইছড়ি সেনা ক্যাম্পে ডেকে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার উক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। এমনকি ওই সেনা কর্মকর্তা গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণের দাবিকে ভূয়া বলেও উল্লেখ করেন বলে জানা গেছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের তিনজন প্রতিনিধি হলেন- প্রিয় বিকাশ চাকমা, ৫নং ওয়ার্ড মেম্বার, বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন; সুগত চাকমা, ১নং ওয়ার্ড মেম্বার, সারোয়াতলী ইউনিয়ন ও নিরূপম চাকমা, সাবেক মেম্বার, ৮নং ওয়ার্ড, বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন। জানা গছে, বর্তমানে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মাণাধীন বাঘাইছড়ির কজোইছড়ি মুখ থেকে মাঝিপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৩০ ফুট প্রশস্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের ফলে ২২২টি জুম্ম পরিবার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এতে গ্রামবাসীদের বাড়িঘর, দোকান সহ বহু মূল্যবান সেগুন, আগর ও বিভিন্ন ফলজ বাগান ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে এবং তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে উক্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রতিবাদে অনেকবার বিক্ষোভ প্রদর্শন, মিছিল ও সমাবেশ করেন। পাশাপাশি তারা সেনাবাহিনী, বিজিবি ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

গ্রামবাসীরা জানান, তাদের আন্দোলন ও দাবির প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ক্ষতির পরিমাণসহ ক্ষতিগ্রস্তদের একটি তালিকা চাওয়া হয়। গ্রামবাসীরা ক্ষতিগ্রস্তদের একটি তালিকাসহ ক্ষতিপূরণের দাবিতে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ সেনাবাহিনীর জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসারের নিকট আবেদন পেশ করেন। এরপর একাধিকবার গ্রামবাসীরা সেনাবাহিনীর স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে সেনা কর্মকর্তারা বরাদ্দ আসেনি বলে জানায়। এভাবে প্রায় একবছর চলে যায়।

কিন্তু সর্বশেষ সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের প্রকল্প কর্মকর্তা বিএ-১০০৬৯ মেজর মো: শামীম সরকার গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেন যে, ক্ষয়ক্ষতির জন্য গ্রামবাসীদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। মেজর মোঃ শামীম সরকার এও বলেন, তোমাদের (গ্রামবাসীদের) তালিকা ও ক্ষয়ক্ষতির কাগজপত্র ভূয়া, কাজেই কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। মেজর মো: শামীমের এমন কথাবার্তায় জনগণের মধ্যে ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই ২০২২ সকাল ১০:০০ টায় ২৭ বিজিবি মারিশ্যা জোনের জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্নেল মোঃ শরিফুল আবেদ (এসজিপি) নিজে এসে বাঘাইছড়ির উগলছড়ি এলাকার আর্য্যপুর দোকানের রাস্তা মুখ থেকে মাঝিপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন।

ইতোমধ্যে উগলছড়ি এলাকার আর্য্যপুর দোকানের রাস্তা মুখ থেকে কজোইছড়ি মুখ পর্যন্ত আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দূরত্বের সড়ক নির্মাণের ফলে কমপক্ষে ৫৬ পরিবার জুম্ম গ্রামবাসী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ব্যাপক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাদের ক্ষতিপূরণের দাবি আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হলেও এপর্যন্ত প্রতিশ্রুতি ও ক্ষয়ক্ষতি মোতাবেক তাদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। অপরদিকে, আরও ২২২ পরিবার গ্রামবাসীর কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ তো দেওয়াই হয়নি, উপরন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের নথি অনুসারে উক্ত সীমান্ত সড়কটি ৩১৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য হবে। উক্ত সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

রাইখালীতে সেনা-মদদপুষ্ট মগপার্টি সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ব্যক্তিকে মারধর

গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ বেলা ২:৩০ টার সময় রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের ভালুকিয়া নিচের পাড়া গ্রাম থেকে কোনো কারণ ছাড়াই সেনা-মদদপুষ্ট মগপার্টি সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে এক জুম্মকে ধরে পার্শ্ববর্তী হাপছড়ি পাড়া এলাকায় নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধর করে। মারধরের শিকার ব্যক্তির নাম মনা তঞ্চঙ্গ্যা (২৮), পীং- মৃত নির্মল তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- ভালুকিয়া নিচের পাড়া। মারধরের পর ভুক্তভোগী ব্যক্তির মোবাইল ফোনটি ছিনতাই করে তাকে সেখানে রেখে চলে যায় সশস্ত্র মগপার্টি সন্ত্রাসীরা।

এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, মনা তঞ্চঙ্গ্যা চট্টগ্রাম শহরে ওয়াপডা (বিদ্যুৎ বিভাগে) কর্মরত। তিনি ছুটি নিয়ে দু'দিন আগে নিজ বাড়িতে আসেন।

মহালছড়িতে সেনামদদপুষ্ট সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক ২ জনকে অপহরণ

গত ২৪ নভেম্বর ২০২৩, সকাল আনুমানিক ৭ টার সময় খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার অন্তর্গত ক্যায়াংঘাট ইউনিয়নের দাঁতকুপ্যা থেকে সেনামদদপুষ্ট সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী উৎপল চাকমার নেতৃত্বে ৭ জনের একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী মুকুল বিকাশ চাকমা (৪০), পীং-মৃত মোহিনী মোহন চাকমা এর বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর একই দিন রাত ৮ টার সময় সন্ত্রাসীরা একই গ্রামের অনিল চাকমা (৫৫), পীং- অজ্ঞাত এর বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে ঘুম থেকে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারা উভয়েই ক্যায়াংঘাট ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের দাঁতকুপ্যা গ্রামের বাসিন্দা।

বান্দরবানের রুমা ও রোয়াংছড়িতে কেএনএফের তান্ডব

শান্তি কমিটির সঙ্গে বৈঠক করার পর বম পার্টি খ্যাত কেএনএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বান্দরবান জেলার রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় তান্ডব শুরু করে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদা আদায়, জোরপূর্বক শুকর ও চাল ছিনতাই করা, গ্রামবাসীদের মারধর করা ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যক্রম চালায় কেএনএফ সশস্ত্র সদস্যরা।

গত ২৫ নভেম্বর ২০২৩ একই ইউনিয়নের পাইনং ম্রো পাড়াবাসীরা কেএনএফ সন্ত্রাসীদেরকে ১০ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয়। উক্ত টাকাগুলো বগালেকে এসে দিতে হয়েছে গ্রামবাসীদেরকে।

ঐদিন একই ইউনিয়নের লেংপুই ম্রো পাড়াবাসীরাও কেএনএফকে ৬ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাড়াবাসী নির্ধারিত সময়ে টাকা দিতে না পারায় এখন তা দ্বিগুণ করে পরিবার প্রতি ১,০০০ টাকা করে মোট ১২,০০০ টাকা ধার্য করে দিয়েছে। পাড়ায় মোট ১২টি পরিবার বসবাস করে।

গত ২৩ নভেম্বর ২০২৩, রাত ৯:৩০ টার দিকে বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার ১১ কিলো শৈরাতং পাড়া থেকে বম পার্টি খ্যাত কেএনএফের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা উচসিং মারমা (২৫), পীং নিংনেঅং মারমা ও ক্যসামং মারমা (৪৫), পীং পুঅং মার্মা নামে দুইজনকে প্রংফু পাড়ার দিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে, অমানুষিকভাবে মারধর করার পর একই দিন রাত ১০টার দিকে অপহৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসীরা।

একই সময়ে পাড়ায় নিজ বাড়ির পানির লাইন ঠিক করার সময় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা মেদু মারমা (৫২) নামে একজন গ্রামবাসীকে কোন কারণ ছাড়াই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়।

গত ২২ নভেম্বর ২০২৩, রাত ১১:৩০ টায় কেএনএফের একটি সশস্ত্র দল রনিন পাড়া থেকে নেমে এসে রোয়াংছড়ি উপজেলার আলিক্ষ্যং ইউনিয়নের তঞ্চঙ্গ্যা অধ্যুষিত দয়া কুমার কার্বারী পাড়ায় প্রবেশ করে। এই সময় পাড়ার সবচেয়ে বড় শূকরটি গুলি করে বিনামূল্যে নিয়ে যায় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা, যার বাজার মূল্য প্রায় ২০-২৩ হাজার টাকা এবং পাড়ার সবকটি গাদা বন্দুকও তারা জোরপূর্বক নিয়ে যায়।

গত ২১ নভেম্বর ২০২৩, কেএনএফের ১০-১২ জনের একটি সশস্ত্র দল রুমা উপজেলার ৩নং রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের খুমী অধ্যুষিত রামতং পাড়ায় হানা দেয়। পাড়ায় গিয়ে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা একটি বড় শূকর দাবি করে। কিন্তু পাড়াবাসীরা বড় শূকর দিতে রাজি না হওয়ায় কেএনএফ সদস্যরা জোরপূর্বক ১টি বড় শূকর গুলি করে নিয়ে যায়। এছাড়া পাড়ার কার্বারী পিলু খুমীকে দু'টি চড় মারে এবং অপদস্থ করে।

গত ১৬ নভেম্বর ২০২৩, রোয়াংছড়ি উপজেলার শঙ্খমণি পাড়া (তঞ্চঙ্গ্যা পাড়া) থেকে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা ১৫ হাজার টাকা

এবং ৫ মণ চাল জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। প্রসঙ্গত, পূর্বে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা ঐ পাড়াবাসীকে ৩০ হাজার টাকা এবং ৩০ মণ চাল দিতে বলেছিল। পাড়াবাসীর অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর ১৫ হাজার টাকা ও ৫ মণ চাউল নিতে রাজী হয় কেএনএফ।

এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে কেএনএফ-রা রুমা উপজেলার কেওক্রডং এলাকার পাড়াগুলো থেকে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে আসছে। যেমন- ১১ কিলো পাড়া থেকে ২০ হাজার টাকা; মেনদন ম্রো কার্বারী পাড়া থেকে ২০ হাজার টাকা; উমংগ্রী পাড়া থেকে ১০ হাজার টাকা এবং লেলুং খুমীদের পাড়া থেকে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে।

উল্লেখ্য, শান্তি কমিটির সঙ্গে মিটিংয়ের পর থেকে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়েছে। গত ৫ নভেম্বরের সভায় ঐক্যমত্যের অন্যতম বিষয় ছিল সংলাপ চলাকালীন কেএনএফ এবং সেনাবাহিনী পরস্পরের উপর কোন আক্রমণ করবে না। সেই সুযোগ নিয়ে কেএনএফ এখন মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো ও খুমীদের উপর নানা ধরনের হয়রানিমূলক কার্যক্রম চলমান রেখেছে। বিপরীতে সেনাবাহিনীর কাছে সমস্ত তথ্য জানানোর পরেও তারা নীরব ভূমিকা পালন করে।

পানছড়িতে ইউপিডিএফ কর্মীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ৪ জন খুন ও ৩ জনের দলত্যাগ

গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ রাতে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার পূজগাং ইউনিয়নের অনিল পাড়ায় পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ কর্মীদের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ইউপিডিএফের ৪ জন খুন হয়েছে। আর ৩ জন কর্মী দলত্যাগ করে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) গ্রুপে যোগদান করেছে বলে জানা গেছে।

সূত্রে জানা যায় যে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে দলত্যাগকারীর মধ্যে নীতিদত্ত চাকমা সেনা-মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) গ্রুপের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী এনে স্বদলীয় সদস্যদের উপর হামলা করায়। ফলে এই হামলায় ইউপিডিএফের বিপুল চাকমা, সুনীল কান্তি ত্রিপুরা, লিটন চাকমা এবং রুহিন বিকাশ ত্রিপুরা ঘটনাস্থলে নিহত হন। অপরদিকে নীতিদত্ত চাকমা, হরিকমল ত্রিপুরা ও প্রকাশ ত্রিপুরা নামে প্রসিত সমর্থিত ইউপিডিএফের আরো ৩ জন সশস্ত্র সদস্য দলত্যাগ করে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) গ্রুপে যোগদন করে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, নীতিদত্ত চাকমা এর আগে সেনা-মদদপুষ্ট সংস্কারপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সশস্ত্র গ্রুপে কাজ করেছিল। এ ঘটনায় প্রসিত সমর্থিত ইউপিডিএফ দলত্যাগকারী নীতিদত্ত চাকমাসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বান্দরবানে কেএনএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বহনকারী গাড়ি আটক

গত ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ বান্দরবানের রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের নিয়াংক্ষ্যং পাড়ায় অনুষ্ঠিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে ফেরার পথে ভিক্ষুদের বহনকারী গাড়িটিকে কেএনএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ১৫-২০ মিনিট আটকিয়ে রেখে হয়রানি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১০ ও ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ রুমা উপজেলার ১নং পাইন্দু ইউনিয়নের নিয়াক্ষ্যং পাড়ায় অনুষ্ঠিতব্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করতে রোয়াংছড়ি কেন্দ্রীয় জেতবন বিহার থেকে কয়েকজন ভিক্ষু সেখানে যায়।

সেখান থেকে গত ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠান শেষে রুমা সদর হতে রোয়াংছড়ি কেন্দ্রীয় জেতবন বিহারের উদ্দেশে ফেরার পথে আনুমানিক বিকাল ৩:৪৬ টায় ১ ও ২ নং চেকপোষ্ট (২ নং চেকপোষ্টের কাছাকাছি) এলাকায় বম পার্টি খ্যাত কেএনএফ সন্ত্রাসীদের একটি অস্ত্রধারী দল ভিক্ষুদের বহনকৃত গাড়িটিকে আটকায়। পরে সেখান থেকে ভিক্ষুদের বহনকৃত গাড়িটিকে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে প্রায় ১৫-২০ মিনিট আটকিয়ে রাখার পর ছেড়ে দেয়।

বান্দরবানে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া চাঁদাবাজি, মারধর

আবারও বান্দরবানের রুমা-রোয়াংছড়ি সড়কে বাইক ও গাড়ি আটকিয়ে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের জোরপূর্বক চাঁদা উত্তোলন করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়াও, ১ জনকে মারধর, হাঁস-মুরগী ছিনতাই ও ১টি গ্রামের পাড়াবাসীদের ২ দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখার খবর পাওয়া যায়।

জানা গেছে, গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত রুমা-রোয়াংছড়ি সড়কের অবিচলিত পাড়া ও দুর্নিবার পাড়ার মাঝখানে কেএনএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দুটি বাইক আটকিয়ে বাইক প্রতি ৫০০ টাকা করে মোট ১০০০ টাকা চাঁদা ছিনিয়ে নেয়।

একই স্থানে বিকাল ৩:৩০ টার দিকে রোয়াংছড়িতে থেকে রুমায় ফেরার পথে ২টি জীপ গাড়ি আটকিয়ে গাড়ি প্রতি ৩০০০ টাক করে মোট ৬০০০ টাকা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়।

এদিকে, গত ১৩ ডিসেম্বর দুপুর ১২:০৫ ঘটিকায় ক্যাকলুংখ্যং পাড়ার শৈথোয়াইখই মারমার ছেলে ছোসিংমং মারমা পার্শ্ববর্তী

ফরোয়া পাড়ায় গেলে সেখানে আগে থেকে অবস্থানরত কেএনএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বেধম মারধরের শিকার হয়। জানা যায়, এসময় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা ছোসিংমং মারমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'ক্যাকলুংখ্যং পাড়ার লোক এই পাড়ায় কেন!'। তারপর কোনো কথাবার্তা ছাড়াই বাঁশ দিয়ে তাকে বেধম প্রহার করা হয়।

অন্যদিকে, ফরোয়া পাড়ার সকল পাড়াবাসীকে নিজ ঘরের উঠানে বের করে দিয়ে ঘরের সকল জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা এবং ১০-১২ কেজি ওজনের হাঁস-মুরগীসহ ১টি গৃহপালিত কুকুর জোরপূর্বক নিয়ে যায়। এসময় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে বলে, 'কোন মিডিয়া, নিরাপত্তাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে জানালে এর পরিণাম খুব ভয়াবহ হবে'। এছাড়াও, ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ২ দিন ফরোয়া পাড়ার পাড়াবাসীদেরকে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা অবরুদ্ধ করে রাখে বলে খবর পাওয়া গেছে।

রুমায় কেএনএফ কর্তৃক ৭ জুম্ম গ্রামবাসীকে মারধর, ছিনতাই, বৌদ্ধ ভিক্ষুকে অপমান

বান্দরবানের রুমা উপজেলায় কেএনএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক পাইন্দু ইউনিয়নের ৩টি পাড়া থেকে হাস-মুরগী ও গৃহপালিত পশু ছিনতাই, ৭ জুম্ম গ্রামবাসীকে মারধর ও এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছ থেকে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল ৬ টার দিকে কেএনএফের ১৫ জনের একটি সশস্ত্র দল রুমা উপজেলার ১নং পাইন্দু ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের ছাংদালা পাড়ায় প্রবেশ করে ১টি মোরগ ছিনিয়ে নেয়।

সেখান থেকে পাশের সাংনাক্র পাড়াতে যায়। সেখানে পৌঁছা মাত্রই সাংনাক্র পাড়ার বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুকে বিহার থেকে বের করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পরে পাড়া থেকে অস্ত্র দেখিয়ে গ্রামবাসীর ৫টি মোরগ ও ১টি ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এরপর সন্ধ্যা ৭ টার সময় একই ইউনিয়নের মুয়ালপি মারমা পাড়ায় প্রবেশ করে। সেখানে পৌঁছামাত্রই পাড়ার কার্বারিসহ ৭ পাড়াবাসীকে বেধম মারধর করে গুরুতর আহত করে।

আহতরা হল- ১. সানাইঅং মারমা (কার্বারি), ২. হ্লাথোয়াইচিং মারমা, ৩. অংসিংনু মারমা, ৪. ক্যমংচিং মারমা, ৫. লুপ্রুসিং মারমা, ৬. মংওয়েই মারমা, ৭. শৈপ্রু মারমা।

ওই ৭ জন পাড়াবাসীকে মারধর করার পর কেএনএফ অস্ত্রধারী দলটি মুয়ালপি মারমা পাড়ার বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছ থেকে থেকে ৫ হাজার টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

বড়দিন উদযাপনের নামে কেএনএফ-এর চাঁদাবাজিতে অতিষ্ট রুমার বিভিন্ন পাড়াবাসী

বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার বিভিন্ন পাড়া থেকে কেএনএফ কর্তৃক বড়দিন উপযাপনের নামে চাঁদাবাজি, হাস-মুরগী ও ছাগল ছিনতাই করার এবং রুমা-রোয়াংছড়ি সড়কে বাইক ও গাড়ি আটকিয়ে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল ৭ ঘটিকায় রুমা উপজেলার ১নং পাইন্দু ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডে ছাংদালা পাড়ায় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা অস্ত্র দেখিয়ে একটি মোরগ নিয়ে যায়। এরপর সকাল ১০ ঘটিকার সময় সাংনাক্র পাড়ায় প্রবেশ করে পাড়ার বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে বিহারে অবস্থানরত বিহারাধ্যক্ষ ও পাড়াবাসীকে পাড়ার মাঝখানে জড়ো করে রাখে। এরপর পাড়া থেকে ৫টি মুরগী ও ১টি ছাগল নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বিহারাধ্যক্ষ ও পাড়াবাসীকে হুমকি দিয়ে যায় যে, কোনো নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে জানালে এর পরিণাম খুব ভয়াবহ হবে।

অন্যদিকে, একই দিনে (১৬ ডিসেম্বর) কেএনএফ সন্ত্রাসীদের ১২ জনের আরেকটি দল সকাল ৯ ঘটিকার সময় রুমা উপজেলার ২নং রুমা সদর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডস্থ শৈরাতং পাড়ার সাতকিলো নামক স্থানে রুমা বাজারের কলা ব্যাবসায়ী মো: জামশেদ, পীং-মৃত বাদশা মিয়ার কাছ থেকে বাইক আটকিয়ে ৭০,০০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়।

পরবর্তীতে বম সম্প্রদায়ের নেতাকর্মীদের সাহায্যে উক্ত ৭০,০০০ টাকা দুই ঘন্টা পর ফেরত দেয় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা। টাকা ফেরত দেওয়ার সময় বড়দিন উদযাপন উপলক্ষে ২৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করলে সন্ধ্যা ৭:৩০ ঘটিকার সময় বিকাশে (০১৫৭৫৪৪৩৭৫৫) এই নাম্বারে ৫,০০০ টাকা পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয় বলে জানান ভিকটিক মো: জামশেদ।

রুমা ও রেংখ্যংয়ে কেএনএফের উস্কানিমূলক তৎপরতা

বান্দরবান জেলার রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলা এবং রেংখ্যং ভ্যালীর অন্তর্গত রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় জেএসএস কর্মীদের টার্গেট করে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর উস্কানীমূলক তৎপরতা বেড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী বিশেষ মহলের ইন্ধন রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লার নেতৃত্বে গঠিত ও সেনা-মদদপুষ্ট 'শান্তি কমিটি'র সঙ্গে মিটিংয়ের পর থেকে বম পার্টি খ্যাত কেএনএফ সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শান্তি কমিটি ও কেএনএফের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের সভায় ঐক্যমত্যের অন্যতম বিষয় ছিল, সংলাপ চলাকালীন কেএনএফ এবং সেনাবাহিনী পরস্পরের উপর কোন আক্রমণ করবে না।

সেই সুযোগ সদ্ব্যবহার করে কেএনএফ এখন মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো ও খুমীদের উপর নানা ধরনের হয়রানিমূলক কার্যক্রম, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিনামূল্যে হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু ছিনতাই এবং অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক চাঁদাবাজি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) কর্মীদের প্রতি টার্গেট করে উস্কানিমূলক তৎপরতা জোরদার করেছে বলে জানা গেছে।

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ কেএনএফের একদল সশস্ত্র সদস্য বিলাইছড়ির বড়থলি হয়ে সৈকত পাড়ার দিকে চলে যায়। বড় দিনের পর সেই গ্রুপটি আবার একই রাস্তা ধরে বড়থলি হয়ে মিজোরামে চলে যায় বলে জানা গেছে। এসময় তারা জেএসএস কর্মীদের খোঁজ নেয়।

এছাড়া কেএনএফের সদস্যদের সঙ্গে বড়থলি ইউনিয়নের উলুছড়িতে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মুখোমুখী হয়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জেএসএস কর্মীদের খোঁজখবর নেয়। তাদেরকে দেখেছে বলে এই কথা কারো নিকট ফাঁস করতে বারণ করে। অন্যথায় চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে গ্রামবাসীদেরকে হুমকি দিয়ে যায় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা। সেসময় তারা গ্রামবাসীদের ছবিও তুলে নিয়ে যায়।

এরপর ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ রুমা উপজেলার প্রাংসা ও বটতলি এলাকায় কেএনএফ সন্ত্রাসীদের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। জেএসএস সদস্যদের টার্গেট করেই কেএনএফের এই তৎপরতা বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের শুক্রমনি পাড়ার জুম এলাকায় কেএনএফ সশস্ত্র সদস্যরা চড়াও হয়। এরপর রেইখ্যং-এর হেইংগ্যছড়া দিয়ে ঠেগা বর্ডার হয়ে মিজোরামে চলে যায়। এসময় কেএনএফের সন্ত্রাসীরা শুক্রমনি পাড়া থেকে জুমচাষীদের কাছ থেকে ৩০০ টাকার বিনিময়ে ৪/৫ কেজি মুরগীসহ চাল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

গত ১-২ জানুয়ারি ২০২৪ কেএনএফ সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে রুমার চাইরাগ্র পাড়া থেকে চাঁদা তুলে। এসময় তারা চনুমং মারমা নামে দৈনিক পূর্বকোণের সাংবাদিককে আটক করে এবং তিনি জেএসএসের কাজ করে মর্মে মনগড়া অভিযোগ এনে তাকে হুমকি-ধামকি প্রদান করে।

গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদা আদায়, জোরপূর্বক শুকর ও চাল ছিনতাই করা, গ্রামবাসীদের মারধর করা ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে সেনাবাহিনীর কাছে জানানোর পরেও তারা নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। কাজেই কেএনএফের এই উস্কানিমূলক তৎপরতার ক্ষেত্রে সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই জড়িত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

আরো জানা গেছে যে, বড় দিন উপলক্ষে গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে মুননোয়াম পাড়ায় সেনাবাহিনী ও কেএনএফের সদস্যদের মধ্যে ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে কেএনএফ সদস্যরা মুননোয়াম পাড়াকে তাদের হেডকোয়ার্টারের মতো ব্যবহার করছে। অথচ রুমা সেনা গ্যারিসন থেকে মুননোয়াম পাড়ার দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার। অন্যদিকে সেনা ক্যাম্প থেকে এক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত বেথেল পাড়ায় (রুমা সদর) কেএনএফের সদস্যরা ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ঘুরাফেরা করলেও সেনাবাহিনী দেখেও না দেখার ভান করে থাকে বলে জানা গেছে।

এসব উস্কানিমূলক তৎপরতায় কেএনএফের স্বঘোষিত কর্ণেল ভানচুংলিয়ান বম, ক্যাপ্টেন লালসাংরেম বম, সাংপা বম, ক্যাপ্টেন লিয়ানমিং বম, লে: অলিভ বম ও সার্জেন্ট লমলিয়ান বম প্রমুখ ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। মিজোরামের সিপ্পুইয়ের অধিবাসী জনৈক রাইফেল তঞ্চঙ্গ্যা হচ্ছে তাদের ভাড়াটে সহযোগী। রাইফেল তঞ্চঙ্গ্যার সহযোগিতায় কেএনএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জেএসএস সদস্যদের টার্গেট করে এই উস্কানিমূলক তৎপরতা চালাচ্ছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

রাইখালীতে মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের অপহরণের শিকার এক জুম্ম গ্রামবাসী

রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়ন থেকে সেনামদদপুষ্ট মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হয়। ভুক্তভোগী ব্যক্তির পরিচয়- বিমল তঞ্চঙ্গ্যা (৪২), পীং-চিত্ত রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম-ভালুকিয়া পাড়া, ৭নং ওয়ার্ড, ২নং রাইখালী ইউনিয়ন, কাপ্তাই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ১১ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল ১১ টার দিকে মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কয়েকজন সশস্ত্র সদস্য

রাইখালী ইউনিয়নের কারিগর পাড়াস্থ সাপ্তাহিক বাজার থেকে বিমল তঞ্চঙ্গ্যাকে মুখে গামছা বেঁধে দিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃত বিমল তঞ্চঙ্গ্যা একজন নিরীহ সাধারণ দিনমজুর ও কৃষক বলে জানা গেছে।

নির্বাচনের পরপরই আবার এই এলাকায় মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের নতুন করে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড শুরু হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

সেনাসৃষ্ট কেএনএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক পাইন্দু ইউপি চেয়ারম্যান অপহৃত

গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ বিকেলের দিকে সেনাবাহিনী সৃষ্ট বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান উহ্লামং মারমা (৫০) অপহরণের শিকার হন।

রুমার কেউক্রাডং থেকে গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে বগালেক সড়কের হারমন পাড়া এলাকার রংতং ঝিড়ি নামক স্থানে পৌঁছলে সন্ত্রাসীরা তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের শিকার ইউপি চেয়ারম্যান উহ্লামং মারমার বাড়ি পাইন্দু ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের চান্দাপাড়া গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঐদিন সকালের দিকে বেসরকারি সংস্থা লীন প্রজেক্টের কাজ পরিদর্শন শেষে বিকেলের দিকে ইউপি চেয়ারম্যান উহ্লামং মারমা তার স্ত্রী পিয়াং এং ময় বম, স্থানীয় ইউপি মেম্বার এবং লীন প্রজেক্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহ দুটি গাড়িতে বাড়িতে ফেরার পথে এই অপহরণের ঘটনাটি ঘটে।

সূত্রটি জানায়, গাড়ি থেকে নামানোর পর সন্ত্রাসীরা চেয়ারম্যান উহ্লামং মারমার কাছ থেকে চাঁদা দাবি করে। এসময় সন্ত্রাসীরা উহ্লামং মারমার পকেটে থাকা ৩০ হাজার টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। এরপর সন্ত্রাসীরা অন্যান্য যাত্রীদের গাড়িতে উঠে যেতে বাধ্য করে এবং চেয়ারম্যান উহ্লামং মারমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে জনগণের চাপে পড়ে সন্ত্রাসীরা চেয়ারম্যান উহ্লামং মারমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

সেনামদদপুষ্ট মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন, হুমকি ও তৎপরতা বৃদ্ধি

সম্প্রতি নতুন করে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মদদপুষ্ট মগ পার্টি খ্যাত মারমা ন্যাশনালিস্ট পার্টির (এমএনপি) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বৃদ্ধি, প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন ও হুমকি প্রদানের খবর পাওয়া গেছে। এই মগ পার্টির সন্ত্রাসীদের একাধিক ফেসবুক পেইজ থেকে প্রচারিত ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন করে হুমকি প্রদান করতে দেখা গেছে।

সেনাবাহিনীর নাকের ডগায় এভাবে অস্ত্র প্রদর্শন ও হুমকি প্রদানের ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে যেমন ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি বিভিন্ন নাগরিক সমাজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দেখা গেছে। স্থানীয়দের মতে, সেনা ক্যাম্পের পাশে অবস্থান করেই মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে এসব কর্মকান্ড চালাচ্ছে। সেনাবাহিনী দেখেও না দেখার ভান করছে।

গত ২৫ জানুয়ারি মং শৈ মারমা নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে প্রচারিত এক ভিডিও ক্লিপে মগ পার্টির এক সশস্ত্র সদস্য কর্তৃক প্রকাশ্যে জেএসএস'কে (জনসংহতি সমিতি) উদ্দেশ্য করে যুদ্ধ করার হুমকি দিতে দেখা গেছে। এর আগে একই আইডি থেকে একই ব্যক্তি কর্তৃক অস্ত্র উচিয়ে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়তে দেখা গেছে।

একই দিন 'এমএনপি কমান্ডো মংথেন' নামের এক আইডি থেকে নিজেকে 'এমএনপি গেরিলা যোদ্ধা' দাবি করে এক সন্ত্রাসী কর্তৃক জনবসতিপূর্ণ এক খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরা অবস্থায় ছবি পোস্ট করতে দেখা যায়।

গত ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখও উক্ত আইডি থেকে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, পিস্তল ও গুলি প্রদর্শন করতে দেখা গেছে।

জানা গেছে, বাঙ্গালহালিয়া বাজারের পেছনে সেনা ক্যাম্পের পাশে অবস্থিত মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের একটি আস্তানা থেকেই এসব অস্ত্র প্রদর্শন, গুলিবর্ষণ ও হুমকি প্রদানের ভিডিও ও স্থিরচিত্র ধারণ করে প্রচার করছে।

বর্তমানে রাজস্থলী উপজেলায় মগ পার্টি সন্ত্রাসীরা দুটি দলে দুটি আস্তানায় অবস্থান করে সেখান থেকে যাবতীয় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে। এর একটি আস্তানা অবস্থিত বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের বাঙ্গালহালিয়া বাজারের পেছনে নাইক্যছড়া সড়কের পাশে জনৈক তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীর সেমিপাকা বাড়িতে। ঐ বাড়িটি তারা ইতিপূর্বে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে জোর করে দখল করে এবং বাড়ির মালিককে বাড়িছাড়া করে। সন্ত্রাসীদের এই আস্তানাটি বাঙ্গালহালিয়া বাজার সেনা ক্যাম্পের মাত্র ২ শত গজের মধ্যে অবস্থিত। মগ পার্টির অপর আস্তানাটি গাইন্দ্যা ইউনিয়নের পোয়াইতু পাড়ায় অবস্থিত বলে জানা গেছে।

রুমায় কেএনএফ কর্তৃক ২ জনকে মারধর, ৬ জনকে অপহরণের দুই ঘন্টা পরে মুক্তি

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নে সেনা-সৃষ্ট বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) কর্তৃক ২ আদিবাসী মারমা গ্রামবাসীকে মারধর করা এবং অপর ৬ মারমা গ্রামবাসীকে অপহরণের দুই ঘন্টা পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

মারধরের শিকার ব্যক্তিরা হলেন- মংমংসিং মারমা (২৮), পীং-মংঞো মারমা, গ্রাম-নিয়াংক্ষ্যং পাড়া, পাইন্দু ইউনিয়ন এবং মংমংসিং মারমার এক সঙ্গী (নামা জানা যায়নি)।

অপরদিকে সাময়িক অপহরণের শিকার ব্যক্তিরা হলেন- ১. উচিংমং মারমা (৪১), পীং-প্রুসাথুই মারমা, গ্রাম-পারুয়া পাড়া, পাইন্দু ইউনিয়ন; ২. নাম-অজ্ঞাত, গ্রাম-পারুয়া পাড়া; ৩. শৈথুইসাই মারমা (৫০), পীং-অজ্ঞাত, গ্রাম-নিয়াংক্ষ্যং পাড়া, পাইন্দু ইউনিয়ন; ৪. অংসাইনু মারমা (১৭), পীং-চমংউ মারমা, গ্রাম-নিয়াংক্ষ্যং পাড়া, পাইন্দু ইউনিয়ন; ৫. অংথোয়াইচিং মারমা (৪৫), পীং-আদামং মারমা, গ্রাম-নিয়াংক্ষ্যং পাড়া, পাইন্দু ইউনিয়ন ও ৬. মংএনু মারমা (৪৩), পীং-মেদুসে মারমা, গ্রাম- নিয়াংক্ষ্যং পাড়া, পাইন্দু ইউনিয়ন।

জানা গেছে, সকাল ৮টার দিকে কেএনএফ-এর ১১ জনের একটি সশস্ত্র দল পারুয়া পাড়া গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত গ্রামবাসীদের দুটি বন্দুক ছিনিয়ে নেয় এবং সেই গ্রাম থেকে উচিংমং মারমা ও অজ্ঞাতনামা আরও ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এরপর কেএনএফ সন্ত্রাসী দলটি পারুয়া পাড়া ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী নিয়াংক্ষ্যং পাড়া গ্রামে যায়। এসময় সন্ত্রাসীরা নিয়াংক্ষ্যং পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে কথা বলতে থাকা মংমংসিং মারমা ও তার এক সঙ্গীকে পেয়ে তাদেরকে মারধর করে গ্রামের ভেতরে নিয়ে যায়। সেখানে সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীদের দুটি কুকুর গুলি করে মারে এবং গ্রামবাসীদের নারিকেল গাছ থেকে ২২টি নারিকেল পেড়ে নেয়। এরপর উক্ত কুকুর ও নারিকেলগুলো সঙ্গে নিয়ে নিয়াংক্ষ্যং পাড়ার উপরোক্ত চার গ্রামবাসীকেও অপহরণ করে নিয়ে যায়। তবে যাওয়ার আগে কুকুর ও নারিকেলের দাম হিসেবে মাত্র ২০০০ টাকা দিয়ে যায়। পরে দুপুর প্রায় ১২:০০ টার দিকে সন্ত্রাসীরা অপহৃত ৬ গ্রামবাসীকে মুক্তি দিয়েছে বলে স্থানীয় একটি সূত্র জানায়।

রুমায় কেএনএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক মারমা গ্রামবাসী গুলিবিদ্ধ, চাঁদাবাজি

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ভোর ৬টার দিকে সেনাসৃষ্ট বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের গুলিতে বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলার রুমা সদর ইউনিয়নের এক নিরীহ মারমা গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়। সন্ত্রাসীরা আরও এক মারমা গ্রামবাসীর কাছ থেকে জোরপূর্বক ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে জানা যায়।

আহত ব্যক্তির নাম উহ্লাচিং মারমা (৪০), পিতা-মংনাক মারমা, গ্রাম-রেজুক মারমা পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, রুমা সদর ইউনিয়ন। জানা গেছে, উহ্লাচিং মারমার নিজ বাড়ি বাসাদ্য পাড়া গ্রামে। তিনি ঘরজামাই হিসেবে রেজুক মারমা পাড়া গ্রামে বসবাস করেন।

জানা গেছে, ঐদিন ভোর সকালে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের ২৪ জনের একটি সশস্ত্র দল হঠাৎ ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রেজুক মারমা পাড়ায় প্রবেশ করে। এসময় গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সন্ত্রাসীরা গ্রামে প্রবেশ করেই সম্মুখে উহ্লাচিং মারমাকে দেখতে পায় এবং তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। এতে উহ্লাচিং মারমার পেটে ও কোমরে গুলি লেগে তিনি গুরুতর আহত হন।

আহত উহ্লাচিং মারমাকে প্রথমে রুমা উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা যায়।

এছাড়া সন্ত্রাসীরা গ্রামের বাড়িগুলোতে প্রবেশ করে ব্যাপক তল্লাশি এবং জিনিসপত্র তছনছ করে। এসময় সন্ত্রাসীরা খ্যাউ মারমা নামে এক মারমা গ্রামবাসীর কাছ থেকে জোরপূর্বক ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, কেএনএফ সন্ত্রাসীরা বর্তমানে রুমার আর্থা পাড়ার পার্শ্ববর্তী টেবিল পাহাড় এবং রুমা সদরের পলিকা পাড়া ও ইডেন পাড়ার মধ্যবর্তী পাহাড়ে অবস্থান করছে। সেখান থেকেই তারা আশেপাশের এলাকায় তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

সেনাবাহিনী কেএনএফ সন্ত্রাসীদের অবস্থান ও তৎপরতা জেনেও না জানার ভান করে থাকে বলে কয়েকজন এলাকাবাসীর অভিযোগ।

রুমায় মানববন্ধন থেকে ফেরার পথে আরও দুই মারমা গ্রামবাসী কেএনএফের মারধরের শিকার

বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) এর

সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে রুমা উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন শেষে বাড়ি ফেরার পথে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ আরও দুই মারমা গ্রামবাসী কেএনএফ সন্ত্রাসীদের মারধরের শিকার হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

মারধরের শিকার গ্রামবাসীরা হলেন- অংখ্যাইংসা মারমা (৩৫), পীং-মৃত সাফো অং মারমা, গ্রাম-নাক্রুপাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, ১নং পাইন্দু ইউনিয়ন এবং ঞোহ্লাপ্রু মারমা (৩৭), পীং-মৃত মংবাচিং মারমা, গ্রাম-পলি প্রাংসা পাড়া, ১নং পাইন্দু ইউনিয়ন। সন্ত্রাসীরা অংখ্যাইংসা মারমার কাছ থেকে টাকাও ছিনিয়ে নেয় বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, গতকাল রুমা সদর থেকে গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে বিকাল ৩:৩০ টায় লাইরুনপি পাড়া এলাকায় পৌঁছলে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা আটকিয়ে মারধর করে।

উল্লেখ্য, কেএনএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক রুমা উপজেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন, চাঁদাবাজি, অপহরণ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি রেজুক পাড়া নিবাসী উহ্লাচিং মারমাকে গুলি করার প্রতিবাদে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, রুমা উপজেলা সদরে সর্বস্তরের জনগণের এক বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে গতকাল ভুক্তভোগী দুই গ্রামবাসী বাড়িতে ফিরছিলেন।

অপরদিকে, ১৪ ফেব্রুয়ারি, সমাবেশ শেষে ফেরার পথে রুমা খাল নামক স্থানেও কেএনএফ সদস্যরা ক্যাসিংমং মারমা (৪৭), গ্রাম-ক্যায়ানবোওয়া পাড়া নামের এক গ্রামবাসীকে মারধর করে।

রাঙ্গামাটি শহরে গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক একজনকে অপহরণের চেষ্টা, চাঁদাবাজি

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলা শহর এলাকায় সেনামদদপুষ্ট ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এইসব সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি শহর থেকে এক জুম্মকে অপহরণ এবং মাইক্রোবাসের মালিক আরও এক নারীর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে।

রাঙ্গামাটি শহরের মত ব্যস্ত ও জনবহুল শহর এলাকায়ও সেনাবাহিনীর নাকের ডগায় এসব সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে।

জানা গেছে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বৃহস্পতিবার বিকাল ৩:৩০ টার দিকে গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী পরেশ চাকমা ও রমেশ চাকমার নেতৃত্বে ৭/৮ জনের একটি সশস্ত্র দল কল্যাণপুর নিবাসী উৎপল চাকমাকে শহরের বনরূপা বাজার এলাকা থেকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে সেখানে স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়। ফলে গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায় এবং তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

আরও জানা যায়, গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সোমবার সকাল ১১টার দিকে রাঙ্গামাটিতে অবস্থানরত গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী রমেশ চাকমার নেতৃত্বে ৭/৮ জনের একটি সশস্ত্র দল বনরূপার হ্যাপি মোড় থেকে মাইক্রোবাস সমিতির অফিসে অবস্থানরত সীমা চাকমা (৩৫) নামের এক মাইক্রোবাস মালিকের গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে গাড়ির লাইসেন্সসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরের দিন ১৩ ফেব্রুয়ারি, তবলছড়ির খান বাড়ির (কথিত গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তর) পাশে একটি স্থানে গাড়িটা পৌঁছে দিতে বাধ্য করা হয় এবং তারা মালিকের কাছ থেকে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। ৫০ লাখ টাকা না দিলে গাড়িটা ফেরত দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। পরে গাড়ির মালিক সীমা চাকমা রমেশ চাকমার সঙ্গে যোগাযোগ করে কয়েক লাখ টাকা দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করে বলে জানা যায়।

একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন ধরে রাঙ্গামাটি শহরে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদাবাজি করে আসছে এবং অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে চলেছে, যারা নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে অনেকে প্রকাশ করছেন না। আর প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগের শত শত কর্মীরা সবকিছু জানলেও তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। অপরদিকে, উল্টো গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা 'আমাদের সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগাযোগ ও বোঝাপড়া আছে' বলে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাদের ক্ষমতা জাহির করে থাকে।

জানা গেছে, গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী জনি মারমা ৫/৬ জনের একটি দলসহ শহরের ভেদভেদীস্থ কালী বাড়ি এলাকার তন্তু বড়ুয়ার বাসায় পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থেকে রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে।

অপরদিকে, রমেশ চাকমার নেতৃত্বে আরেকটি দল তবলছড়ির জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে ভাড়ায় থেকে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সন্ধ্যা হলেই তারা বনরূপাস্থ আইরিশ হোটেল ও রুচেল দলা হোটেল, মোনতলা এবং কে কে রায় সড়কের হোটেলগুলোতে কোমরে পিস্তল গুজিয়ে ঘোরাফেরা করে, আড্ডা দেয় ও মদের আসর বসায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়।

রুমায় কেএনএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৮ জনকে মারধর, হয়রানি

বান্দরবানের রুমা উপজেলায় বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ সন্ত্রাসীরা গাড়ি আটকিয়ে এবং কাজে যাওয়ার পথে কমপক্ষে ৮ জন লোককে মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত রবিবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭:০০টার দিকে বমপার্টি নামে খ্যাত কেএনএফ এর অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা রুমা উপজেলা সদরের বেথেল পাড়ার (বম পাড়া) কাছাকাছি পলি পাড়া (মারমা পাড়া) শ্মশান এলাকা থেকে লুপ্রু মারমা (৫৬), পিতা- মৃত আলুংমং মারমা, সাং- রুমা বাস স্টেশন-কে ধরে নিয়ে বেধম মারধর করে আহত করে। লুপ্রু মারমা বর্তমান রুমা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উহ্লাচিং মারমার ছোট ভাই এবং রুমা বাস স্টেশনের টিকেট কাউন্টারের লাইনম্যান হিসেবে কর্মরত।

তিনি বাসের লাইনম্যানের দায়িত্ব পালনের জন্য সকাল ৭:০০ টার দিকে সদরঘাট থেকে রুমা বাজারে যাচ্ছিলেন। এসময় সাঙ্গু কলেজ থেকে পলি পাড়া মাঝপথে তার গতিরোধ করে কেএনএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। পরে আধা ঘন্টার পর তাকে ছেড়ে দেয় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা।

আরো জানা যায়, সকাল ৭:৩০ টার দিকে রুমা বগালেক সড়কে সাত কিলোমিটার এলাকায় কেএনএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা যাত্রি নিয়ে ১১ কিলোমিটার যাওয়ার পথে তিনটি মোটর সাইকেল আটকিয়ে চালক ও যাত্রি (৬ জনকে) উভয়কে বেধড়ক পিটায়। এই জায়গায় আটকিয়ে রাখা নিরীহ লোকদের এখনো ছাড়া হয়নি।

এদিকে সকালে ৭:০০ টার সময় জুমে কাজ করতে যাওয়ার পথে রুমা উপজেলার ২নং রুমা সদর ইউনিয়নের ক্যাম্বওয়া পাড়াবাসী নুসিংথোয়াই মারমা (২৩), পিতা- ক্যসিংমং মারমা নামে এক যুবকের কাছ থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নেয় এবং পিটিয়ে আহত করে।

উল্লেখ্য সেদিন সকাল থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করেছে দিয়েছে বম পার্টি খ্যাত কেএনএফের সশস্ত্র সদস্যরা। এই অবস্থায় রুমা-বান্দরবান সড়কসহ রুমা উপজেলার অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্মর ভূমি বেদখলের চেষ্টা

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের অন্তর্গত রাঙ্গীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সুভাষ চাকমার ভোগদখলীয় জায়গা সেটেলার বাঙালি কর্তৃক বেদখলের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১২ নভেম্বর ২০২৩ সকাল ১০টায় ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের সেটেলার বাঙালি (১) মোঃ মঞ্জুরুল হক মিলন, পিতা-অজ্ঞাত, প্রাক্তন মেম্বার, ৮নং ওয়ার্ড; (২) মোঃ শহীদ মিয়া, পিতা-অজ্ঞাত, প্রাক্তন মেম্বার, ৯নং ওয়ার্ড ও (৩) মোঃ নাজিম উদ্দিন, পিতা-মৃত নিজাম উদ্দিন এর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি দল জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করে।

বিষয়টি ভূমির মালিক সুভাষ চাকমা জানতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে এসে জঙ্গল পরিষ্কার না করার জন্য বাধা প্রদান করে। এতে সেটেলার বাঙালিরা কোনো বাধা না শুনে উল্টো তাকে নানা ধরনের হুমকি প্রদান করে এবং জায়গাটি জনৈক বকুল বিকাশ চাকমার নিকট থেকে ক্রয় করেছে বলে তারা দাবি করে। বিষয়টি পুরো পাহাড়ি গ্রামের মধ্যে জানাজানি হলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা খবর নেওয়ার জন্য সেখানে গেলে পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং এক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

পরে ভূমির মালিক সুভাষ চাকমা পরিস্থিতির অবস্থা খারাপ দেখে

স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার ও তেমাথা বিজিবি ক্যাম্পে আপত্তি জানালে তাৎক্ষণিকভাবে বিজিবি সদস্যরা জঙ্গল পরিষ্কার করার জায়গাটিতে এসে বিষয়টির সত্যতা দেখতে পায়। বিজিবি সদস্যরা আসার পর উভয় পক্ষের লোকজন যার যার অবস্থান থেকে সরে গেলে পরিস্থিতি আশংকামুক্ত হয় এবং বিজিবি সদস্যরা নেতৃত্বদানকারী তিনজন সেটেলারকে ৩৭ বিজিবি, রাজনগর জোন, গুলশাখালীতে দুপুর ১২টার মধ্যে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা যায়।

তবে জোন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে কী বলেছে তা জানা যায়নি। বিজিবির সদস্যরা উদ্ভূত পরিস্থিতির ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা না নিলে হয়তো পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতো বলে গ্রামবাসীরা জানান।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক দয়াল চন্দ্র চাকমার জমি বেদখল করে ঘর নির্মাণ

রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলার লংগদু সদর ইউনিয়নের ২ নং বড় কাট্টলি মৌজাধীন বড় খাড়িকাটা (হাড়িকাবা) গ্রামের বাসিন্দা দয়াল চন্দ্র চাকমার নামে বন্দোবস্তিকৃত (বন্দোবস্তি কেইস নং ১২০৫ (ডি) ১৯৭৫) ৫ একর পরিমাণ জমি বেদখলের জন্য সেটেলার বাঙালিরা সেখানে একটি ঘর নির্মাণ করে।

জমির মালিক দয়াল চন্দ্র চাকমা ২ বছর আগে মারা গেছেন। তার বড় ছেলে মাইকেল চাকমাও ২০১৯ সালে ঢাকার নারায়ণগঞ্জ এলাকা থেকে গুমের শিকার হয়ে নিখোঁজ রয়েছেন। বর্তমানে তার মেয়ে সুভদ্রা চাকমা জমিটি দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ ডিসেম্বর ২০২৩, সকাল থেকে সেটেলার মোঃ কামাল দলবল নিয়ে দয়াল চন্দ্র চাকমার উক্ত রেকর্ডিয় জায়গায় ঘর নির্মাণ শুরু করে। রাতের মধ্যেই ঘরটি নির্মাণ শেষ করে সেখানে বসতি শুরু করে। বেদখলকারী মোঃ কামালের পিতার নাম মোঃ মকবুল। তার বাড়ি একই ইউনিয়নের ভাইবোন ছড়া গুচ্ছগ্রামে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সাল থেকে মোঃ কামাল উক্ত জায়গাটি বেদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। সেসময় সে জমির মালিক দয়াল চন্দ্র চাকমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটি জেলা জর্জকোর্টে মামলা দায়ের করে। পরে দয়াল চন্দ্র চাকমার মেয়ে সুভদ্রা চাকমাও জমির দলিলপত্রাদি দাখিল করে একই কোর্টে মোঃ কামালের বিরুদ্ধে পাল্টা একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর আদালত শুনানীর মাধ্যমে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জায়গাটি কেউই ভোগদখল বা সেখানে বসতিস্থাপন করতে পারবে না বলে আদেশ দেন। কিন্তু আদালতের আদেশ অমান্য করে সেটেলার মোঃ কামাল আবারো উক্ত জায়গা দখল করে ঘর নির্মাণ করেছে। জমির দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা সুভদ্রা চাকমা অবিলম্বে বেদখলকারী মোঃ কামালের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদপূর্বক জমি বেদখলমুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর হেলিপ্যাড নির্মাণের জন্য ৫ জুম্ম পরিবারকে উঠে যাওয়ার নির্দেশ

রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুম্যা ইউনিয়নের শালবাগান গ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থানীয় ৫ জুম্ম পরিবারকে নিজ বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে হেলিপ্যাড নির্মাণ করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি উপজেলাধীন ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম শালবাগান। এই গ্রামের পাশেই রয়েছে সেগুন বাগান আর্মি ক্যাম্প। ক্যাম্পটি ৩২ বীর দীঘলছড়ি জোন, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটির অধীন। সেই আর্মি ক্যাম্পের জন্য একটি হেলিপ্যাড নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থান থেকে অন্তত ৫ জুম্ম পরিবারকে উঠে যেতে নির্দেশ দেয় সেনাবাহিনী।

গত ২৩ ডিসেম্বর সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, ১টি ঘর ভাঙা হয়েছে এবং বাকি ঘরগুলোও যত দ্রুত সম্ভব ভেঙে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী থেকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ বাবদ মাত্র ১০ হাজার টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেয়া হয় বলে জানা যায়।

ভুক্তভোগী পরিবাগুলো হল- ১. বুদ্ধলিলা চাকমা, পীং- অজ্ঞাত, ২. পানদুগুলো চাকমা, পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা, ৩. লেঙপেদা চাকমা, পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা, ৪. প্রকধন চাকমা, পীং- অজ্ঞাত, ৫. সেবক চাকমা, পীং- নাগা চাকমা। তাদের সকলের বাড়ি ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের শালবাগান গ্রামে।

বরকলে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ধান্য জমি বেদখলের চেষ্টা

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নে সেটেলার বাঙালিরা দলবেধে জুম্মদের ধান্য জমিতে ধান লাগিয়ে জমি বেদখলের চেষ্টা করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ বরকল উপজেলার ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের গরুছড়া গ্রামে আনুমানিক সকাল ১১ টার সময় ১৪/১৫ জনের একদল সেটেলার বাঙালি জুম্মদের রোপণ করা ধান তুলে দিয়ে সেখানে তারা ধান রোপণ শুরু করে। এসময় জমির মালিক ও এলাকাবাসীরা বাধা দিতে গেলে তাদের মারতে সেটেলার বাঙালিরা তেড়ে আসে। এতে উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে সেটেলার বাঙালিরা সেখান থেকে চলে যায়।

জমির মালিকগণ হলেন- ১. মহারানী চাকমা (৫০), স্বামী-মৃত সুন্দর মনি চাকমা, তার জমির পরিমাণ- ১.৫ একর; ২. দয়া ধন চাকমা (৩৬), পীং-মৃত বিজয় মনি চাকমা, তার জমির পরিমাণ- ১ একর; ৩. লক্ষ্মী বাবু চাকমা (২৮), পীং-মৃত বিজয় মনি চাকমা, তার জমির পরিমাণ- ১ একর।

উল্লেখ্য, এই জমি এর আগেও সেটেলার বাঙালিরা বেদখলের চেষ্টা করে বলে জানা যায়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালে উত্তম কুমার কার্বারি বাদী হয়ে রাঙ্গামাটি জেলা জজ আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং ২০১৬ সালে আদালত বাদী পক্ষের দিকে মামলার রায় দেন। তারপরেও সেটেলার বাঙালিরা আদালতের রায় অমান্য করে পুনরায় দলবল নিয়ে উক্ত জায়গাটি দখলের চেষ্টা করছে।

বেদখলের চেষ্টাকারী সেটেলার বাঙালিরা হল- ১. খলিল (৫০), পীং- পনু মিয়া, ২. পনু মিয়া (৮০), পীং- জনাব আলি, ৩. কামাল (২৭), পীং- খলিল, ৪. সোহাগ (৩২), পীং- সবুর তালুকদার, ৫. হাবিবুর (৪৫), পীং- অজ্ঞাত, ৬. দুখু মিয়া (৩০), পীং- আকরাম ফকির, ৭. রাজু (৩০), পীং- অজ্ঞাত, ৮. ফরিদ (৩০), পীং- মিহির উদ্দিন, ৯. সবুজ (৩০), পীং- অজ্ঞাত, ১০. গোলাম রসুল (৩০), পীং- মিজান, ১১. কামরুল (৩৫), পীং- অজ্ঞাত, ১২. সুমন (৩৫) পীং- অজ্ঞাত, ১৩. সাকু (২৮), পীং- অজ্ঞাত, ১৪. আরিফ (২২), পীং- আকবর, ১৫. শাহিন (২৫), পীং- অজ্ঞাত। তাদের সকলের বাড়ি ভূষণছড়া ইউনিয়নের গরুছড়া সেটেলার বসতি এলাকায়।

কাপ্তাই-বিলাইছড়ি সড়ক নির্মাণের ফলে দুই জুম্ম গ্রামবাসী উচ্ছেদের শিকার

রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগড় পাড়া বাজার হতে বিলাইছড়ি উপজেলা সদর পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের ফলে কাপ্তাই উপজেলার চিৎমরম ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের আজাছড়ি ভাঙামুড়া পাড়া এলাকায় দুই জুম্ম গ্রামবাসী উচ্ছেদের শিকার হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। গত ১১ জানুয়ারি ২০২৪ সড়ক নির্মাণকারীরা ট্রাক্টর দিয়ে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে বলে জানা যায়।

ভুক্তভোগী দুই গ্রামবাসী হলেন- রহেজয় তঞ্চঙ্গ্যা (৪৯), পীং-মৃত দাইগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা এবং বাদল্যা তঞ্চঙ্গ্যা (৬৫), পীং-বারেয়ং তঞ্চঙ্গ্যা। যুগ যুগ ধরে তারা ঐ জায়গায় বসবাস করে আসছেন বলে জানা গেছে। হতদরিদ্র উক্ত দুই পরিবার বর্তমানে কনকনে শীতে খোলা আকাশের নীচে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্পের অধীনে কাপ্তাই উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)-এর তত্ত্বাবধানে এই সংযোগ সড়ক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পরিবারগুলো উচ্ছেদ হওয়ার বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে উক্ত সড়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার বিপাস চাকমার সঙ্গে যোগাযোগ হলে তিনি উচ্ছেদকৃত বাড়ির মালিকের ছবি ও

আইডি কার্ড এর ফটোকপি সংগ্রহ করে নিয়ে যান বলে জানা গেছে। কিন্তু এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত উচ্ছেদকৃতদের কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

জুরাছড়িতে সেনামদদে বহিরাগত সেটেলার কর্তৃক জুম্মর ভূমি বেদখলের চেষ্টা

রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় স্থানীয় সেনাবাহিনীর মদদে একদল বহিরাগত মুসলিম সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্মর ভূমি বেদখলের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম হিমায়ন চাকমা, পীং-মৃত কল্প চাকমা, ঠিকানা- উপজেলা সদর এলাকা। তার জায়গার পরিমাণ ০.২০ একর, যা জুরাছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশে অবস্থিত। জায়গাটি হিমায়ন চাকমার পৈতৃক সম্পত্তি বলে জানা গেছে। সম্প্রতি হিমায়ন চাকমা তার উক্ত স্থানে একটি সাধারণ বাড়ি নির্মাণ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে ৫ জন বহিরাগত মুসলিম সেটেলার বাঙালি হিমায়ন চাকমার উক্ত জায়গাটি বেদখলের উদ্দেশ্যে জায়গাটির চারিদিকে খুঁটি পুঁতে দেয়। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর জায়গার মালিক সহ জুম্ম এলাকাবাসী সেখানে উপস্থিত হয়। উভয়পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এক পর্যায়ে জুম্মরা পোঁতা খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলে দিলে বেদখলের চেষ্টাকারী সেটেলাররা স্থানীয় যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পে গিয়ে বিষয়টি জানায়। বেদখলের চেষ্টাকারী সেটেলাররা হল- (১) মোঃ সিরাজ (৩২), পিতা-অজ্ঞাত, পেশায় দিনমজুর ও খুচরা তৈল ব্যবসায়ী; (২) মোঃ সোহেল (৩০), পিতা-অজ্ঞাত, পেশায় করাট কল মিস্ত্রি; (৩) মিঠুন (২৭), চায়ের দোকানদার; (৪) মোঃ ফয়সাল (২৯), পিতা-অজ্ঞাত, পেশায় কাপড় দোকানদার ও (৫) নাম জানা যায়নি।

এর কিছুক্ষণ পরই নিকটবর্তী যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোশাররফ এর নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। আরও কয়েক মিনিট পর বনযোগীছড়া সেনা জোনের জোন কমান্ডার লে: কর্নেল জুলকিফলী আরমান বিখ্যাত পিএসসি সেখানে এসে উপস্থিত হন বলে জানা যায়।

এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন মোশাররফ এর নেতৃত্বে যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ভূমি বেদখলে প্রতিবাদকারী নারী-পুরুষদের মধ্যে থেকে ৫ জন জুম্মকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। এসময় অন্যান্য প্রতিবাদকারী জুম্মরাও তাদের পিছু পিছু যায়। ক্যাম্পের ফটকে পৌঁছলে সেনা সদস্যরা সবাইকে সেখানে থামতে বলে এবং ধরে আনা ৫ জনকে নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলে। দীর্ঘক্ষণ সেভাবে থাকার পর দুপুরের দিকে এলাকাবাসীরা দুপুরের খাবার খেতে বাড়ি ফিরে আসে।

অপরদিকে ধরে নিয়ে আসা ৫ জুম্মকে সেনা সদস্যরা এক পর্যায়ে ক্যাম্পের ভেতরে নিয়ে ব্যাপক নির্যাতন চালায় বলে জানা যায়। পরে নির্যাতনের শিকার ৫ জনকে জুরাছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানা যায়।

সেনা নির্যাতনের শিকার উক্ত ৫ জন সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও যুবলীগেরই কর্মী বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে একজন জনপ্রতিনিধিও রয়েছেন।

তারা হলেন- (১) পল্লব দেওয়ান (৪৮), পিতা-অমৃত লাল দেওয়ান, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, জুরাছড়ি থানা আওয়ামী লীগ ও ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বার; (২) সজীব চাকমা (৩২), পিতা-বিপ্লব চাকমা, গ্রাম-বরইতুলি, ৩নং ওয়ার্ড, ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়ন এবং তিনি সাধারণ সম্পাদক, জুরাছড়ি থানা যুবলীগ; (৩) অনুপম চাকমা (৫৫), পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম-ধামাই পাড়া, তিনি ২নং বনযোগী ছড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি; (৪) মিন্টু চাকমা (৩২), পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম-কুসুমছড়ি, ৯নং ওয়ার্ড, ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়ন, তিনি ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও (৫) রন্টু চাকমা (৩৮), পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম-বরইতুলি, তিনি জুরাছড়ি থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

বিলাইছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মর ভূমি বেদখলের ষড়যন্ত্র

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের সেটেলার বাঙালিরা পার্শ্ববর্তী জুম্মদের ধান্যজমি বেদখলের ষড়যন্ত্র করছে বলে খবর পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সেটেলার বাঙালিদের একটি দল মোহাম্মদ মনির হোসেনের নেতৃত্বে কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের রেইংখ্যং শাখা বনবিহারের পশ্চিম পাশে অবস্থিত ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার জ্ঞান রঞ্জন তালুকদারের রেকর্ডীয় ৫-৬ কানি (প্রায় ২.০০ একর) পরিমাণ ধান্য জমিতে ধান রোপণের চেষ্টা করে।

কিছুদিন আগে জ্ঞান রঞ্জন তালুকদারের লোকজন উক্ত জমিতে ধান লাগাতে গেলে মোহাম্মদ মনির হোসেনের নেতৃত্বে একদল সেটেলার বাঙালি বাধা প্রদান করে। কিন্তু এর দুইদিন পর সেটেলার বাঙালিরা মেম্বার জ্ঞান রঞ্জন তালুকদার ও আশেপাশের জুম্মদের জমিতে ধান লাগানোর চেষ্টা করে। তখন জ্ঞান রঞ্জন তালুকদারসহ জমির মালিকরা এসে সেটেলার বাঙালিদের ধানা লাগাতে বাধা প্রদান করে।

জানা গেছে, গত বছরও (২০২৩ সালে) সেটেলার বাঙালিরা বেদখলের উদ্দেশ্যে উক্ত জায়গায় লাল পতাকা স্থাপন করে। তবে পরে স্থানীয় ৩২ বীর দীঘলছড়ি সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জায়গায় ধান না লাগাতে উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তারপরও সেটেলার বাঙালিরা জমিগুলো বেদখল ও অবৈধভাবে চাষাবাদের উদ্দেশ্যে জোরজবরদস্তি করে ধান লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

এছাড়া আরো জানা গেছে, সেটেলার বাঙালিরা ষড়যন্ত্র করে নামমাত্র টাকা দিয়ে এবং হুমকিধামকি দিয়ে ১২১নং কেংড়াছড়ি মৌজার হেডম্যান সমতোষ চাকমার মৌজাধীন বিভিন্ন জায়গা বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। অপরদিকে, মাত্র কয়েকদিন আগে সেটেলার বাঙালিদের একটি দল ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে রাম চাকমা নামে এক জুম্ম গ্রামবাসীর ধান্য জমিতে ধান লাগাতে যায়। ধান লাগানোর সময় কুতুবদিয়া মৌজার হেডম্যান সাধন বিকাশ চাকমাসহ প্রতিবেশী জুম্মরা বাধা দিলে পরে সেটেলার বাঙালিরা সেখান থেকে চলে যায়।

রুমায় পলিপাড়া গ্রাম উচ্ছেদের চেষ্টা

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলা সদরে ভূমিদস্যু বাথোয়াইঅং মারমা গং কর্তৃক পলিপাড়া গ্রাম উচ্ছেদের চেষ্টার অভিযোগ তুলে পলিপাড়া গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মানববন্ধন শেষে প্রধানমন্ত্রী, উপজেলা নির্বাহী কর্তকর্তাসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের বরাবরে এ ব্যাপারে আবেদনপত্রও প্রদান করা হয়েছে।

সকালের দিকে রুমা উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সম্মুখে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক নারী ও পুরুষ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ঘন্টাখানেক স্থায়ী মানববন্ধন অনুষ্ঠানের পর গ্রামবাসীরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বরাবরে এ ব্যাপারে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন।

এছাড়াও গ্রামবাসীরা উক্ত আবেদনপত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, বোমাং সার্কেলের চীফ ও বান্দরবান জেলা প্রশাসকের বরাবরে প্রেরণ করেন বলে আয়োজকরা জানান।

আবেদনপত্রে বাথোয়াইঅং মারমা (৬৭), গ্রাম-বগামুখ পাড়া এবং তার সঙ্গী থুইনুচিং (৫৭), গ্রাম-উজানীপাড়া নদীর পাড়, ক্রা থুই চিং মারমা (৪৫), গ্রাম-মনজয় পাড়া, রীনা চাকমা (৩৫), গ্রাম-উজানী পাড়া ও বীনা চাকমা (৩০), গ্রাম-উজানী পাড়া-কে ভূমিদস্যু হিসেবে উল্লেখ করে তারা গ্রামবাসীদের উচ্ছেদের চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করা হয়।

গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে উথোয়াই মং মারমা স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে বলা হয়, 'দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন ১৯০০ এর আওতাধীন হেডম্যানশীন চালু হওয়ার পূর্ব থেকে পলিপাড়া গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অত্র মৌজার প্রথম হেডম্যান প্রয়াত মংসাউ হেডম্যান উক্ত গ্রামের বাসিন্দা। স্মরণাতীত কাল থেকে বংশপরম্পরায় এই গ্রামের মানুষ বসবাস করিয়া আসিতেছে।'

আবেদনপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়, 'উপরোক্ত ভূমিদস্যু/প্রতিপক্ষগণ স্মরণাতীতকাল থেকে স্থিত গ্রামের জমিকে নিজেদের নামীয় ২৯নং হোল্ডিং এর জমি দাবি করিয়া জোরপূর্বক গ্রাম উচ্ছেদ ও বেদখলের অপচেষ্টা করিয়া আসিতেছে।'

জানা গেছে, ইতিপূর্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এব্যাপারে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত প্রবীণ ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পলিপাড়া গ্রামটি প্রতিপক্ষের দাবিকৃত ২৯নং হোল্ডিং-এর জমি নয় বলে মতামত প্রদান করেন। তারপরও বাথোয়াইঅং মারমা ও তার সঙ্গীরা গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ গ্রামবাসীদের মধ্যে ১২ জনের বিরুদ্ধে উকিল নোটিশ পাঠান।

গ্রামবাসীরা তাদের আবেদনপত্রে আরও বলেন, 'উক্ত গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামবাসীদের জীবন-জীবিকা, বাসস্থান ও সন্তানের শিক্ষা গ্রহণের উপায়-অবলম্বন। এহেন পরিস্থিতিতে পলিপাড়াবাসী নিতান্ত নিরুপায়। গ্রামছাড়া হবার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।' আবেদনে গ্রামবাসীদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদের অপচেষ্টা বন্ধ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

খাগড়াছড়িতে সেটেলার বাঙালি কম্পিউটার প্রশিক্ষক কর্তৃক এক ত্রিপুরা ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলা সদরস্থ একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মো. কাউসার হোসেন (৩০) নামে একজন সেটেলার বাঙালি কম্পিউটার প্রশিক্ষক কর্তৃক এক কলেজ পড়ুয়া ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ৩১ অক্টোবর ২০২৩ খাগড়াছড়ি সদরের শান্তিনগরস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা শামছুল হক আইসিটি পয়েন্ট নামের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কক্ষে এ ঘটনা সংঘটিত হয় বলে জানা যায়। ধর্ষণের চেষ্টাকারী মো. কাউসার কোচিং সেন্টারের পরিচালক মোঃ রিয়াজ উদ্দীনের সম্পর্কে শ্যালক বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী ছাত্রীটি প্রতিদিনের ন্যায় ঐদিন সকাল ৮ ঘটিকার সময় কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য আইসিটি সেন্টারে যায়। তখন ধর্ষণ চেষ্টাকারী মোঃ কাউসার ভুক্তভোগী ঐ ছাত্রীকে সকাল ৭টার সময় হতে অপেক্ষা করে আছে বলে হাত ধরার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে মো. কাউসার অতর্কিতভাবে পেছন দিক থেকে জোরপূর্বক জড়িয়ে ধরে। এতে ওই ছাত্রী চিৎকার করলে পাশের রুমে থাকা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মোঃ রিয়াজ উদ্দিন এগিয়ে যান এবং ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং ভুক্তভোগী নারীকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়। ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

এক পর্যায়ে ভুক্তভোগী ছাত্রী ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরাম (টিএসএফ) নেতৃবৃন্দকে বিষয়টি জানালে টিএসএফ এর নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভুক্তভোগী নারী এবং ধর্ষণ চেষ্টাকারী মোঃ কাউসারকে খাগড়াপুর ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামের অফিসে নিয়ে যায়।

পরবর্তীতে ধর্ষণ চেষ্টাকারী মোঃ কাউসারকে উক্ত আইসিটি কোচিং সেন্টার থেকে বহিঃষ্কার করা হবে বলে জানায় আইসিটি কোচিং সেন্টারের প্রদান মোঃ রিয়াজ উদ্দীন। উক্ত কোচিং সেন্টার পরিচালনা করেন মোঃ রিয়াজ উদ্দীন এবং একই সেন্টারে পাশের রুমে ধর্ষণের চেষ্টাকারী মোঃ কাউসার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি স্কুলছাত্রী অপহরণের শিকার

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের সেটেলার বাঙালি যুবক মোঃ বাবু কর্তৃক বীরেন্দ্র কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১০ জানুয়ারি ২০২৪ ভুক্তভোগী বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে বি কে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য স্কুলে যায়। এসময় দুপুর ১২টার সময় স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে গোমতি বাজার রাস্তা থেকে সেটেলার মোঃ বাবু স্কুল ছাত্রিটিকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় বলে খবর পাওয়া যায়। পরে স্কুল ছাত্রীটি (লাফি ত্রিপুরা) বাড়িতে ফিরে না আসলে তার বাবা বাদী হয়ে মাটিরাঙ্গা থানায় নিখোঁজ ডায়রি করেন।

অপহরণকারী মোঃ বাবু গোমতি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের তাকাল মনি পাড়ার মোঃ লাল কাশেমের ছেলে বলে জানা গেছে।

অপহরণের শিকার ছাত্রী- লাফি ত্রিপুরা, পীং- মতিন কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম- তাকাল মনি পাড়া, ইউনিয়ন- গোমতি, ৭নং ওয়ার্ড। সে গোমতি বীরেন্দ্র কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে দুপুরে মহালছড়ি সদর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের যৌথখামার চৌংড়াছড়ি এলাকায় দুজন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম নারীকে (৫৫) ধর্ষণের চেষ্টার খবর পাওয়া গেছে।

সেদিন দুপুর ২টার সময় ভুক্তভোগীর স্বামী বাড়িতে কাজ করছিলেন আর তার স্ত্রী পানি আনতে ছড়ায় যান। এ সময় ভুক্তভোগী নারীকে একা পেলে মো. শাহাদাত (২২), পিতা-মো. হাবিবুর রহমান নামে সেটেলার কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। অনেক ধস্তাধস্তির পর ভুক্তভোগী নারী ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। সেটেলারের বাড়ি মহালছড়ির কাটিং টিলায়। তার পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত আনসার সদস্য বলে জানা গেছে।

সংগঠন সংবাদ

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে আলোচনা সভা

গত ৫ নভেম্বর ২০২৩ সকাল ১০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমির অডিটোরিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির উদ্যোগে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সাংগঠনিক সম্পাদক মনি চাকমার সঞ্চালনায় এবং কেন্দ্রীয় সদস্য নতুন মালা চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজীবন সংগ্রামী নারী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য মাধবীলতা চাকমা। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। অন্যান্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার সভাপতি শ্রী প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, এমএন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য সোনারিতা চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুবিনা চাকমা।

প্রধান অতিথি শ্রীমতি মাধবীলতা চাকমা, তিনি শুরুতেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিবারের স্মৃতিচারণ করে বলেন, আত্মগোপনে চলে যাওয়ার পর এম এন লারমার সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠে। লারমা ছিলেন একজন সৎ, সাহসী, সহনশীল, ধৈর্যশীল, প্রকৃতি প্রেমী এবং ক্ষমাগুণের অধিকারী। তিনি বলেন, এম এন লারমার মত সকলের মধ্যে শিক্ষা, ক্ষমা ও পরিবর্তনের গুণাবলী থাকতে হবে। নারী পুরুষ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ত্যাগের মহিমায় সামনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শকে ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেন, নভেম্বর মাসের এই দিনটি জুম্ম জনগণের একটি হৃদয় বিদারক দিন। এই দিনে বিভেদপন্থীরা মহান নেতাকে হত্যা করেছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, চোখের সামনে নিজের ভিটেমাটি কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সরকার যা ইচ্ছা তা করে যাচ্ছে, তার পরেও জুম্ম জনগণ আন্দোলনে আসতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। তৎকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল বুঝতে চায়নি।

তিনি আরও বলেন, এম এন লারমার মধ্যে দূরদর্শী চিন্তা ছিল বিধায় ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে জাগিয়ে আন্দোলনমুখী করেছিলেন। এম এন লারমা ছিলেন আজীবন ত্যাগী, সংগ্রামী, সৎ, নিষ্ঠাবান, আদর্শবান বিপ্লবী নেতা। কুচক্রীরা সেদিন লারমাকে দেশীয় এবং বিদেশী চক্রান্ত করে হত্যা করেছিল ঠিকই কিন্তু লারমার আদর্শকে হত্যা করতে পারে নাই।

তিনি সমবেত কর্মীদের প্রতি আহ্বান রেখে বলেন, জুম্ম জনগণের মধ্যে ভুল চিন্তাধারা থাকলে আন্দোলন এগিয়ে নেয়া যায় না। পার্টিকে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে একত্রিত করতে হবে। কর্মীদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ লালসা

পরিহার করে সকলকে ত্যাগের মহিমায় এগিয়ে আসতে হবে। নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রেখে লড়াই করতে হবে। পার্টির মধ্যে বিশ্বস্ত, জ্ঞানী-গুনীদের উপস্থিতি প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা চেয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি খোলা চিঠি

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা চেয়ে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি খোলা চিঠি দিয়েছে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন'। গত ৫ নভেম্বর ২০২৩ সংগঠনটির দুই যুগ্ম সমন্বয়কারী মানবাধিকার কর্মী জাকির হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক খোলা চিঠিতে এই আহ্বান জানানো হয়।

নিম্নে পাঠকের পড়ার সুবিধার্থে খোলা চিঠিটি হুবহু তুলে ধরা হলো-

সম্মানিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ,

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনারা সকলে অবগত আছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম আদিবাসী অধ্যুষিত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল। স্মরণাতীত কাল থেকে এই অঞ্চলে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। কিন্তু দেশের সকল জাতিগোষ্ঠীর অবদানে সৃষ্টি হওয়া নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জুম্ম জাতিসহ দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের পরিচয়কে অস্বীকার করা হয় এবং এইসব সমৃদ্ধ আদিবাসী জাতিসমূহকে তাদের অধিকার ও রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়। ফলে এই আদিবাসী জাতিসমূহ নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছে এবং নিজেদের স্বকীয় শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিকাশের মাধ্যমে বহুত্ববাদী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় সামিল হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। এমনি এক বাস্তবতায় দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংঘাতের অবসানে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে তৎকালীন সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। দেশের মানুষ আশা করেছিল, সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে এইসব আদিবাসী জাতিসমূহকে অস্বীকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র যে ঐতিহাসিক ভুল করেছিল তা থেকে মুক্তির পথ কিছুটা হলেও সমাধান দিবে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় ২৫ বছর পেরিয়ে গেলেও এই চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ এখনও বাস্তবায়িত হয়নি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে তার অনন্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও বিকাশের কাজটি এখনো অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলে এখনো ঔপনিবেশিক কায়দায় পাহাড়ী মানুষের উপর সামরিক-বেসামরিক শাসন ও শোষণ অব্যাহত রয়েছে।

সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ,

পার্বত্য সমস্যাকে জিইয়ে রেখে বাংলাদেশের সামগ্রিক অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়, এই মর্মবাণীকে উপলব্ধি করে এবং দেশের সচেতন নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াসে ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' বাস্তবায়নে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন' নামে একটি প্লাটফর্ম গড়ে উঠেছে। এই প্লাটফর্মের নানা উদ্যোগ ও আহ্বানে ঢাকাসহ সারাদেশে সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা ইতোমধ্যেই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের চলমান আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের আহ্বান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত সাত (৭) দফা বাস্তবায়নে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা রাখুন:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন করা;
- পাহাড়ে সামরিক কর্তৃত্ব ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের স্থায়ী অবসান;
- আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিকীকরণ ও স্থানীয় শাসন নিশ্চিতকরণে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক যথাযথভাবে ক্ষমতায়িত করা;
- পার্বত্য ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকর করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত থেকে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন করে তাঁদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা;
- দেশের মূলধারার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা;

ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্তরের স্থানীয় সরকারে সমতলের আদিবাসীদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণ ও আদিবাসী জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা।

শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ,

দেশের এক দশমাংশ ভূখন্ডকে ক্রমাগত ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসনের মধ্যে রাখা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের প্রিয় দেশমাতৃকার মূল চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থি। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে সেখানকার জুম্ম আদিবাসী জনগণের ন্যায্যতার পক্ষে দাঁড়িয়ে উক্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিতকল্পে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। রাজনীতিবিদরাই সমাজকে পথ দেখিয়েছেন, নীতির ভিত্তিতে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন । আমরা আশা করি দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের স্ব স্ব দল ও অবস্থান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের পন্থা হিসেবে ১৯৯৭ সালে যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর প্রতি চাপ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকে বেগবান করার জন্য আপনাদের কাছে নিম্নোক্ত চার (৪) দফা আহ্বান তুলে ধরছি:

১. সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন এর পক্ষে উত্থাপিত ৭ দফা দাবিনামার আলোকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করা;

২. প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের উত্থাপিত সাত (৭) দফা দাবিসমূহ গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা;

৩. রাজনৈতিক দল ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আদিবাসী জনগণের বিষয়ে একজন মুখপাত্র ও সাংগঠনিকভাবে সম্পাদকীয় পদ তৈরি করা;

৪. জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের সকল স্তরে আদিবাসীদের দলীয় মনোনয়ন প্রদান করা।

এম এন লারমা ছিলেন একজন মানব মুক্তির নেতা: চট্টগ্রামে ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বক্তারা

গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'সকল প্রকার বিভেদ ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন, জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে অধিকতর সামিল হোন' শ্লোগানে চট্টগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি তাপস হোড়, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক শরীফ চৌহান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক বসুমিত্র চাকমা, সাবেক ছাত্রনেতা এস জে চাকমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি অমর কৃষ্ণ চাকমা বাবু, পিসিপি, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা ও চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হ্লামিও মারমার সঞ্চালনায় স্মরণ সভাতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নরেশ চাকমা।

স্মরণ সভার শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে বীর শহীদদের প্রতি শোক প্রস্তাবনা পাঠ করেন পিসিপি, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অম্লান চাকমা। এরপর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দের এম এন লারমা প্রতিকৃতির সামনে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত স্মরণ সভাটি শুরু হয়।

তাপস হোড় বলেন, 'এম এন লারমা তাঁর কর্ম ও আদর্শ দিয়ে ইতিহাসে স্থান করে গিয়েছেন। তাঁর সে আদর্শকে শোষিত, নিপীড়িত ও অধিকারহারা মানুষের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। আমাদের তরুণদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিতে হবে। লড়াই সংগ্রাম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকেনি। তাই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তরুণদেরকেই অধিকতর সামিল হতে হবে। এম এন লারমার আদর্শকে ধারণ করে পাহাড়ের অধিকারহীন মানুষের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

শরীফ চৌহান বলেন, 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি সমগ্র শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। এম এন লারমা ছাত্র জীবন থেকেই মানব মুক্তির পক্ষে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। জাতীয় সংসদে পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিনিধিত্ব করার সময় তাঁর

বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শোষিত, নিষ্পেষিত, অধিকারহারা মানুষের মুক্তির কথা ফুটে ওঠে। তাই তিনি একজন মানব মুক্তির নেতা। এম এন লারমার শুরু করা আন্দোলনকে সফল করতে গেলে বাংলাদেশের অপরাপর যে সমস্ত মানুষ আদিবাসীদের অধিকারে বিশ্বাস করে তাদেরকে এই আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লারমাকে জাতীয় নেতা হিসেবে পরিচিত করতে গেলে দেশের প্রগতিশীল সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে সামিল থেকে এম এন লারমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হবে।'

বসুমিত্র চাকমা বলেন, 'এম এন লারমা পশ্চাদপদ জুম্ম সমাজকে জাগ্রত করে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিশ্বের প্রান্ত পর্যন্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের তেজোদীপ্ত প্রতীক এম এন লারমা। তিনি বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন জুম্ম জনগণকে। আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভবিষ্যৎ পথ কেমন হবে তরুণ-যুবক সমাজকে নির্ধারণ করতে হবে।'

সাবেক ছাত্রনেতা এস জে চাকমা বলেন, 'বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গভীরে গিয়ে এম এন লারমার দর্শনকে বুঝতে হবে। সৎ, সত্য ও সাহসিকতার মধ্য দিয়ে তরুণদের জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের বিভেদপন্থী ও কুচক্রীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে।'

বরকলে এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও আলোচনা সভা

গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ বরকল উপজেলায় জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। বরকল উপজেলা সদর সহ উপজেলার আইমাছড়া ইউনিয়ন শাখার কমপক্ষে ২০টি গ্রামে ও বড়হরিণা, বরকল, ভুষণছড়া, সুবলং ইউনিয়ন শাখায় একযোগে শোক দিবসটি পালন করা হয়। সকালে প্রভাতফেরি মধ্য দিয়ে ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শোক সভার মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়।

বরকল পিসিপি'র থানা শাখার উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বরকল পিসিপি'র থানা শাখার সভাপতি মিন্টু চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন বরকল উপজেলা চেয়ারম্যান বিধান চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরকল উপজেলার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শ্যাম রতন চাকমা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সুচরিতা চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অপু মিত্র চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতি, মহিলা সমিতি, পিসিপি ও হিল ইউমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ। সভার সঞ্চালনা করেন বরকল পিসিপির সহ-সভাপতি ইলেন চাকমা।

অন্যদিকে, জনসংহতি সমিতির ৫টি গ্রাম কমিটির উদ্যোগে ৬টি গ্রাম এতত্রিত হয়ে বেগেনাছড়ি বৌদ্ধ বিহারে মহান নেতার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গ্রামগুলো হল- বেগেনাছড়ি, বাঙ্গাল বাস্যা, পূর্ব কদম তুলি, পশ্চিম কদম তুলি, দেওয়ান চর, ঢাক ভাঙ্গা।

সভায় রতন চাকমার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনড় চাকমা, প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন চাকমা। এতে সঞ্চালনা করেন করুণাশীষ তালুকদার এবং শোক প্রস্তাব পাঠ করেন কিরন বিকাশ চাকমা।

এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে রাঙ্গামাটিতে প্রভাতফেরি, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও স্মরণ সভা

গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে মহান নেতা এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে সকাল বেলায় প্রভাতফেরি, মহান নেতা ও জাতীয় বীরদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণ সভায় জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি ডা. গঙ্গা মানিক চাকমার সভাপতিত্বে ও ছাত্র যুব বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমার সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিশির চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মনি চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিপন ত্রিপুরা।

স্মরণ সভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নগেন্দ্র

চাকমা। শোক প্রস্তাব পরবর্তী শহীদদের স্মরণে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রধান আলোচক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেন, আমাদের প্রিয় নেতাকে হত্যা নিছক হত্যাকান্ড নয় জুম্মদের আন্দোলনকে হত্যা করার প্রচেষ্টার সমান। এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী যুক্ত রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, সরকার চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে, সেই সময়ে জেনারেল মঞ্জুর বিবিসি নিউজে বলেন শান্তিবাহিনী একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল দল। জেনারেল মঞ্জুর স্বীকার করে বলেছিলেন আমরা রণক্লান্ত। সেই সময় পার্টির গণলাইন ছিল শক্তিশালী তাই শাসকগোষ্ঠী দমিয়ে রাখতে পারেনি। একজন ছোট বাচ্চাও যদি গ্রামে আর্মি দেখে তাহলে তা সহজে পৌছেঁ যেত শান্তিবাহিনীর কাছে, তার কারণ তখন সবাই ঐক্যবদ্ধ ছিল।

তিনি আরও বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে মিথ্যাচার করবেন না। চুক্তির মৌলিক বিষয়গুরো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করে দিন। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিশির চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই আদিকাল থেকে জুম্মরা তাদের নিয়তি ও ভাগ্যকে স্বীকার করে আসছিল। কিন্তু ষাট দশকের পর হতে এমএন লারমা অনুভব করেছিলেন জুম্মদের ভাগ্য ও নিয়তি আমাদেরকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত ১৪ টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে একটি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

লংগদুতে এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, লংগদু থানা শাখার উদ্যোগে 'জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হোন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রনজিত পাড়া, নোয়াপাড়া, রাঙ্গীপাড়া, চিবেরেগা, চাল্যাতুলি, শান্তিনগর, ভূইয়াছড়া, জারুলছড়া, ছোট মাহিল্যা, খাগড়াছড়ি, শীলকাটাছড়া, কেরেঙাছড়ি, কাট্টলীসহ লংগদু উপজেলার বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে।

এই উপলক্ষে বগাচতর এলাকার রনজিত পাড়া ও নোয়া পাড়ার গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে রনজিত পাড়া জয়পুর বনবিহার বেইন ঘর প্রাঙ্গণে সকাল ১০টায় রনজিত পাড়া গ্রাম কমিটির সভাপতি প্রিয় রতন চাকমার সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক রাসেল চাকমার সঞ্চালনায় এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্মরণসভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি, লংগদু আঞ্চলিক পরিচালক মনিব চাকমা, লংগদু থানা কমিটির সদস্য রুপেন চাকমা ও ডেভিদ চাকমা। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এডিশন চাকমা, সদস্য, যুব সমিতি, রনজিত পাড়া গ্রাম কমিটি।

সভায় অতিথি মনিব চাকমা প্রথমে প্রয়াত মহান নেতা এম এন লারমার পরিচিতি তুলে ধরেন এবং পর্যায়ক্রমে তার শিক্ষা জীবন, কর্ম জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও শান্তিবাহিনী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি প্রয়াত নেতা এমএন লারমার আদর্শকে বুকে ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের চলমান বৃহত্তর আন্দোলন ও সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জ্যোতি বিকাশ চাকমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, নোয়াপাড়া গ্রাম শাখা ও বর্তমান মেম্বার, ৬নং ওয়ার্ড, ৪নং বগাচতর ইউনিয়ন, রিটন চাকমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রনজিত পাড়া গ্রাম শাখা ও দেবেন্দ্র চাকমা, সভাপতি, জনসংহতি সমিতি, নোয়াপাড়া গ্রাম কমিটি।

এছাড়াও, জনসংহতি সমিতি রাঙ্গীপাড়া গ্রাম কমিটির উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে রাঙ্গীপাড়া গ্রামে বিকাল ২টায় এমএন লারমা'র ছবি অংকন এবং বিকাল ৪টায় রাঙ্গীপাড়া গ্রামের যুবকদের ভলিবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় সকল শহীদদের স্মরণে হাজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফানুস বাতি উড়ানো হয়।

বাঘাইছড়িতে এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়িতে জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩১ নং খেদারমারা ইউনিয়নে এ দিবসটি পালন করা হয়।

সকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাঘাইছড়ি থানা শাখা, মহিলা সমিতি সহ খেদারমারা খেদারমারা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম শাখার পক্ষ থেকে এম এন লারমা সহ শহীদদের স্মরণে শহীদ বেদিতে ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শোক সভার মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়।

ইউনিয়নবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় ৩১ নং খেদারমারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিল্টু চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাচালং সরকারি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ দেওয়ান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঘাইছড়ির চার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, কাচালং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভদ্রসেন চাকমাসহ স্থানীয় বিভিন্ন হেডম্যান, কার্বারী ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে কাচালং সরকারি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ দেওয়ান বলেন, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতিতে ঐতিহাসিক বাঁকে বাঁকে, যুগে যুগে এমন কয়েকজন মহান পুরুষের আবির্ভাব হয় যাঁরা দেশকে, জাতিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। জুম্ম জাতির পথ প্রদর্শক এম এন লারমাও তেমনই একজন মানুষ যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘুমন্ত ১৩ ভাষাভাষী ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং শুধু জাগিয়ে তোলেননি, বেঁচে থাকার পথও দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেন, আজকে এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকীর ৪০ বছরেও অনেকেই এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকীতে যোগ দিতে ভয় পায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে কথা বলতে ভয় পায়। একটি বিশেষ মহল পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কথা না বলার জন্য জুম্মদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে থাকে। কিন্তু আমি তাদের বলতে চাই, ভয়ের কোনো কারণ নেই। যেদিন মহান জাতীয় সংসদে এম এন লারমার শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সেদিন এই দিবসটি বাংলাদেশের আইনে বৈধতা লাভ করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি বিশ্বাস রেখে, দেশের অখণ্ডতাকে স্বীকার করে যেদিন ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির

মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল সেদিনই এই চুক্তিটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে বৈধতা পেয়েছে। কাজেই এই দুইটা দিবস পালন মোটেও অবৈধ নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলা মোটেও রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা বলেন, 'বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে একটু বেশি বিশ্বাস করে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু আজকে চুক্তির ২৫ বছরে এসে দেখি আমাদের হিসাবের খাতাটা যেই খালি, সেই খালিই পড়ে আছে। চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো একটাও বাস্তবায়ন হয়নি। অর্থাৎ প্রতারণা করেছে সরকার। চরম প্রতারণা করেছে আমাদের সঙ্গে।'

বিলাইছড়িতে এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন

গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ বিলাইছড়ি উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি শাখার উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত প্রথম সংসদ সদস্য, জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়।

এইদিন সকাল ৭:০০ ঘটিকায় জমায়েত ও কালোব্যাজ ধারণ, সকাল ৭:৩০ ঘটিকায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পুষ্পমাল্য ও শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ, সকাল ৮:০০ ঘটিকায় শোক প্রস্তাব পাঠ ও সকল শহীদদের স্মরণে ২ মিনিট নিরবতা পালনের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি শাখার প্রতিনিধি উত্তম চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগমন তঞ্চঙ্গ্যা এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন গ্রাম কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ। আলোচনা সভায় বক্তারা প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নীতি-আদর্শের মূল ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন আরো জোরদার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সন্ধ্যায় প্রয়াত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সকল শহীদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফানুস উত্তোলন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জটিল করছে সরকার: ঢাকায় এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে মেনন

গত ১০ নভেম্বর ২০২৩, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় বিকাল ৩:০০ টায় মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, স্মরণ সভা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও প্রতিবাদী গানের আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. রোবায়েত ফেরদৌসের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পালন কমিটির আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। প্রথমেই জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সুলতানা কামালের নেতৃত্বে এম এন লারমার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপরে মহান নেতা এম এন লারমা ও তাঁর সঙ্গে শহীদ সহযোদ্ধাদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সূচনা সঙ্গীত পরিবেশনা করেন সঙ্গীত শিল্পী তুহিন কান্তি দাশ। এরপর এম এন লারমার জীবনী পাঠ করেন জাতীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. স্নিগ্ধা রিজওয়ানা। স্মরণসভায় আরো বক্তব্য রাখেন লেখক ও সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ জাসদ-এর স্থায়ী কমিটির সদস্য নাসিরুল হক নওয়াব, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, জাতীয়

শ্রমিক জোটের সভাপতি সাঈফুজ্জামান বাদশা, ঐক্য ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এস এম সবুর, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফারাহ তানজিন তিতিল বলেন, এম এন লারমা একদিনেই বিপ্লবী হয়ে উঠেননি। তিনি জুম্ম জাতির জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে জুম্ম জাতিকে বাঙালি হিসেবে উল্লেখ করায় তিনি সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন। মূলত জুম্মদেরকে বাঙালি বানানোর বিরুদ্ধেই এম এন লারমা প্রতিবাদ করেন। যার মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় আমরা পাই। তিনি সংসদে শুধু নিজ জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কথা বলেননি, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের কথাও তুলে ধরেছেন।

জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সুলতানা কামাল এম এন লারমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ এমন একটা দেশ হবে যেটা হবে সবার। কিন্তু আমাদের কথার সঙ্গে কাজের কেন ভিন্নতা? আমরা এত ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করলাম কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীতে আমরা সব মানুষকে নিজের করতে পারলাম না।

তিনি আরও বলেন, আমাদের নিজের অধিকারবোধের পাশাপাশি অন্যের অধিকারবোধের কথাও চিন্তা করতে হবে। যেভাবে আমরা মানবাধিকারের ধারণাটি পাই। ব্যক্তির স্বার্থে, দলীয় স্বার্থে আমরা অনেক সাহসী মানুষদের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকেও আমরা ভুলতে বসেছি। আমাদের মহান নেতা এম এন লারমাকে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এম এন লারমার বায়োপিক তৈরি করতে হবে।

লেখক ও সাংবাদিক আবু সাঈদ খান বলেন, এম এন লারমার শোষিতের জন্য সংগ্রাম এখনও জারি আছে। তার দূরদর্শিতার পরিচয় হচ্ছে সবাইকে বাঙালি বলার পরিবর্তে বাংলাদেশী হিসেবে স্বীকৃতির জন্য দাবি তোলা। স্বাধীনতার উত্তর প্রজন্ম আজ অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষদের আলিঙ্গন করে বলেই শ্লোগান তুলছে- তুমি কে আমি কে? বাঙালি আদিবাসী। যা সংবিধানে করা হয়নি। যদিও আমাদের সংবিধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। উল্টো তাদেরকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, উপজাতি করা হয়েছে। বাঙালি মনস্তত্ব থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রথম সংগ্রাম শুরু করেন মহান নেতা এম এন লারমা। দেশটা সব মানুষের, সব ধর্মের হলেও বাঙালিরা সংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগুরু। তাই বাঙালিদেরকে উদারতার পরিচয় দিতে হবে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, এম এন লারমা পড়ালেখার বয়সেই প্রগতিশীল সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি জুম পাহাড়ের মানুষদের কথার পাশাপাশি দেশের নিপীড়িত সকল মানুষের অধিকারের কথাও বলেন। ১৯৯৭ সালে যে পার্বত্য চুক্তি হল সেটি বর্তমান সরকারের সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু এই সরকার বর্তমানে ক্ষমতায় থাকার পরেও চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসনের মাধ্যমে সেখানকার মানুষদের রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় রাখা হয়েছে। সংবিধানে যতক্ষণ না পর্যন্ত আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন করব। এই দায়িত্বটি আমাদের সবাইকে পালন করতে হবে।

বাংলাদেশ জাসদ এর স্থায়ী কমিটির সদস্য নাসিরুল হক নওয়াব বলেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই পার্বত্যবাসীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ গভীর। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাহাড়ী অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির পরেও শান্তি আসে নাই। পাহাড়ের সকল জাতিদেরকে সম্মিলিত করে আরও জোরালো সংগ্রাম করতে হবে।

এরপর এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, এম এন লারমা তাঁর জীবনে ব্যক্তি আকাঙ্খাকে গুরুত্ব দেননি বরং জুম্ম জাতির জন্য সারাজীবন লড়াই করে গেছেন। তিনি জীবনকে উৎসর্গ করেছেন বীরের মত। অনেক জাতির আবাসভূমি আমাদের বাংলাদেশ। আমরা এই পরিচয়টা দিতে দ্বিধান্বিত হই। আমরা বাঙালি বাদে অন্যান্যদেরকে গুরুত্ব দেওয়ার বোধটা সৃষ্টি করতে পারিনি। ঠিক এর বিরুদ্ধেই ছিল এম এন লারমার সংগ্রাম। তিনি শুধু জুম্ম জাতির নয়, বাংলাদেশের নয়, তিনি পুরো পৃথিবীর নেতা। পার্বত্য চুক্তি কিছুটা বাস্তবায়ন হয়েছে। তারপর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থগিত আছে। এই চুক্তিটি বাস্তবায়ন না হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে, বহুজাতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

জাসদ নেতা সাইফুজ্জামান বাদশা বলেন, পার্বত্য চুক্তি হয়েছে কিন্তু চুক্তির বাস্তবায়ন নাই। কেন এইরকম হবে? এর কি কারণ? এই যে বৈষম্য, এটাই অশান্তির মূল কারণ। বাঙালি আদিবাসী সকলেই যেন একজন মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে পারি। বাঙালি-আদিবাসীর ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবো।

ঐক্য ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এস এম সবুর বলেন, আমরা যখন কোনো মানুষের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করি তখন তাঁর কৃতকর্মের বিষয়গুলো আলোচনা করি এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম পূরণ করে তা নিয়ে ভাবি। এম এন লারমা তিনি তাঁর ভাষার অধিকার, ভূমির অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার জাতীয়ভাবে দাবি করেছেন। তিনি এইসবের ক্ষেত্রে সফল। কেননা তিনি আদিবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ

করেছেন, প্রয়োজনে অস্ত্র কাঁধে তুলে নিয়েছেন। একটা জাতি যদি তার ভাষার স্বীকৃতি, সংস্কৃতির স্বীকৃতি না পায় পরে দ্রোহী হয়ে ওঠে। দ্রোহ থেকে বিদ্রোহ এবং সবশেষে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়। সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরা এম এন লারমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এবং তাঁর যে অসমাপ্ত কাজ আমাদের সবাইকে সমাপ্ত করতে হবে।

এরপর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি মহান নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আমি তাঁকে জাতীয় নেতা হিসেবে বলি। কারণ তিনি শুধু আদিবাসীদের কথায় নয় বরং পুরো বাংলাদেশের অবস্থাকে কিভাবে পরিশুদ্ধ করা যায় সেইসব কথায় তুলে ধরেছিলেন। পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়িদের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা এখন বিনষ্ট করার পায়তারা করা হচ্ছে। ইউপিডিএফ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে কেএনএফ নামে একটি সশস্ত্র গ্রুপের জন্ম দেওয়া হয়েছে। এভাবেই পাহাড়ের অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ করা হচ্ছে। আমি আশা করি নতুন প্রজন্ম এম এন লারমার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাবে।

আলোচকদের বক্তব্যের পরেই কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মহান নেতা এম এন লারমার স্মরণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, এএলআরডি, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক সংসদ, দীপক শীলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সাভারের শ্রমিক বন্ধুরা, বাসদের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ জাসদ, বাংলাদেশ যুব মৈত্রী, কাপেং ফাউন্ডেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ যুব মৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরাম, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, সামাজিক আন্দোলন, ঐক্য ন্যাপ, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্রাবাস, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ ও বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট কলেজের শিক্ষকবৃন্দ।

চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

'শ্রমজীবী জনতার মুক্তির মিছিলে নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রতিবাদী শ্লোগানে চিরকাল ধ্বনিত হবে এম এন লারমার নাম' শ্লোগানে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে মহান নেতা এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়

এবং পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম চান্দগাঁও থানা কমিটির উদ্যোগে স্মরণসভা আয়োজন করা হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ডিসান তঞ্চঙ্গ্যা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমা, সহ-সাধারণ সম্পাদক জিসন চাকমা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সোনাবী চাকমা ও আদিবাসী মহিলা ফোরামের সভাপতি চিজিপুদি চাকমা। সঞ্চলনা করেন ফোরামের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক প্রসেনজিৎ চাকমা এবং সভাপতিত্ব করেন সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা।

স্মরণ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিসন চাকমা। এম এন লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক সুজন চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সহ-সভাপতি ডিসান তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, ১০ই নভেম্বর, ৮৩ জুম্ম জনগণের একটি শোকাবহ দিন ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। ১৯৮৩ সনের আজকের এ দিনে সেই গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চার কুচক্রী মহলের হাতে মহান নেতা এম এন লারমাসহ তাঁর আট সহযোদ্ধা নির্মমভাবে শহীদ হন। তাই এ দিনটি সমগ্র জুম্ম জনগণের একটি কালো দিন। তিনি সবাইকে সামনের লড়াই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, ১০ই নভেম্বর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এম এন লারমার হাত ধরেই জুম্ম জনগণের আন্দোলন শুরু হয়। তাই আজকের দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা প্রতিটি জুম্ম জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আগামী দিনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের লড়াই সংগ্রামে তরুণ প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি সোনাবি চাকমা বলেন, এম এন লারমাকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়নি, কিন্তু এম এন লারমা আমাদের মাঝে এখনো জীবিত আছেন। আজকে যারা আমরা

শহরে জীবনযাপন করছি বেশির ভাগ তরুণ প্রজন্মের এমএন লারমার জীবন ও সংগ্রাম জানা থাকা দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

রাবিতে পিসিপি ও রাবি জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের উদ্যোগে নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

গত ১৭ নভেম্বর ২০২৩ 'উজ্জীবিত হোক সকল তরুণ প্রাণ, চেতনাতে মিশে যাক জুম পাহাড়ের ঘ্রাণ' শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের উদ্যোগে নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রুয়েট, রাজশাহী মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ণরত ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ এবং ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়ণরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২৩ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ সুলতান-উল-ইসলাম। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রমিত চাকমা, রমেন প্লাস কোচিং সেন্টারের পরিচালক রমেন্টু চাকমা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষার্থী ত্রিপিকা চাকমা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি জীনিচ চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সুরেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী অতিশ চাকমা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নবীনদের উদ্দেশ্যে বরণমাল্য পাঠ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুরেন্স বিভাগের শিক্ষার্থী মার্টিনা দেবী তঞ্চঙ্গ্যা এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থী সুস্মিতা চাকমা। এসময় আলোচনা সভায় নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী জেমি সাইলুক এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী সোহেল চাকমা এবং ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী অনাবিল চাকমা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ সুলতান-উল-ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ একটি বহুজাতির বহুসংস্কৃতির দেশ। এদেশে বাঙালি জনগোষ্ঠী ছাড়াও ভিন্ন ভাষাভাষীর বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক আদিবাসী শিক্ষার্থী আমাদের এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। আমি প্রত্যাশা করি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত এ সকল আদিবাসী শিক্ষার্থী তাদের মেধা-মনন এবং সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে তাদের নিজ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করবে।

তিনি আরো বলেন, আদিবাসী যে সকল শিক্ষার্থী রয়েছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর প্রধানত আবাসন সংকটের সম্মুখীন হয়ে থাকে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যতটা সম্ভব আদিবাসী শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকটের পাশাপাশি অন্যান্য যেসকল সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধান করার। এছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের কোটার সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা সহ যেকোনো সমস্যার সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশা ব্যক্ত করেন।

সমাপনী বক্তব্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি জীনিচ চাকমা বলেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জন্ম থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রক্ষার আন্দোলনের পাশাপাশি আদিবাসী শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে। আজকে এই নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তারই একটি অংশ। আজকে এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এসেছেন আপনাদের সকলকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মুক্তির সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাই।

পরিশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার মাধ্যমে নবীন বরণ, বিদায়ী সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২৩ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার ২৫তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ১৮ নভেম্বর ২০২৩ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' শ্লোগানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার ২৫তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি'র রাঙ্গামাটি শহর শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব ম্যানন চাকমার সঞ্চালনায় এবং আহ্বায়ক ম্যাগলিন চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোনারিতা চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী সকল বীর শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। নীরবতা পালন শেষে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি শহর শাখার সদস্য সুরেশ চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুয়েল চাকমা বলেন, আমরা ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখতে পাই প্রত্যেকটা জাতির প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের অধিকার আদায়ের যে লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস তার পেছনে ছিল তরুণ ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে এই ভূমিতে দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই ছাত্র ও যুবসমাজ। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণ ছাত্রসমাজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তির আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অবস্থা ছিল চুক্তির পরবর্তী সময়ে এসেও সেই একই অবস্থা বিরাজমান রয়ে গেছে। আমরা আশা করেছিলাম চুক্তির পরে আমাদের যে মৌলিক অধিকার সেই অধিকার ফিরে পাবো, কিন্তু তা দেখা যায় না।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি নিপন ত্রিপুরা বলেন, আমাদের হৃত অধিকার ফিরে পেতে তরুণ ছাত্র সমাজের হাল ধরতে হবে। পিসিপি'র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধারণ জুম্ম ছাত্রসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ সমগ্র জুম্ম জনগণের, তা সত্ত্বেও এই সংগঠনে সব জুম্ম ছাত্র আসতে চায় না। তারাই আসতে পারে যারা মহান পার্টি জনসংহতি সমিতির আন্দোলন সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করতে পারে।

আলোচনা সভা শেষে ম্যাগলিন চাকমাকে সভাপতি, সুরেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সনেট চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ জন সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি শহর শাখার কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যা।

পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকায় ছাত্র-যুব সমাবেশ ও মিছিল

গত ২৯ নভেম্বর ২০২৩, সকাল ১১ টায় ঢাকার শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে আদিবাসী ছাত্র যুব সংগঠনসমূহ একটি ছাত্র-যুব সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে।

সমাবেশে বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অলিক মৃ'র সভাপতিত্বে ও পিসিপি'র ঢাকা মহানগর শাখার তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হ্লামংচিং মারমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সভাপতি আন্তনী রেমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি নিপন ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি চন্দ্রিকা চাকমা, ছাত্র

ইউনিয়নের সভাপতি দীপক শীল, ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি অতুলন দাশ আলো, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জন জেত্রা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস' কাউন্সিল, ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যংজ মারমা প্রমুখ।

সমাবেশে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি নিপন ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান রাজনৈতিক সমস্যাসহ সকল সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। এই ২৬ বছরে চুক্তির ২৫টি ধারা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হলেও ১৮টি ধারা আংশিকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে ও ১৯টি ধারা বাস্তবায়ন হয়নি। চুক্তিকে নিয়ে সরকারের এই ধরনের টালবাহানা, অপপ্রচার কখনও সুফল বয়ে আনবে না।

সংহতি বক্তব্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি দীপক শীল বলেন, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমরা মনে করেছিলাম আদিবাসীরা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। আজকে চুক্তির ২৬ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে আমাদেরকে আজকেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিছিল, সমাবেশ করতে হচ্ছে। এতে সরকারের লজ্জা হওয়া দরকার যে, আমরা এই বর্ষপূর্তিতে আনন্দ উৎসব করতে পারছি না।

তিনি আরো বলেন, পাহাড়ে যত হত্যা, খুন, ভূমি বেদখল সবকিছুতে সেনাবাহিনী যুক্ত। চুক্তি করে লাভ হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের। তার বদলে পাহাড়ের জনগণ কিছুই পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি কমিশন গঠিত হলেও এই পর্যন্ত সেখানে জমা হওয়া কোনো আবেদনের একটিও ফয়সালা হয়নি। গোবিন্দগঞ্জে বাগদাফার্মে সান্তাল হত্যাকান্ডের মূল মাষ্টার মাইন্ড আবুল কালাম আজাদ। এইবারে আওয়ামী লীগ সরকার তার হাতে নমিনেশন পেপার ধরিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে আওয়ামীলীগ সরকার এভাবে আদিবাসী বিরোধীদের সংসদে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করছে।

সংহতি বক্তব্যে বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি অতুলন দাশ আলো বলেন, এই রাষ্ট্র নির্মাণে বাঙালির যেমন রক্ত আছে, তেমনি আদিবাসী মানুষেরও রক্ত আছে। বিগত ৫২ বছরে যারা ক্ষমতায় এসেছে, তারাই আদিবাসীদেরকে ব্যবহার করেছে। সরকারের আজ লজ্জা হওয়ার কথা। চুক্তির আজ ২৬বছর পরেও এই চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সমাবেশ করতে হচ্ছে আমাদের। কিন্তু সরকার যদি নিজেদেরকে আদিবাসী বান্ধব প্রমাণ করতে চায়, তবে আমি অনুরোধ করব যেন তারা তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করে। শুধু মুলা ঝুলিয়ে আদিবাসীদের ব্যবহার করা থামাতে হবে। অন্যথায় সকল প্রগতিশীল সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবো।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ বলেন, এই পর্যন্ত যারা যারা ন্যায়ের পথে লড়াই করেছেন তাঁদেরকে আমি শ্রদ্ধা জানাই আর যারা ক্ষমতার সিংহাসনে বসে শোষণ করেছেন তাদেরকে আমি ধিক্কার জানাই। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে যেভাবে ভেবেছিলাম তার উল্টোটি এখন দেখতে পাচ্ছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যাচ্ছে। জুম্মদেরকে কেন নিজভূমে পরবাসী করে রাখা

হচ্ছে? সেখানে সেনাশাসন কেন? এই বিষয়গুলো সার্বভৌমত্বের পরিপন্থি।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অলিক মৃ বলেন, আমরা কতদিন শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে কিংবা রাজু ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করব। আমাদের প্রতিবাদ সরকার শুনেও না শুনার ভান করে থাকে। এই দেশের সরকার নির্লজ্জ। কেননা, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি এই সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হলেও তা যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে পারছে না। সরকার চুক্তিতে নামে মাত্র স্বাক্ষর করেছে। বর্তমান সরকারের সঙ্গে যাদের অর্থাৎ জেএসএসের চুক্তি সম্পাদিত হয়ে বর্তমানে সরকার বাস্তবায়ন না করার নানা টালবাহানা নিচ্ছে এবং জেএসসের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাদেরকে ঘরছাড়া করে রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করলেও যথাযথ ক্ষমতা প্রদান না করে উল্টো আঞ্চলিক পরিষদকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সভাপতি অ্যান্তনী রেমা বলেন, আদিবাসীদের সংকট দিন দিন বাড়ছে। নিরাপত্তার অজুহাতে পাহাড়ের জনজীবন কঠিন থেকে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করেছে বর্তমান সরকার। পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলের আদিবাসীদেরকেও অনেক আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা পূরণ করা হয়নি। মধুপুরে ইকোপার্ক করার সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নিজেই গিয়ে সমতলের আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। সমতলে চা শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পায় না। আর কত প্রজন্ম পার হয়ে গেলে আদিবাসীরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে? আর কত বছর পার হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন হবে?

স্বাগত বক্তব্যে বিএমএসসির ঢাকা মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যংজ মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রায় ২৬টি বছর পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পাহাড়ে সেটেলারদের উপদ্রব, সেনাশাসন, নারী নির্যাতন, ভূমি বেদখল সমানে চলছে। এই চুক্তি আমাদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনার জন্য স্বাক্ষরিত হলেও তার বদলে এনেছে হতাশা।

সমাবেশের শেষে সভাপতি অলিক মৃ উপস্থিত সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সমাবেশের পরে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শাহবাগ থেকে টিএসসি ঘুরে অপরাজেয় বাংলা হয়ে কলা ভবন ঘুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে গিয়ে শেষ হয়।

উক্ত মিছিল ও সমাবেশ থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি চন্দ্রিকা চাকমা আদিবাসী ছাত্র যুব সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে ৪ দফা দাবিনামা উত্থাপন করেন। দাবিনামাসমূহ হল: ১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে; ২. পাহাড় থেকে অপারেশন উত্তোরণসহ অস্থায়ী সেনা ছাউনি প্রত্যাহার করতে হবে; ৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কর্মী, সমর্থক, শুভাকাঙ্খী ও তার সহযোগী অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ৪. আদিবাসী নারী ও শিশুদের প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় শান্তি ফিরে আসেনি: চট্টগ্রামে চুক্তির বর্ষপূর্তির সভায় বক্তাগণ

চট্টগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তির আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়িদের জীবনে শান্তি ফিরে আসেনি। এ চুক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে একটি ঐতিহাসিক অর্জন ছিল। পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা দরকার।'

চুক্তি স্বাক্ষর দিবসের একদিন পূর্বে গত ১ ডিসেম্বর ২০২৩ পার্বত্য চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে চট্টগ্রামে র‍্যালি, গণসংগীত পরিবেশন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানটি নগরের জে এম সেন হল প্রাঙ্গণে বিকেল ২:০০ ঘটিকায় শুরু হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক তাপস হোড়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবুল মোমেন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়িদের জীবনে শান্তি ফিরে আসেনি। এ চুক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে একটি ঐতিহাসিক অর্জন ছিল। যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ

শান্তিতে থাকতে চেয়েছিল তখন একটি স্বার্থান্বেষী মহল এটিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পাঁয়তারা চালায়।

তিনি আরো বলেন, এরশাদের আমলে সমতল এলাকা থেকে বাঙালি এনে পার্বত্য অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করানো হয়। এর ফলে পার্বত্য এলাকার জনগণ তাদের অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায় এবং তাদের জায়গা-জমি হারায়। জুম চাষের উপযোগী জমিগুলো দখল হয়। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে স্থায়ী সমাধানের জন্য সরকারকে চুক্তির বাস্তবায়ন করা জরুরি। এভাবেই কেবল আদিবাসীদের জীবনে শান্তির সুবাতাস মিলবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, চট্টগ্রামের সভাপতি অশোক সাহা, কবি ও সাংবাদিক হাফিজ রশিদ খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা, ঐক্য ন্যাপ, চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নরেশ চাকমা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি দিশান তঞ্চঙ্গ্যা এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি বিনিময় চাকমা।

অনুষ্ঠানে গণসংগীত পরিবেশনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সংগঠন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। আলোচনা সভার আগে নন্দনকানন থেকে প্রেসক্লাব হয়ে জে এম সেন হল পর্যন্ত র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তিতে বরকলে গণসমাবেশ

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), বরকল থানা শাখার উদ্যোগে উপজেলা মাঠ প্রাঙ্গনে গণসমাবেশ আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, বড় হরিণা ও ভূষণ ছড়া ইউনিয়নে এলাবাসীর উদ্যোগে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত গণসমাবেশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সবিনয় চাকমার সঞ্চালনায় ও সভাপতি মিন্টু চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বরকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য বিধান চাকমা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সুচরিতা চাকমা, ভাইস চেয়ারম্যান শ্যাম রতন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বরকল থানা কমিটির সাবেক সভাপতি জ্ঞান জ্যোতি চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রনেল চাকমা ও কার্বারি এসোসিয়েশনের সভাপতি নন্দ বিকাশ চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির বরকলের সহ-সভাপতি ইলেন চাকমা।

প্রধান অতিথি বিধান চাকমা বলেন, সরকার ভাগ কর শাসন কর নীতির ভিত্তিতে জুম্মদের মধ্যে যারা সুবিধাবাদী, ক্ষমতা লোভী তাদেরকে ব্যবহার করে চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। এইসব চুক্তি বিরোধী কার্যক্রমকে রুখে দিতে হবে। তিনি সামনের যেকোনো আন্দোলনে জনগণকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

সুচরিতা চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস। দীর্ঘ ২৬ বছরেও পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা জটিল থেকে জটিল আকার ধারণ করছে। আজ চুক্তির পরও নারী সহিংসতা, ধর্ষণ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে।

শ্যাম রতন চাকমা বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। যে সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতি চুক্তি করেছিল সেই আওয়ামীলীগ সরকার একনাগাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, বরং প্রতিনিয়ত চুক্তি লঙ্ঘন করছে।

অন্যদিকে, বরকলের ভূষণছড়া ইউনিয়নের সিএম পাড়া এলাকায়ও বিভিন্ন গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে, শান্তি রাজ চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দয়ানন্দ চাকমা, সহ-সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ভূষণছড়া ইউনিয়ন কমিটি।

এছাড়াও, বরকলের ভূষণছড়া ইউনিয়নের তৈবুঙ এলাকায় জনসংহতি সমিতির বড় হরিণা ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি জ্ঞানশ্রী চাকমার সভাপতিত্বে এক গনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বড় হরিণা ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি নিলাময় চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১৬৩ নং কলা বুনিয়া মৌজার হেডম্যান জিরখুম লিয়ান পাংখোয়া। এসময় স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা নিরাপত্তার নামে সমাবেশে ব্যাপক সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করে।

জুরাছড়িতে পার্বত্য চুক্তি ২৬তম বর্ষপূতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩ 'জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন, সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জুরাছড়িতে ও জুরাছড়ি ইউনিয়ন কমিটির একাংশ ও মৈদং ইউনিয়নের ইউনিয়ন কমিটির একাংশ নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য নীলচন্দ্র চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুমিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা কমিটি। আরো অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৈদং ও জুরাছড়ি ইউনিয়নের ইউনিয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন গ্রামের গ্রাম কমিটি ও মহিলা সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং কার্বারীবৃন্দ।

বক্তারা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পার্বত্য চুক্তির স্বাক্ষরের ২৬ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এখনো সরকার পর্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি। পার্বত্যবাসী ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঠিক এই দিনে আজ হতে ২৬টি বছর আগে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। তারা মনে করেছিল আর বুঝি জুম্ম জনগণ সেনাবাহিনীর দ্বারা কোনো নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হবে না। এবার বুঝি পার্বত্যবাসী সুখে এবং শান্তিতে তাদের জুম করে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। আর বুঝি কোনো পিতা-মাতার শুনতে হবে না তাদের নিজের মেয়ে সেনাবাহিনী বা সেটেলার দ্বারা ইজ্জত লুণ্ঠন হয়েছে।

বক্তারা বলেন, সরকারকে যে ভাষায় জবাব দেওয়া দরকার সে ভাষায় জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের সকলকে সংগঠিত হতে হবে। সকলকে প্রস্তুত হতে হবে কঠিন কঠোর আন্দোলনের জন্য। ছাত্রসমাজ, যুবসমাজকে সংগঠিত হতে হবে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা নবীনদের শক্তি একত্রিত করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

পাহাড়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করা হচ্ছে: রাঙ্গামাটিতে চুক্তির বর্ষপূর্তির সভায় জলিমং মারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধনের কথা থাকলেও সেটি আজ প্রতি পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং পাহাড়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে দাবি করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক জলিমং মারমা।

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩ জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি উদ্যোগে রাঙ্গামাটির কুমার সুমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জলিমং মারমা এই মন্তব্য করেন।

তিনি আরো বলেন, ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনসংখ্যা ছিল ৯৮.৬% এবং বাঙালি ১.৪% কিন্তু সেটি বর্তমানে পাহাড়ি ৪৯% এবং বাঙালি ৫১% এসে দাঁড়িয়েছে। এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল আজ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্র নানাবিদ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। আজ যেখানে রাষ্ট্র একদিকে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি করছে, অন্যদিকে উগ্র জাত্যভিমান, উগ্র মৌলবাদী চিন্তা চেতনা থেকে রাষ্ট্র পরিচালত হচ্ছে।

পরিশেষে তিনি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আশিকা চাকমা সঞ্চালনায় এবং সভাপতি ডা. গঙ্গামানিক চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত গলসমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল ভৌমিক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষক, কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিশির চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অরুন ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানটি সকাল ৯:০০ ঘটিকায় গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর গণসংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়।

চুক্তির ২৬ বছরেও জুম্মদের অধিকার নিশ্চিত হয়নি: বাঘাইছড়ি গণসমাবেশে বিজয় কেতন চাকমা

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাঘাইছড়ি এলাকাবাসীর উদ্যোগে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত গণসমাবেশে বিল্টু চাকমার সঞ্চালনায় ও অলিভ চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা। এছাড়াও, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুমন মারমা। আরো উপস্থিত ছিলেন কাচালং কলেজের অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ দেওয়ান, বাঘাইছড়ি মহিলা সমিতি'র সভাপতি লক্ষীমালা চাকমা ও বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাগরিকা চাকমা সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্র ও যুব প্রতিনিধি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিজয় কেতন চাকমা বলেন, চুক্তির ২৬ বছর পেরিয়ে গেলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের অধিকার এখনো নিশ্চিত হয়নি। যার ফলে সেনাশাসন এখনো জারি আছে এই পাহাড়ে। তিনি ছাত্র ও যুব-সমাজ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকলকে চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সুমন মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি কারাগার করে রাখা হয়েছে। নিরাপত্তাহীনতায় মানুষ বসবাস করছে। তিনি আরো বলেন, চুক্তি কারোর একক স্বার্থে নয় বা একক জনসংহতি সমিতির নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতি, দল, লিঙ্গ, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই এই চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আরো অধিকতর আন্দোলন জোরদার করার জন্য ছাত্র ও যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কাচালং কলেজের অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ দেওয়ান বলেন, পার্বত্যবাসী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে গিয়েছিল। তাই এখানে কোন সরকার আসবে, কোন সরকার যাবে সেটা দেখার বিষয় নয় আমাদের। চুক্তি যেহেতু রাষ্ট্রের সঙ্গে হয়েছে তাই যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক তাকেই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত জুম্ম জাতি লড়াই জারি রাখবে।

এছাড়া গণসমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন নিখিল জীবন চাকমা, আহ্বায়ক উপজাতীয় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন কমিটি, জিকো চাকমা, ছাত্র ও যুব প্রতিনিধি পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখা, অমূল্য রতন চাকমা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সদস্য, সারোয়াতলী ইউনিয়ন, জ্যোতিষ মান চাকমা, প্রত্যাগত সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বিশ্বপ্রিয় কার্বারী, আপন চাকমা, চেয়ারম্যান, ৩৩ নং মারিশ্যা ইউনিয়ন পরিষদ, কাচালং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভদ্রসেন চাকমা প্রমুখ।

পিসিপি'র রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার ২৭তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' আহ্বানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার ২৭তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুনীতি বিকাশ চাকমার সঞ্চালনায় ও সভাপতি সুমন চাকমার সভাপতিত্বে কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক জলিমং মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক,পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক চারুলতা তঞ্চঙ্গ্যা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সজল চাকমা ও বিদায়ী বক্তব্য রাখেন অমর জ্যোতি চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জলি মং মারমা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠার পেছনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ভূমিকা রয়েছে। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের চিন্তায় ছিল ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করে তোলা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত বা আন্দোলন দুর্বার করণে ছাত্র সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। লংগদু গণহত্যা পিসিপি গঠনের একটি উপলক্ষ মাত্র।

তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষা কখনো পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ নয়। একজন ছাত্রের প্রতিটি জায়গা থেকে জীবনমুখী, বাস্তবিক ও মানবিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে। পেছনে ফিরে অতীতের সংগ্রামের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে, এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যেমনি করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কাপ্তাই বাঁধের সময় বাস্তবমুখী বাস্তবতায় অস্তিত্ব সংরক্ষণে ছাত্র সমাজকে নিয়ে কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তাই আজকের ছাত্র সমাজকেও সেভাবেই সাধারণ চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে হবে। অন্যথায় জুম্ম জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যাবে না। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় চেতনার আগুন প্রতিটি ছাত্রের অন্তরে জ্বালিয়ে দিতে হবে।

পরিশেষে সুনীতি বিকাশ চাকমাকে সভাপতি, সজল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সচিব চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

এছাড়াও, বিশ্বজিৎ চাকমাকে আহ্বায়ক ও উমংসিং মারমাকে সদস্য সচিব করে বিজ্ঞান অনুষদ, কপ্পিং চাকমাকে আহ্বায়ক ও যতন মনি চাকমাকে সদস্য সচিব করে ব্যবসা অনুষদ, জ্ঞান চাকমাকে আহ্বায়ক ও দিপালো চাকমাকে সদস্য সচিব করে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, শান্তিপ্রিয় চাকমাকে আহ্বায়ক ও হিল্লোল চাকমাকে সদস্য সচিব করে কলা অনুষদ কমিটি গঠন করা হয়। সকল কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য টিকেল চাকমা।

পিসিপি'র বাঘাইছড়ি থানা শাখার ২১তম ও শিজক কলেজ শাখার ১৯তম কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাঘাইছড়ি থানা শাখার ২১তম এবং শিজক কলেজ শাখার ১৯তম কাউন্সিল-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। বাঘাইছড়ি থানাধীন উগলছড়ি মূখ (বটতলা) কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় উক্ত কাউন্সিলটি শুরু হয়।

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা

কমিটির সহ-সভাপতি সুমতি রঞ্জন চাকমা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নরেশ চাকমা, জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সদস্য শান্তিবিজয় চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি লক্ষীমালা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য সুমেধ চাকমা, পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক টিকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক জেসমিন চাকমা প্রমুখ।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চিবরণ চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন থানা শাখার সভাপতি পিয়েল চাকমা এবং সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাখা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চাকমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বীর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রধান অতিথি সুমতি রঞ্জন চাকমা বলেন, আমরা যদি ইতিহাস উপলব্ধি করি, পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত ও শোষিত। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, অথচ এখনো পর্যন্ত জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলো বাস্তবায়ন হয়নি। শাসনতান্ত্রিক অধিকার ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের সামগ্রিক অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই আজকের দিনে প্রত্যেক যুব ও তরুণ সমাজের আমাদের অধিকার বাস্তবায়নের আন্দোলনে কয়েকগুণ শক্তিতে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিশেষে পিয়েল চাকমাকে সভাপতি, চিবরন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুদর্শন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি, বাঘাইছড়ি থানা শাখা কমিটি এবং সুকেন চাকমাকে সভাপতি, রুপেজ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অভিক চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি, শিজক কলেজ শাখার কমিটি গঠন করা হয়।

নবগঠিত বাঘাইছড়ি থানা শাখা কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি'র কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অন্বেষ চাকমা এবং শিজক কলেজ শাখা কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক মিলন চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর ১ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় সংহতি আলোচনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য দেশের প্রগতিশীল নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দলসমূহের সমন্বিত প্লাটফর্ম হিসেবে গত ২০ ডিসেম্বর ২০২২ আত্মপ্রকাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন।

এই প্লাটফর্মটির ১ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ আয়োজন করা হয় সংহতি আলোচনা সভার। প্লাটফর্মটির যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বের এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাবেক সভাপতি সুলভ

চাকমা'র সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন এর যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন।

এছাড়া সংহতি বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি কর্মী ও কবি শাহেদ কায়েস, ঐক্য ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ তারেক, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য শরিফ সমশির, বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাবেক সাংসদ ও বাংলাদেশ জাসদ এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স প্রমুখ।

২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সদস্য মুর্শিদা আক্তার ডেইজীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন এর যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন বলেন, গতবছর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫ বছর পেরিয়ে গেল। তখন আমরা লক্ষ্য করলাম পার্বত্য চুক্তি যে উদ্দেশ্যে করা হল তা পূরণ হয়নি। যদি পূরণ হত আমরা পাহাড়ের মানুষের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখতাম। কিন্তু সেটার বদলে আমরা দেখছি পার্বত্য চুক্তির মূল ধারাগুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাই আমরা নাগরিক সমাজ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোসহ বৃহত্তর পর্যায়ে এই চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য একটি প্লাটফর্ম গড়ে তুললাম। এই এক বছরে আমরা নানাভাবে এই চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলেছি এবং বিভিন্ন বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশেরও আয়োজন করেছি। আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের প্রয়াস অব্যাহত রাখবো।

ঐক্য ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ তারেক বলেন, যে সরকার পার্বত্য চুক্তি করেছিল সেই সরকারই টানা ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে। কিন্তু তাদের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা এই চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করেনি। ফলে পাহাড়ের মানুষকে এখনো এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। এই সরকারকে অনুরোধ জানাই, হয় আপনারা বলেন কবে এই চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন, নতুবা বলেন, কেন এই চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। চুক্তি ভঙ্গের জন্য এই সরকারকে নিন্দা জানাচ্ছি।

সংস্কৃতি কর্মী শাহেদ কায়েস বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে পাহাড়ে এক ধরনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি চলছে। সেখানে এখনো পর্যন্ত জুম্মরা চাষের ভূমি হারাচ্ছে। এছাড়া বান্দরবানের রাবার কোম্পানি থেকে শুরু বিভিন্ন কোম্পানি পাহাড়িদের ভূমি বেদখল করছে। আমরা আশা করেছিলাম এই চুক্তির ফলে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তা এখনো হয়নি।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য শরিফ সমশির বলেন, আমি যেসময় ছাত্র ছিলাম সেসময় পাহাড়ে গিয়ে একবার সেনাক্যাম্পে হয়রানির শিকার হয়েছিলাম। আমাকে নামিয়ে সেখানে নানা জিজ্ঞাসা করা হল। আমি সে এলাকার মানুষ নয়, তারপরও সেটা আমার মানবিক মর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তাহলে সেখানকার আদিবাসীরা যারা প্রতিনিয়ত এই ধরনের আচরণের শিকার হচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে কেমন লাগবে সেটা ভেবে দেখুন। পরে এই সমস্যাগুলো সমাধানে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি এ অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা পদক্ষেপ হিসেবে নানা মহলের কাছে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই চুক্তির বাস্তবায়ন হয়নি। বরং এই চুক্তিকে বিরোধীতা করে ইউপিডিএফ নামে যে সংগঠনটির সৃষ্টি হয় এবং ক্রমান্বয়ে তাদের যে সশস্ত্র বিরোধিতা সেটাকে আমরা অনেক বাঙালি বামপন্থী ও ডানপন্থীরা সমর্থন করছি। এগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পথকে আরো জটিল করেছে বলে মনে করি।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, রাষ্ট্রের পক্ষে যারা চুক্তি করেছিল, তারা যে এটি বাস্তবায়ন করবে সেটা আশা করা যাচ্ছে না। কেননা, এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রথমেই রাজনৈতিকভাবে ঐক্যমত্য থাকতে হবে। কিন্তু যে দলটি করেছিল তাদের যে রাজনৈতিক দর্শন আমার মনে হয় না তারা দলীয়ভাবেও একমত ছিল। অন্যদিকে আমলারাও এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একমত নয়। কেননা, যদি রাজনৈতিকভাবে ঐক্যমত্যে পৌঁছা যেত তখন সামরিক, বেসামরিক আমলাদেরকে বুঝিয়ে এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা যেত। কিন্তু সেসবের কোনোটাই হয়নি, কেননা রাজনৈতিকভাবে এই চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে ঐক্যমত্য নেই।

বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, সরকার চুক্তি করেছে চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি জনসংহতি সমিতি বলছে ২৯টি ধারা কোনোভাবেই হাত দেয়নি সরকার। অন্যদিকে পাহাড়ে অঘোষিত সেনাশাসন জারি রয়েছে। কিন্তু সরকার তার প্রচারযন্ত্রের মধ্য দিয়ে নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে। সরকার বলছে পার্বত্য চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা বাস্তবায়ন করেছে। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের যে আন্দোলন সেটার অনুপস্থিতি দেখি আমি। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই চুক্তি বাস্তবায়নের প্রকৃত চিত্র জনগণের সামনে নিয়ে যাওয়া।

এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, সরকার

স্বেচ্ছায় হোক বা চাপে পড়ে হোক এই পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু এই চুক্তি যদি বাস্তবায়ন না করে তবে জাতি হিসেবে আমরা প্রতারক হয়ে থাকবো। অন্যদিকে পাহাড়ি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় চুক্তি বাস্তবায়ন জরুরি।

সাবেক সাংসদ ও বাংলাদেশ জাসদ এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান বলেন, সরকারের চুক্তি মানে রাষ্ট্রীয় চুক্তি। কাজেই এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতেই হবে। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাদের অনেকেই আছেন যারা পাহাড়ি মানুষদেরকে মানুষই মনে করে না। কিন্তু সরকারকে বলবো- অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। আর কাল বিলম্ব না করে এই চুক্তি বাস্তবায়ন করুন। পাহাড়িদের আত্মমর্যাদা বোধে আঘাত ও বঞ্চনা দীর্ঘায়িত হলে যদি পাহাড় আরো অশান্ত হয় তবে এর দায় দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং সব মানুষের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করার কোনো বিকল্প নেই। আমরা যদি মনে করি পাহাড়িদের আন্দোলন পাহাড়িরা করবে- এই দিন ফুরিয়ে গেছে। আমাদেরকে সম্মিলিতভাবেই এই সংগ্রাম জারি রাখতে হবে।

জুরাছড়িতে ভূমি বেদখলের প্রচেষ্টা ও সেনাবাহিনীর জুম্ম মারধরের প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের বিক্ষোভ

গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৪, বিকাল ২:৩০ টায় রাঙ্গামাটিতে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যকর করার দাবি এবং জুরাছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্মর ভূমি বেদখলের চেষ্টা ও সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতিবাদকারীদের মারধরের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) এর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে পিসিপির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক টিকেল চাকমার সঞ্চালনায় ও জিকো চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পিসিপি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) ও যুব সমিতির নেতৃবৃন্দ।

স্বাগত বক্তব্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি ম্রানুচিং মারমা বলেন, ২০২৪ সালে নির্বাচন শেষ হতে না হতেই শাসকগোষ্ঠী তার কার্যক্রম শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে আজ ভূমি বেদখলের কার্যক্রম চলছে। আমাদের যেখানে অধিকার নেই সেখানে যেই দল করুক, আওয়ামীলীগ করুক, বিএনপি করুক, কারোর রেহাই নেই। শাসকগোষ্ঠীর চোখে শুধুই জুম্ম, জুম্ম হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে। নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে, কেউ এসে আমাদের নিরাপত্তা দিবে না।

সংহতি বক্তব্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য উলিচিং মারমা বলেন, আমরা যেদিকে তাকাই সেদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল, নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা, গুমের কথা। আমাদের ন্যূনতম ভূমি অধিকার পর্যন্ত নেই। আমরা যারা প্রতিবাদ করি তাদেরকে কখন কিভাবে ধরা যায়, তাদের কিভাবে নিঃশেষ করা যায়, শাসকগোষ্ঠী সবসময় সেই পরিকল্পনা করে থাকে। আজ যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি বাস্তবায়ন হতো, তাহলে আমাদের উপর ভূমি দখল, হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ এর মতো কার্যক্রম করতে পারতো না। আমাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লড়াইয়ে সামিল হতে হবে।

পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক বলেন, সেনাবাহিনী সেটেলারদের পক্ষ নিয়ে জুম্মর জায়গা দেওয়ার জন্য বলে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাজ দেশকে রক্ষা করা, দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা, পাহাড়িদের, বাংলাদেশের নাগরিকদের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা করার কাজ নয়। চুক্তিতে স্পষ্ট রয়েছে, জেলা পরিষদের অনুমতি ব্যতীত কোনো জায়গা-জমি ইজারাসহ বন্দোবস্তি দেয়া যাবে না। যুগ পরিবর্তন হয়েছে, মানুষ পরিবর্তন হয়েছে, জুম্মদেরকে অবহেলায় রাখা যাবে না। যদি এই সমস্যাগুলো নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া না হয় ৮০/৮১-এর মতো শান্তিবাহিনী যেভাবে গর্জে উঠেছে, আরো সেভাবে গর্জে উঠতে বাধ্য হবে। আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই করে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি জুরাছড়িতে সংঘটিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনের যথাযথ পদক্ষেপসহ ভূমি বেদখলের অপচেষ্টাকারী সেটেলার বাঙালিদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ, অপারেশন উত্তোরণ নামক সেনাশাসন প্রত্যাহার, পার্বত্য সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালা কার্যকর করে অতিদ্রুত ভূমি কমিশন কার্যকর করার দাবি জানান।

জুরাছড়িতে ভূমি বেদখলের চেষ্টার প্রতিবাদে চবিতে পিসিপি ও ছাত্র ইউনিয়নের মানববন্ধন ও সমাবেশ

গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়িতে সেনা মদদে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের প্রচেষ্টা ও সেনা কর্তৃক জুম্মদের শারীরিক নির্যাতনের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম

মহানগর শাখা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চবি সংসদের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের সভাপতি প্রত্যয় নাফাক, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক সুদীপ্ত চাকমা, পিসিপি, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হ্লামিউ মারমা এবং তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক উকিং সাই মারমা প্রমুখ।

পিসিপি'র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অন্বেষ চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চবি শাখার সভাপতি নরেশ চাকমা এবং সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি চবি শাখার সদস্য সুমন চাকমা।

সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, 'পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক ভূমি কমিশনকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে। পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ভূমি বেদখল হচ্ছে যার দায় রাষ্ট্রকে নিতে হবে। পাহাড়ি মানুষ তাদের অধিকারের স্বার্থে ও তাদের জীবনের নিরাপত্তার তাগিদে আন্দোলন-সংগ্রামে তাদেরকে আরও কঠোর হতে হবে।'

প্রত্যয় নাফাক বলেন, নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগণের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় তখন তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যার প্রতিরূপ আশির দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের সৃষ্ট সংগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসকগোষ্ঠী একটি ট্যুরিস্ট হাব হিসেবে চিহ্নিত করে শোষণ করতে চায়। আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশের সকল প্রগতিশীল মহল ও ছাত্রসমাজকে আদিবাসীদের সঙ্গে থাকার আহ্বান জানাই।

হ্লামিও মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের ভূমি বেদখল

দেশমাতৃকার স্বার্থে শুভ সংকেত নয়। স্বাধীনতার ৫২ বছরে এসেও সারা দেশের আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার নেই। উন্নয়ন, পর্যটনের নামে সেনা মদদে সেটেলার কর্তৃক নানা জায়গায় জুম্মদের উচ্ছেদ ও ভূমি দখলের ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনা। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশটি শেষ হয় এবং এরপর বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন হয়ে শহীদ মিনারে এসে সমাপ্ত হয়।

জুরাছড়িতে সেটেলার কর্তৃক ভূমি বেদখলের চেষ্টা ও সেনাবাহিনী কর্তৃক মারধরের প্রতিবাদে ঢাকায় পিসিপির বিক্ষোভ

গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ বিকাল ৩ টায় রাঙ্গামাটির জুরাছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম'র ভূমি বেদখলের অপচেষ্টা এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতিবাদকারীদের মারধরের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখা একটি বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করে। 'বাংলাদেশের ফিলিস্তিন, সিএইচটির খবর নিন' সহ নানা শ্লোগানে মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র রাজু ভাস্কর্য থেকে শুরু হয়ে রোকেয়া হল হয়ে কলাভবন প্রদক্ষিণ করে সমাজ বিজ্ঞান ভবন পেরিয়ে আবার রাজু ভাস্কর্যে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে পিসিপি, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জগদীশ চাকমার সভাপতিত্বে ও সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক শুভ চাকমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

উক্ত প্রতিবাদী মিছিল ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থী ও রাঙ্গামাটির জুরাছড়ির বাসিন্দা শান্তিময় চাকমা, আদিবাসী শ্রমজীবী সমিতির প্রতিনিধি শান্ত চাকমা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট'স কাউন্সিলের (বিএমএসসি) কেন্দ্রিয় সাধারণ সম্পাদক অং শোয়ে সিং মারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চ্যং ইয়ং ম্রো, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট কেন্দ্রিয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান নূর, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দীয় সদস্য সতেজ চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য মেরিন চাকমা। এছাড়াও সমাবেশে সংহতি জানায় ত্রিপুরা স্টুডেন্ট'স ফোরাম ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি দীপক শীল।

সংহতি বক্তব্যে আদিবাসী শ্রমজীবী সমিতির প্রতিনিধি শান্ত চাকমা বলেন, স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও আমরা ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করছি তা ভাবতেই লজ্জা লাগে। পাহাড়ে ভূমি বেদখল, ধর্ষণসহ নানা ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। পাহাড়ে চলমান রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। যদি পাহাড়ের রাজনৈতিক অবস্থা দিন দিন এভাবে নাজুক করে তোলা হয় তবে জুম্ম তরুণ সমাজও আরো অধিকতর লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়তে পিছ পা হবে না।

বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট'স কাউন্সিলের কেন্দ্রিয় সাধারণ সম্পাদক অং শোয়ে সিং বলেন, বাংলাদেশে অপরাপর অঞ্চলগুলোতে সেনাশাসন না থাকলেও পাহাড়ে এখনও প্রকটভাবে সেনাশাসন চলমান রয়েছে। ৮০র দশকে চার লক্ষাধিক সেটেলার বাঙালিদেরকে পাহাড়ে পুনবার্সন করা হয়েছিল। বেআইনিভাবে, সেই সেটেলার পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া এখনও চলমান। যার উদাহরণ, কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া জুরাছড়ির ঘটনা। এ ঘটনায় পাঁচজন প্রতিবাদকারী যারা ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামীলীগের কর্মী, তারা সেনাবাহিনীর দ্বারা মারধরের শিকার হলেও রাঙ্গামাটির ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা একটি বিবৃতিও দেয়নি, যা খুবই হতাশাজনক। পাহাড়ের অবস্থাকে দিনকে দিন অস্থিতিশীল করে শান্তিবাহিনীর হাতিয়ারকে আবার গর্জে উঠতে দিবেন না বলেও হুশিয়ারি দেন এই ছাত্রনেতা।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন বলেন, পাহাড়ে খুন, অপহরণ, ধর্ষণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বৈতশাসনের মাধ্যমে পাহাড়ীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার করানো হচ্ছে। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা সবসময় স্বোচ্ছার ছিলাম, আছি। জুরাছড়ির ঘটনায় সেনাবাহিনীর নিপীড়ন খুবই হতাশাজনক। সেনাবাহিনীর ওই সকল নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে লড়াই অব্যাহত রাখব।

বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান নূর বলেন, আমরা সবসময় এক দেশ, এক স্বাধীনতা নীতিকে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু পাহাড়ের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমান সরকার টানা ৪ বার ক্ষমতায় আসার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি। অবিলম্বে ভূমি কমিশন কার্যকর ও পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

সমাবেশের সভাপতির বক্তব্যে পিসিপি, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জগদীশ চাকমা বলেন, জুরাছড়ির ঘটনায় আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি যে, প্রতিবাদকারীদের মধ্যে ৩ জনকে এখনও একপ্রকার বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো সুযোগ আমরা পাচ্ছি না। আমরা অনতিবিলম্বে তাদের মুক্তি দাবি করছি। প্রতিবাদকারীরা ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সংগঠনের কর্মীরা ঘটনার প্রতিবাদে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

জুরাছড়ির ঘটনার মত পাহাড়ে আর এধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনা পুনরাবৃত্তি না করার জন্য অবিলম্বে বিধিমালা প্রণয়ন করে পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যকর করতে হবে। সকল সমস্যার সমাধান বা পাহাড়ে স্থায়ী সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি উক্ত সমাবেশে উপস্থিত অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও উপস্থিতিদের সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ভূমি বেদখলের চেষ্টা ও সেনাসদস্য কর্তৃক প্রতিবাদকারীদের মারধরের প্রতিবাদে রাঙ্গামাটি কলেজে বিক্ষোভ

গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যকর করার দাবিসহ জুরাছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম'র ভূমি বেদখলের চেষ্টা ও সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতিবাদকারীদের মারধরের প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের আগে এক দুই তিন চার, সেনাবাহিনী পাহাড় ছাড়; সেটেলার দখল করে, প্রশাসন কি করে? সেনাবাহিনী মানুষ মারে, প্রশাসন কি করে? দখলদার যেখানে, লড়াই হবে সেখানে; আপোষ না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে ক্যাম্পাসের বটতলায় এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশে পিসিপির রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক সজল চাকমার সঞ্চালনায় ও সুনীতি বিকাশ চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ শিক্ষার্থী ও পিসিপি, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ।

স্বাগত বক্তব্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সোনারিতা চাকমা বলেন, নতুন বছর শুরু হতে না হতেই জুম্মদের ওপর বিভিন্ন অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন দেখা যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে জুম্মদের নিরাপত্তা কোথাও থাকবে না। জুম্মরা আওয়ামী লীগ-বিএনপি করেও রেহাই পাচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের অবস্থা বিরাজমান থাকবে।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে মেরিন বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের জায়গা বেদখলের প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছে। বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুম্মদের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। শাসক গোষ্ঠী উন্নয়নের নামে পাহাড়ের জুম্মদের বিলীন হওয়ার নীল নকশা তৈরি করছে। অস্তিত্ব রক্ষার্থে তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সংহতি বক্তব্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক চারুলতা তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, আমাদের বোঝা উচিত আমাদের জুম্মদের উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ, নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তিনি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই জুম্ম জনগণ বসে থাকবে না। তিনি ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি জুম্মদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করতে হবে, কিন্তু বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তা করছে না। যা পার্বত্য চুক্তির লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এক ধরনের সেনা শাসন জারি রয়েছে, এই সেনা শাসন যদি দীর্ঘ সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলমান থাকে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের বুকে ৭০ দশকের ন্যায় দাবানলের সৃষ্টি হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সুনীতি বিকাশ চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা শুধু জুরাছড়ির ১৩ই জানুয়ারির ঘটনা না, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতিটি জায়গায় এরকম ঘটনা ঘটেই থাকে। আমরা আশা করেছিলাম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীন, স্বার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি সেই স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্রে আমরা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারবো। শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কম হতে পারে কিন্তু জ্ঞান-গড়িমায় এই জুম্ম জনগণ ৭০ দশকের ন্যায় প্রতিরোধের ঝড় তুলবে।

বাঘাইছড়ির শিজক কলেজে পিসিপির উদ্যোগে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রোজ রবিবার বাঘাইছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর শিজক কলেজ শাখার উদ্যোগে শিজক কলেজের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পিসিপি'র শিজক কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক রুপেজ চাকমার সঞ্চালনায় এবং পিসিপি'র শিজক কলেজ শাখার সভাপতি সুকেন চাকমার সভাপতিত্বে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি সহ-সভাপতি ডা. সুমতি রঞ্জন চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাবেক সভাপতি প্রভাত কুমার চাকমা, শিজক কলেজের অধ্যক্ষ সুভাষ দত্ত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির সুমেধ চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক চিবরন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি লক্ষীমালা চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জেসমিন চাকমা।

নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপি'র শিজক কলেজ শাখার সহ-সভাপতি বিপুল চাকমা। অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন শিজক কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী হেলেন চাকমা এবং নবীন শিক্ষার্থীদের পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করেন জ্যোৎস্না চাকমা ও গোপাল চাকমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. সুমতি রঞ্জন চাকমা বলেন, 'ছাত্র সমাজ হচ্ছে একটি জাতির শক্তি, সাহস, সর্বোপরি একটি জাতির স্বপ্ন।' তিনি আরও বলেন, জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও বর্তমান জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমারাও এক সময় তোমাদের মত ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা শুধুমাত্র দেশের কোনো একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া বা সার্টিফিকেট অর্জন করা অথবা দেশের কোনো একটি উচ্চ প্রতিষ্ঠানে সরকারি চাকরি করে আয়েশের জীবন কাটিয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁদের চিন্তাধারা ছিল অনেক উঁচুমানের। তাঁরা তোমাদের মতোই ছাত্রাবস্থায় জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। আমি মনে করি তোমাদেরও নিজেদের মেধা ও জ্ঞানকে জুম্ম জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কাজে লাগানো উচিত।

চট্টগ্রামে পিসিপি'র ৩০তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)এর চট্টগ্রাম মহানগর শাখা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ৩০তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। 'দেশের সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% আদিবাসী কোটা চালু কর' দাবি এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে ছাত্র ও যুব সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হউন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত

সম্মেলন ও কাউন্সিলটি চট্টগ্রাম নগরস্থ হালদা মিলনায়তনে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় শুরু হয়।

সম্মেলন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎজ্যোতি চাকমা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বসুমিত্র চাকমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি নিপন ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অনিল চাকমা ও পিসিপি'র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নরেশ চাকমা প্রমুখ।

পিসিপি'র চট্টগ্রাম মহানগর শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চবি শাখার সদস্য সুমন চাকমা এবং প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন খুলশী থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক থোয়াইউ প্রু মারমা, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখার সাধারণ সম্পাদক উকিং সাই মারমা, চবি ২ নং গেইট শাখার সদস্য অপূর্ব চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুভাষ চাকমা। বার্ষিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন চবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অন্বেষ চাকমা ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অম্লান চাকমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, 'শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নগুলো আগে খুবই সূক্ষ্ম ছিল কিন্তু এখন সেগুলো চোখে পড়ার মতো। এই কঠিন সময়ে আমরা কীভাবে চুপ হয়ে বসে থাকতে পারি। প্রত্যেকটা ভালো কাজে ত্যাগ-সংগ্রামের প্রশ্ন লুকিয়ে থাকে। ঠিক একইভাবে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও ছাত্র-যুব সমাজকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হতে হবে। আপনাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষা মানে জ্ঞান অর্জন, আর জ্ঞান মানে বিবেচনা। আমরা আজকে প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা গ্রহণ করছি তার মাহাত্ম্য তখনই থাকবে যখন আমরা অর্জিত জ্ঞানকে সমাজের কাজে লাগাতে পারব, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার কাজে লাগাব। আমাদের জীবন আজ সংকটের মুখে সেটা শিক্ষিত প্রজন্মকে অনুধাবন করতে হবে। জুম্ম জনগণ আজ অসহায়ত্ব ও হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। এই সংকট মোকাবিলার জন্য ছাত্র সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য নিজের শক্তিতে বিশ্বাস রাখতে হবে। এই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় কাজে লাগাতে হবে। চুক্তি করেও সরকার কেন অধিকার দিতে চায় না এটা আমাদের বুঝতে হবে। এম এন লারমার আদর্শকে ধারণ করে লড়াই সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে।'

এরপর হ্লামিও মারমাকে সভাপতি, অম্লান চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও আদর্শ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম মহানগর শাখা, অন্তর চাকমাকে সভাপতি, অন্বেষ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুভাষ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, উকিংসাই মারমাকে সভাপতি, পলাশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ণজ্যোতি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখা, সুমন চাকমাকে সভাপতি, আলফ্রেড চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও প্রিয়জ্যোতি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২নং গেইট শাখার কমিটি ঘোষণা করা হয়।

পিসিপি, চবি শাখা ও চবি ২নং গেইট শাখার নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ম্যাকলিন চাকমা এবং চট্টগ্রাম মহানগর শাখা ও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখার নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি খোকন চাকমা।

খাগড়াছড়িতে দুই সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম নারীকে ধর্ষণচেষ্টার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে পিসিপি'র মানববন্ধন

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিকাল ৩:৩০ ঘটিকায় সম্প্রতি খাগড়াছড়ির মহালছড়ি ইউনিয়নের চৌংড়াছড়িতে দুই সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী জুম্ম নারীকে ধর্ষণচেষ্টার প্রতিবাদে ও ধর্ষণকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে

রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর রাঙ্গামাটি শহর শাখার উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মানববন্ধনে পিসিপি'র রাঙ্গামাটি শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ চাকমার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি ম্যাগলিন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পিসিপি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির নেতৃবৃন্দ।

স্বাগত বক্তব্যে পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুপ্রিয় চাকমা বলেন, আমাদের দেশে নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে বিশেষ আইন থাকলেও আইনের যথাযথ কার্যকর আমরা দেখতে পাই না। ধর্ষণ পরবর্তী ধর্ষককে যদি মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো তাহলে চৌংড়াছড়িতে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেরকম ঘটনা পুনরায় ঘটতো না। জুম্ম নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রশাসনের আরো কঠোর হতে হবে।

সংহতি বক্তব্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক চারুলতা তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের উপর ধর্ষণ ও তার পরবর্তী হত্যা চেষ্টা ঘটনায় আসামিদের যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা হয় না। এদেশের আইনানুযায়ী অনতিবিলম্বে ধর্ষণের চেষ্টাকারীদের, ধর্ষকদের শাস্তির দাবি জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি ম্যাগলিন চাকমা বলেন, আমাদের খুবই দুঃখের সাথে বলতে হয়, স্বাধীন বাংলাদেশ ৫৩ বছরে পদার্পন করেও আমরা বর্তমানে ধর্ষণের মতো ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানিদের দ্বারা এদেশের নারীদের যে ধর্ষণের ঘটনা দেখতে পেয়েছি ঠিক তেমনি আমরা আজকেও দেখতে পাচ্ছি। আজ আমাদের নারীদের নিরাপত্তা নেই। কুয়ো থেকে পানি আনতে গিয়েও তাদের ধর্ষণের চেষ্টার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে।

জুম্ম নারী ধর্ষণের চেষ্টা ও শিক্ষক কর্তৃক এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের চেষ্টার প্রতিবাদে চবিতে বিক্ষোভ মিছিল

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. খাগড়াছড়ির চৌংড়াছড়িতে দুইজন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) রসায়ন বিভাগের এক শিক্ষক কর্তৃক এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের চেষ্টার প্রতিবাদে এবং ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক অন্বেষ চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক সুদীপ্ত চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চবি শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মংচে চাকমা, পিসিপির চবি ২নং গেইট শাখার সভাপতি সুমন চাকমা, ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সোহেল রানা, ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সদস্য বিমল ত্রিপুরা।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক ইফাজ উদ্দিন আহমেদ ইমুর সঞ্চালনায় সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি চবি শাখার সদস্য অপূর্ব চাকমা, এবং সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্তর চাকমা।

সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশটি শেষ হয় এবং এরপর বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে শুরু হয় প্রশাসনিক ভবন প্রদক্ষিণ করে শদীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

বাঘাইছড়িতে জনসংহতি সমিতির ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন' শীর্ষক এক

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন কমিটি'র উদ্যোগে উগলছড়ি মুখ (বটতলা) কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সুশীল চন্দ্র তালুকদার।

উদযাপন কমিটির সদস্য মন্টু চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সুমতি রঞ্জন চাকমা এবং প্রধান আলোচক হিসেবে সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সাবেক সভাপতি প্রভাত কুমার চাকমা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাঘাইছড়ির তিন ইউনিয়ন পরিষদের (মারিশ্যা, খেদারমারা ও সারোয়াতুলি ইউনিয়ন) চেয়ারম্যানগণ ও কার্বারি প্রতিনিধি বিশ্বপ্রিয় চাকমা, যুব সমিতির সদস্য সুমেধ চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সুমতি রঞ্জন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অবিভাবক এবং রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতি শত ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, শাসকগোষ্ঠীর চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে রক্ত-পিচ্ছিল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আজ ৫২ বছরে পদার্পণ করেছে। যেটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

আলোচনা সভার শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে থেকে এযাবৎকালে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই সংগ্রামে যারা জীবন উৎসর্গ তথা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সদস্য বাবু সুব্রত চাকমা।

প্রীতি ওরাং-এর মৃত্যু ও মহালছড়িতে জুম্ম নারী ধর্ষণ চেষ্টার বিচারের দাবিতে ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বিকাল ৩:০০ টায় ঢাকার শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে আদিবাসী ছাত্র-যুব ও নারী সংগঠনসমূহের উদ্যোগে প্রীতি ওরাং-এর মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে এবং মহালছড়ির আদিবাসী জুম্ম নারী ধর্ষণ চেষ্টাকারীর বিচারের দাবিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের অর্থ সম্পাদক অনন্যা দ্রং, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অলীক মৃ, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সমন্বয়ক ফাল্গুনী ত্রিপুরা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি দীপক শীল, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি রেং ইয়ং ম্রো, আদিবাসী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চুং ইয়াং, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর ঢাকা মহানগরের সভাপতি জগদীশ চাকমা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ডেইলি স্টারের নির্বাহী সম্পাদক আশফাকুল হক ঢাকার মোহাম্মদপুরের ৮ তলা ফ্লাট থেকে প্রীতি ওরাং(১৫) মৃত্যুবরণ করে। সে আশফাকুল হকের বাড়িতে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করত। তার বাড়ি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় বলে জানা গেছে। বর্তমানে আশফাকুল হক ও তার স্ত্রী চার দিনের পুলিশের রিমান্ডে রয়েছেন।

অপরদিকে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলায় ঝিরি থেকে পানি আনতে গিয়ে এক জুম্ম নারী দুই সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয় বলে জানা যায়।

রুমার ঘটনায় জেএসএসকে জড়িত করে কেএনএফের বক্তব্যের প্রতিবাদ জেএসএসের

রুমায় কেএনএফের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের বিক্ষোভ চলাকালে বম ও লুসাইদের হামলার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করায় কেএনএফের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছে জনসংহতি সমিতি।

জনসংহতি সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমার স্বাক্ষরিত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনসংহতি সমিতি উল্লেখ করে যে, গতকাল (১৪ ফেব্রুয়ারি) বম পার্টি খ্যাত তথাকথিত কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মি এর 'জেএসএস সমর্থিত উগ্র মারমা নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে মারমা জনগণ কর্তৃক নিরীহ বম ও লুসাই জনগণের উপর অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে কেএনএফ এর প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক প্রেস বিজ্ঞপ্তির প্রতি জনসংহতি সমিতির দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

উক্ত প্রতিক্রিয়ায় বলা হয় যে, '....রুমা বাজারে জেএসএস সন্ত্রাসীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছে। বিক্ষোভ মিছিলের এক

পর্যায়ে বম সম্প্রদায়ের নিরীহ জনগণের উপর হামলা শুরু করে...।' তথাকথিত কেএনএফের এই বক্তব্য সর্ববৈ মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কখনোই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। জনসংহতি সমিতি স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খিয়াং, লুসাই, পাংখো, খুমী, চাক, গোর্খা, সাঁওতাল ও অহমিয়া প্রভৃতি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে আসছে।

প্রতিক্রিয়ায় বিবৃত কেএনএ'র সঙ্গে জেএসএস-এর বন্দুক যুদ্ধের অবতাড়নাও জাজ্জ্বল্য মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়। এটা দিবালোকের মতো সকলের কাছে স্পষ্ট যে, কেএনএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নির্বিচার গুলি বর্ষণে আহত উহ্লাচিং মারমা একজন নিরীহ গ্রামবাসী। এধরনের হঠকারী ও সাম্প্রদায়িক ঘটনার মধ্য দিয়ে কেএনএফ বান্দরবানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ ধরার হীন তৎপরতা চালাচ্ছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

রুমার ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে বম পার্টি খ্যাত তথাকথিত কেএনএফের বক্তব্যের জন্য জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

পিসিপি লংগদু থানা শাখার ২৪তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রোজ শুক্রবার সকাল ১১ঘটিকার সময় লংগদু উপজেলার ৪নং বগাচতর ইউনিয়নের অন্তর্গত রনজিত পাড়া এলাকায় 'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হোন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, লংগদু থানা শাখার ২৪তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী এই বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠানে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, লংগদু থানা শাখার বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিন্টু মনি চাকমার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি রিকেন চাকমা এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বাগত চাকমা।

বার্ষিক শাখা সম্মেলনে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, লংগদু থানা কমিটির কৃষি ও ভূমি বিষয়ক সম্পাদক বিনয় প্রসাদ কার্বারী, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, লংগদু থানা শাখার সভাপতি দয়াল কান্তি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক টিকেল চাকমা ও স্থানীয় ৪নং বগাচতর ইউনিয়ন পরিষদের ৬নং ওয়ার্ড সদস্য জ্যোতি বিকাশ চাকমা।

অতিথিদের বক্তব্য শেষে প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে রিকেন চাকমাকে সভাপতি, রিন্টু মনি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও স্বাগত চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন কমিটি ঘোষণা করে শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক টিকেল চাকমা।

সম্মেলনে সভাপতি নব গঠিত কমিটির সকল সদস্যদেরকে অভিনন্দন এবং সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি করেন।

পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রোজ শুক্রবার বিকাল ৩ ঘটিকায় চট্টগ্রামস্থ জেএমসেন হলে 'শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন চাই' শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ১৮তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়।

পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমা'র সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অমরকৃষ্ণ চাকমা বাবু।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার

সভাপতি তাপস হোড়, ঐক্য ন্যাপ চট্টগ্রাম এর সাধারণ সম্পাদক অজিৎ দাশ, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাড নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সমন্বয়কারী জুনিয়া ত্রিপুরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ডিসান তঞ্চঙ্গ্যা।

বক্তারা বলেন, সংগঠন হচ্ছে লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার। এই সংগঠনের মাধ্যমে একজন কর্মী তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। লক্ষ্য ছাড়া একটি সংগঠন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য অবশ্যই নীতি, আদর্শ ও চেতনার প্রয়োজন। সেটি এমন একটি চেতনা, এমন একটি দর্শন যা দ্বারা লিঙ্গবিভেদ হবে না, শ্রেণিবিভেদ হবে না। যা দ্বারা সকল নিপীড়িত মানুষকে একত্র করে সামনে লক্ষ্য পূরণের জন্য এগিয়ে যাবে।

বক্তারা আরো বলেন, আজ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কোথাও ভালো নেই। শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও আদিবাসীদের উপর দমন-পীড়ন, ভূমি বেদখল করেই চলেছে। সেই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসকল রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। পাহাড়ী তথা মেহনতি মানুষের যে মুক্তির সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে সকলের এগিয়ে আসা দরকার।

বক্তব্য শেষে পর্যবেক্ষক ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ডিসান তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, জগৎ জ্যোতি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সন্তোষ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর ভাষাগত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও: চবিতে ছাত্র সমাবেশে বক্তারা

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের উদ্যোগে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাম্পাসের লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নরেশ চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র

ইউনিয়নের চবি সংসদের সভাপতি প্রত্যয় নাফাক, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চবি ২নং গেইট কমিটির সভাপতি সুমন চাকমা, ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সোহেল রানা এবং সদস্য নয়ন কৃষ্ণ সাহা প্রমুখ।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সুদীপ্ত চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি চবি শাখার সদস্য অপূর্ব চাকমা, এবং সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি চবি শাখার সভাপতি অন্তর চাকমা।

বক্তারা বলেন, রাষ্ট্র তার সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী চেতনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বহু জাতির সম-অধিকারের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র রূপ লাভ করতে পারেনি এখনও। এই স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে সকল জাতিসত্তার এবং সকল আদিবাসীদের মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারেনি। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক যে আদিবাসী জাতিসমূহের প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার শিক্ষা প্রদান কথার কথা তা যথাযথভাবে হচ্ছে না, নেই কোনো প্রশিক্ষিত শিক্ষক। সরকারকে তার জাতীয় স্বার্থে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২৫তম কাউন্সিল

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাঙ্গামাটির সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২৫তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' শ্লোগানে পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি

সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুবিনা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটির জেলা শাখার সভাপতি ম্রানুচিং মারমা।

সম্মেলনের শুরুতে পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক টিকেল চাকমার সঞ্চালনায় এযাবৎ কালে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আত্মবলিদানকারী সকল বীর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সুমন চাকমা।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেন, ছাত্র অবস্থা থেকেই এম এন লারমা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন। ১৯৬০ সালে এম এন লারমা মরণফাঁদ কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এম এন লারমা বলেছিলেন- আমরা সংখ্যায় কম, তাই সংগঠন করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এম এন লারমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দূরদর্শিতা থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার।

তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সাহস অর্জন করতে হবে। দীর্ঘ ২৪ বছর সশস্ত্র লড়াই করে সরকারকে বাধ্য করেছি চুক্তি করতে। ঐক্যবদ্ধ জাতি বলে আমরা দেখিয়েছি অধিকার আদায়ে লড়াই করতে পারি। সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ করছে। অন্যদিকে চুক্তি বিরোধী নানা ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বান্দরবানে সরই ইউনিয়ন ম্রোদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ম্রোরা যেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে সেই ঝিড়িতেও ভূমিদস্যুরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ ভূমিকায় রয়েছে। ম্রোরা তারপরও নিজ বাস্তুভিটা রক্ষায় লড়াই করে টিকে আছে।

তিনি আরো বলেন, সংগ্রাম ছাড়া অস্তিত্ব টিকে থাকবে না। এম এন লারমারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুণেধরা জুম্ম সমাজকে রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত করেছে। শিক্ষার কোনো শেষ নেই। ভুল চিন্তাধারা পাশ কাটিয়ে ভালো কাজে মনোযোগী হতে হবে। মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে কর্মীদের এগিয়ে যেতে হবে। আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সংগ্রামের রূপরেখা নির্ধারণ করে কাজ করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্বের কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সহ সাধারণ সম্পাদক উ উইন মং জলি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সম্পাদক জুয়েল চাকমা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক। এতে রাঙ্গামাটি জেলা শাখার বিভিন্ন থানা ও কলেজ কমিটির প্রতিনিধিরা সাংগঠনিক বক্তব্য তুলে ধরেন।

সম্মেলন শেষে জিকো চাকমাকে সভাপতি, টিকেল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুমন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২৫তম কমিটি গঠিত হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

ত্রিপুরায় বিপ্লবী নেতা এম এন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (চাকমা ছাত্র যদা) ও চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (সিএনসিআই) এর উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের অমরপুর, উদয়পুর, লংতরাই ভ্যালী, কৈলাসশহর, গন্ডাছড়া ও কাঞ্চনপুর শাখায় একযোগে মহান বিপ্লবী নেতা এমএন লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়।

এসময় তারা মহান নেতার ছবিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে ও পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং কাঞ্চনপুর শাখার উদ্যোগে শাক্য সদক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সিএনসিআইয়ের ত্রিপুরা শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট অনিরুদ্ধ চাকমা, চাকমা স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুবল কুমার চাকমা, চাকমা স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক প্রশান্ত চাকমা।

স্মরণ সভায় অনিরুদ্ধ চাকমা বলেন, ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বরে যদি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিভেদপন্থীদের দ্বারা শহীদ না হতেন তাহলে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে অমুসলিম জনগোষ্ঠী মুসলিম জনগোষ্ঠীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার না হতেন। আজ হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার ফিরে পেতো।

তিনি আরো বলেন, আজকের দিনটি গোটা পৃথিবীতে চাকমা জনগোষ্ঠীর শোকের আর স্মরণের দিন। তিনি ১৯৭৩ সালে এমপি নির্বাচিত হন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর দু:খের কথা কষ্টের কথা অধিকারের কথা তুলে ধরেন। তিনি তখন একটি স্বশাসিত আলাদা অঞ্চল দাবি করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীদের নিজেদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে স্বশাসিত অঞ্চল প্রয়োজন।

পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে পার্বত্যাঞ্চলে সামরিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে: এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল

বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে পঁচিশ বছর পরও এই চুক্তি লঙ্ঘন করে এই অঞ্চলের সামরিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে বলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল অভিযোগ করে।

গত ১১ নভেম্বর ২০২৩ ইস্যুকৃত এক প্রতিবেদনে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল উল্লেখ করে যে, ২০১৯ সাল থেকে হিন্দু সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে পাঁচটি বড় আকারের সংগঠিত আক্রমণ হয়েছে যেগুলি সাধারণত একটি সামাজিক মিডিয়া পোস্টের প্রতিক্রিয়া হিসাবে লুটপাট এবং তারপরে সহিংস ধ্বংসাত্মক ঘটনা ছিল, যা প্রায়শই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে সাধারণ নির্বাচনের আগে দেশে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দ্রুত অবনতিশীল মানবাধিকার

পরিস্থিতির জন্য বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে জাতিসংঘের আসন্ন ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর)-কে কাজে লাগাতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ১৩ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় চতুর্থবারের মতো জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনায় (ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ-ইউপিআর) বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই করা হবে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ইউপিআর প্রতি চার বছরে একবার সংস্থার সব সদস্যদেশের মানবাধিকার রেকর্ড পর্যালোচনা করে। ইউপিআর ২০০৯, ২০১৩ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার রেকর্ড পর্যালোচনা করেছিল।

বিবৃতিতে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক উপ-আঞ্চলিক পরিচালক লিভিয়া স্যাকার্দি বলেন, বাংলাদেশের চতুর্থ ইউপিআর এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশটির মানবাধিকার, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, বিরোধী নেতা, স্বাধীন গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ পদ্ধতিগত আক্রমণের মুখোমুখি। বাংলাদেশের মানবাধিকার রেকর্ড যাচাই এবং কর্তৃপক্ষকে তাদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা-প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলোর সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে এই পর্যালোচনা।

এ্যামনেস্টি তার প্রতিবেদনে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বর্তমান অবস্থা, জোরপূর্বক গুম এবং বিচারবহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড,শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা, মৃত্যুদণ্ড, সংখ্যালঘু এবং শরণার্থী অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

ইউপিআরে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ ঘোষণা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ইউনিভার্সেল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর)-এ ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়-সূচি ভিত্তিক রোডম্যাপ ঘোষণা করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সুপারিশ করা হয়েছে।

গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ইউপিআর ওয়ার্কিং গ্রুপের ৪৪ তম অধিবেশনে ডেনমার্ক কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এই সুপারিশ করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের উপর এটা মানবাধিকার পরিষদের ৪র্থ বার রিভিউ করা হলো। এর আগে ইউপিআর ২০০৯, ২০১৩ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার রেকর্ড পর্যালোচনা করেছিল।

৪র্থ ইউপিআরে মেক্সিকো কর্তৃক আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করা; জার্মানী কর্তৃক আদিবাসীদের জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদান করা; কোষ্টারিকা কর্তৃক আদিবাসীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আদিবাসী সম্প্রদায়সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা এবং রোমানিয়া, স্লোভানিয়া, তুর্কিস্থান, বারবাডোস, ক্যামেরুন, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, ইতালী, কেনিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া কর্তৃক জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সুপারিশ করা হয়েছে।

ইউপিআরে ধর্মীয় স্বাধীনতা; মানবাধিকার সুরক্ষা কর্মীদের নির্যাতন, হয়রানি, অপরাধীকরণ, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা; মত প্রকাশের স্বাধীনতা; নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা; নাগরিক ক্ষেত্র সংকোচিতকরণ; স্বাধীন, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ইস্যুর উপর ১১৫টি রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আনিসুল হকের নেতৃত্বে একটি সরকারি প্রতিনিধিদল ৪র্থ ইউপিআরে অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রতিনিধিদলে পররাষ্ট্র সচিবও ছিলেন বলে জানা গেছে।

নাগরিক সমাজের পক্ষে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নাগরিক উদ্যোগ, কাপেং ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, বন্ধু সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ইউপিআরে অংশগ্রহণ করেন। নাগরিক প্রতিনিধি দলে দৈনিক প্রথম আলোর কামাল আহমেদও ছিলেন বলে জানা গেছে।

আগরতলায় পার্বত্য চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা

গত ২রা ডিসেম্বর ২০২৩ আগরতলার প্রেস ক্লাবে 'ক্যাম্পেইন ফর হিউম্যানিটি প্রটেকশন' (সিএইচপি)-এর উদ্যোগে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন অফ দ্যা মাইনরিটি ইন বাংলাদেশ: ইন দ্যা লাইট অফ দ্যা চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস একোর্ড' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিএইচপির সদস্য প্রিয়লাল চাকমার সঞ্চালনায় ও সিএইচপি'র সভাপতি নিরঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীব দেব, সম্পাদক, নর্থ ইষ্ট কালার পত্রিকা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উষা রঞ্জন মগ, রামঠাকুর কলেজের প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র দত্ত, প্রবীণ সাংবাদিক স্রোত রঞ্জন খীসা, নয়ন জ্যোতি ত্রিপুরা ও বিমান জ্যোতি চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সঞ্জীব দেব বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের যে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হচ্ছে সেই প্রেক্ষাপট বিচার করতে গেলে আমরা দেখতে পাব সেই ভুলটা নিহিত রয়েছে আমাদের স্বাধীনতার পর যখন দেশ ভাগ হয় ঠিক সেই সময়ে, আমাদের জাতীয় নেতাদের ভুল বা অবহেলার কারণে। যার ফলে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও সেই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ৯৭ শতাংশ অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেদিন পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেদিন কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং প্রায় তিনদিন ভারতীয় পতাকা তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের ভারতীয় নেতৃত্ব সেদিন সেই ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনবোধ মনে করেননি। যার ফলশ্রুতিতে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের এক অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, আমরা দেখেছি যে দীর্ঘ সময় ধরে বঞ্চিত হতে হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জন্ম হয়েছে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে সেই পার্টি গড়ে উঠার পর সেখানে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক হত্যা, অগ্নিসংযোগ তথা বিভিন্ন অত্যাচারের কারণে উদ্বাস্তু জীবন কাটাতে হয়েছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে।

পরবর্তীতে, ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির ২৬ বছর আজকে পূর্ণ হলো। সেই চুক্তি এই আশায় করা হয়েছিল যে, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে সেখানকার মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে, মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি ২৬ বছর পরও তা বাস্তবায়িত হয়নি। যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সেই সরকার এই ঐতিহাসিক চুক্তিটি বাস্তবায়ন করার আন্তরিকতা দেখাতে পারেনি। চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশির ভাগ ধারাই বাস্তবায়ন করেনি।

বিশেষ অতিথি উষা রঞ্জন মগ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারা বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৮ টি ক্ষুদ্র জাতি আছে সেগুলোকে আদিবাসী বলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৪৭ সালে হিল ট্রাইবস ছিল ৮৯.৯১% আর শুধুমাত্র ৯.০৯% ছিল 'নন-ট্রাইবস'। সেই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৬১ সালে ৮৭%, ১৯৭৪ সালে ৮০.৭৯%, ১৯৮১ সালে ৬১.০৭%, ১৯৯১ সালে ৫১.৪৩% হিল ট্রাইবস। অন্যদিকে 'নন-ট্রাইবস' ১৯৫৬ সালে যেখানে ৯.০৯% তা ১৯৯১ সালে হয়ে গেছে ৪৮% এর উপরে। আমার জানা নেই হয়তোবা এখন সেটা ৫২% এর উপরে চলে গেছে। এইরকম ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে দেখি ১৯৪৭ সালে যেখানে ৮৫%, তা ২০১১ সালে ৫০% এর নিচে নেমে গেছে, হিন্দুদের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালে যেখানে ১০% ছিল তা এখন ১% বা তারও কম হয়ে গেছে সেখানে। এখানে যে ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন তা স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত ভূমি বেদখল হচ্ছে। ট্রাইবালরা উচ্ছেদ হচ্ছে।

স্রোত রঞ্জন খীসা বলেন, আপনারা কমবেশি সবাই জানেন পার্বত্য চট্টগ্রামে কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করে চলেছে। তারা তাদের ভূমি, তথা আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার রক্ষা করার জন্য ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি করলেও আজ ২৬ বছরেও বাস্তবায়ন করেনি সরকার। বরং তাদের উপর আজও সেনাশাসন জিইয়ে রেখেছে। তাদের অস্তিত্ব আজ সংকটের পথে।

তিনি আরো বলেন, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় ৯৮% অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয় যা ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কথা। পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম বাঙালি বসতি স্থাপন করছে যা আজও থামার নাম নেই। আমার বয়স হয়েছে আমার নিজের চোখেই দেখলাম ১৯৪৭ সালের মেজরিটি ট্রাইবসরা আজ ২০২৩ সালে এসে মাইনরিটিতে পরিণত হয়েছে, নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়েছে। এভাবে চলতে

থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ট্রাইবেল এরিয়া মুসলিম বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হতে আর বেশি দিন নেই।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের রক্ষার্থে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার যাতে বাধ্য হয় তার জন্য ভারতের সকল আদিবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

ড. রবীন্দ্র দত্ত বলেন, আজ ২৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাত্র এক- তৃতীয়াংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। চুক্তিতে ভূমি সমস্যার সমাধান করার কথা থাকলেও প্রতিনিয়ত ভূমি বেদখল হচ্ছে। ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে ট্রাইবদের গ্রামে ও জুমভূমি অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ডেইলী স্টার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, অগ্নিসংযোগের ফলে পাখি মারা গেছে, ঝর্ণার বিষ প্রয়োগে জল দুষিত হয়েছে, মাছ মারা গেছে। সেখানে অস্থানীয়দের নিকট ভূমি লীজ দেয়া হয়েছে। এই লীজের কারণে জনজাতিরা অত্যাচারিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান বার বার হওয়া উচিত যাতে বাংলাদেশ সরকারের নিকট তুলে ধরা যেতে পারে।

সভাপতির বক্তব্যে নিরঞ্জন চাকমা বলেন, চুক্তিতে জুম্মদের জায়গা-জমি রক্ষা করা ও বেহাত হওয়া জায়গা-জমি ফেরত দেয়ার কথা রয়েছে। চুক্তিতে আরো ছিল যে, সমতল জেলাগুলি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিকারী সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। সরকার বলেছিল যে, তারা সেটেলার বিষয়ে চুক্তিতে কিছু লিখতে পারবে না। তবে তারা সেটেলারদের সরিয়ে নেবে। কিন্তু বিগত ২৬ বছরেও সেটেলারদের ফিরিয়ে নেয়া হয়নি। বরং সেটেলারদের দিয়ে জুম্মদের উপর হামলা, খুন, গুম, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, চুক্তিতে আরো ছিল যে, ৬টি ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে। কিছু ক্যাম্প প্রত্যাহার হলেও সরকার আরো নতুন করে ক্যাম্প স্থাপন করছে। আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার বিধান করা হয়েছে চুক্তিতে। তাও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়া দরকার বলে সভাপতি নিরঞ্জন চাকমা জানান।

উক্ত আলোচনা সভায় সাব্রুম, গন্ডাছড়া, লংতলাই ভেলী, ছামনু সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চুক্তির ২৬ বছর উপলক্ষে পেচারথলে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রিপুরা রাজ্যের উনকোটি জেলার অন্তর্গত পেচারথল ছদক ক্লাবে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর উপলক্ষে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

ত্রিপুরা ভিত্তিক চাকমা ভাষার টিভি চ্যানেল 'দি জুম্ম টাইমস'-এর উদ্যোগে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর উপলক্ষে নানা জায়গায় নানা কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে পেচারথলে এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবীনছড়া চাগালা কার্বারী সজীব চাকমা ও দীনলক্ষ্মী চাকমা।

উক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৬টি গ্রুপের মোট ২৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে জয়যুক্ত প্রতিযোগীদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org